

# ଶାନ୍ତିକି



## প্রারম্ভিক কিছু কথা

### সম্পাদকের দণ্ডর থেকে

দেখতে দেখতে আবার হৈ হৈ করে এসে পড়ল পালকির টাটকা নতুন সংস্করণ, পালকি ১১। প্রিয় পাঠিকা এবং পাঠকেরা, আমরা জানি আপনারা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পালকিকে স্বাগতম জানাতে। আশা করি আপনাদের মনোরঞ্জন করবে এই একাদশতম সংখ্যা। গত প্রায় দেড় মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরাও যারপরনাই আনন্দিত। হ্যাঁ জানি, আপনারা কেউ কেউ ক্যালেন্ডারে বিগত ১৪ তারিখের দিকে খুবই অর্থবহুভাবে আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন (হ্যাত একটু আধুনিক বিড়বিড়ও করছেন)। আমরা যুগপৎ দুঃখিত, ওই দিনে পালকির আগমনবার্তা প্রকাশে অপারগ হবার জন্যে, এবং উল্লসিত এইটুকু জানাতে পেরে, যে এবারের পালকির গুণগত মান সম্পর্কে আমাদের বিদ্ধি পাঠিকা ও পাঠকগণের কোন খেদ থাকবে না।

আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর একাধিক সদস্য এইবার গভীরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলেছি এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে, “When sometimes life hands you lemons, you gotta make lemonade!” আর কঠিন সময় তো কেবল শুধু আমাদেরই ছিল না, সারা দুনিয়ায় – জাপান থেকে মিশর সর্বত্রই – আমরা দেখেছি সন্কট আর গোলযোগ। কোথাও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন, তো কোথাও ভূপ্রাকৃতিক তট-পরিবর্তন পর্যন্ত ঘটে গিয়েছে। সমসাময়িকের ছাপ আনার জন্য আমরা এবারের প্রচ্ছদেও তাই দেওয়ার চেষ্টা করেছি একটা আন্তর্জাতিক আবহ। আর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সন্ভাবনা নিয়ে উত্তেজনা তো রয়েছে আমাদের আপন রাজ্যেও। তার আঁচ দেখতে পাবেন এবারের পালকির একাধিক লেখাতে।

মধ্যপ্রাচ্যের কথা উঠলেই রাজনীতির পাশাপাশি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক যে ধর্ম সেটা মনে পড়ে যায়। এবার মিশরেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। যদিও পালকিতে আমরা বরাবরই ধর্মকর্ম থেকে দূরে থাকতে চাই, বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে আমরা একটি আকর্ষক প্রয়াসকে আমাদের পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। একথা শুনে চমকাবেন না, প্রচেষ্টাটি সাহিত্যমূলক বলেই পালকির পাতায় উঠে এসেছে; তার চেয়ে পড়ে দেখুন, উদ্যোগাত্মক আসলে চমকপ্রদ।

অবশ্যে, সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, আজ পালকি ১১-র আত্মপ্রকাশের ক্ষণে উপস্থিত। এই সংখ্যায় আপনারা পাবেন ইংরেজী ও বাংলায় মনোগ্রাহী গল্প ও কবিতা, কিছু প্রবন্ধ, এবং কয়েকটি সরস আলোচনা। এপার ও ওপার, দুই বাংলার কবি-লেখকদেরই আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি পালকির পাতাতে। পালকির কন্ট্রিভিউটারদের কাছ থেকে পাওয়া কিছু দুর্ভ সুন্দর ফোটোগ্রাফি এবং চিত্রকলার নির্দশনও থাকছে প্রত্যেকবারের মতই। এছাড়াও আছে একটি অগু-ভ্রমণকাহিনী – পালকির দীর্ঘকালের বন্ধু এবং লেখক মৃগাঙ্ক সম্পত্তি শুভপরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন; তাঁদের থাইল্যান্ডে মধুচন্দ্রিমা-যাপনের অভিজ্ঞতার থেকে U-রেটেড অংশগুলি সন্তুলিত করে একটি ছবিসহ লেখা দিয়েছেন আমাদের। নবদ্যন্তির জন্য শুভেচ্ছা রইল।

এই সুযোগে আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি আমাদের নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদেরও। এবার প্রচুর লেখাপত্র এসেছিল, এবং পালকির প্রতি পরিবারের সদস্য – লেখিকা, কবি, চিত্রকার, পাঠক, পাঠিকা – সবার ভালবাসার প্রাতে আমরা অভিভূত। আশা করব, আগামী দিনগুলোতেও এই ভাবেই পালকি আপনাদের সকলের স্নেহধন্য হ্বার সৌভাগ্য পাবে। সেই সঙ্গে প্রকাশনায় বিশেষ সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই পালকির শুভানুধ্যায়ী পিয়াস চক্রবর্তীকে, আর অভীরুক্ত লাহিড়ীর প্রতি ধন্যবাদ রইল পালকির ফেসবুক পাতাটি তৈরীতে সাহায্যের জন্য – আজ্ঞে হ্যাঁ, পালকি এখন ফেসবুকেও, যেখানে আপনি পালকি-সংক্রান্ত সব আপডেট পেতে পারেন – <http://www.facebook.com/palkimag>

বকবক্তৃতা আর নয়; আসুন ঝাঁপিয়ে পড়ি নতুন পালকির ধনভাণ্ডারে।

## ঢোকার পথ

### About Palki 12:

Palki 12 has a tentative release date of middle to late July. Submission is now open, and will continue till 31st May.

### Statutory Disclaimers:

- The views opinions and ideas expressed by the authors in their submissions are exclusively their own.
- The copyright of the submissions rests with the authors, while Palki assumes the first publishing rights. It is understood that authors have the necessary permissions for their use of copyrighted materials in their work.
- Submissions have been considered solely on the basis of their creative merit, not subject to any editorial censorship.
- However, the acceptance of any particular submission for publication in Palki does not constitute any express endorsement whatsoever of the author's viewpoints by Palki, calcuttans.com, calcuttaglobalchat.net or any of their family of websites.

### Official Details for Palki 11

- Website Owner: Ankan Basu
- Joint Editors: Shrabanti Basu, Kaustubh Adhikari, Kausik Datta
- Email for Enquiry/submissions: [palkisubmissions@gmail.com](mailto:palkisubmissions@gmail.com)
- Rules for submissions: <http://calcuttans.com/palki/submissions>

## সূচীপত্র

### সাক্ষাৎকার

### ধর্মকারীঃ একটি ব্যতিক্রমী বিনোদন

1

### গদ্য

Abhik Das	অভীক দাস	দুই রাজকন্যা	<b>7</b>
Aniruddha Sen	অনিবৃদ্ধ সেন	শয়তানের বাঁশি	<b>22</b>
Anjan Kanti Nath	অঞ্জন কান্তি নাথ	পালকি	<b>33</b>
Dibyendu Biswas	দিব্যেন্দু বিশ্বাস	সেলিব্রিটি	<b>41</b>
Jaita Mondal	জয়তা মন্ডল	না বলা কথা	<b>43</b>
Mahbub Azad	মাহবুব আজাদ	নাম রাখার বিপদ	<b>46</b>
Pramita Bagchi	প্রমিতা বাগচী	পেন-কিলার	<b>57</b>
Pratap Sen Chowdhury	প্রতাপ সেন চৌধুরী	পরিবর্তন	<b>59</b>
Roma Joardar	রমা জোয়ারদার	বৃষ্টি - বৃষ্টি	<b>65</b>
Sanchita Chowdhury	সঞ্চিতা চৌধুরী	স্ফুলিঙ্গ	<b>68</b>
Saswati Bhattacharya	শাশ্বতী ভট্টাচার্য	তলাতল পাতাল খুঁজলে	<b>74</b>
Srabani Dasgupta	শ্রাবণী দাশগুপ্ত	পারঙ্গ সদন	<b>83</b>
Tapas Kiran Ray	তাপস কিরণ রায়	মগরা থেকে আগ্রা	<b>87</b>

### Story

Aniruddha Sen	His Final Mission	<b>95</b>
Barnali Saha	In Her Shadow	<b>103</b>
Gigglananda	Violin	<b>110</b>
Shomik Banerjee	Tall Lives	<b>118</b>
Subhobroto Mazumder	The Cleanliness Drive	<b>121</b>

### কবিতা

Akashleena	আকাশলীনা	খেলা	<b>127</b>
Baiduryya Sarkar	বৈদুর্য সরকার	ইতিহাস চিহ্ন	<b>128</b>
Bandana Mitra	বন্দনা মিত্র	লঙ্কা কাণ্ডের পরে	<b>129</b>
Dipa Pan	দীপা পান	জীবনের সংকেত	<b>131</b>
Jyotishka Datta	জ্যোতিষ্ক দত্ত	তারপর, রাত্রি নেমে আসে...	<b>132</b>
		কাল থেকে...	<b>133</b>
Kaustubh Adhikari	কৌষ্টুব অধিকারী	বালিকাব্য	<b>134</b>
		ঈশ্বরের খেদ	<b>134</b>
Masud Mahmud	মাসুদ মাহমুদ	সুখী ব্যাচেলরের জীবনদর্শন	<b>135</b>

Mayuri Bhattacharyya	ময়ুরী ভট্টাচার্য	স্বপ্নেরা ধাঁধার মত	136
		আলো	136
		শূন্যতার গহ্বরে অদ্শ্য তোমাকে	136
		ব্যথা	137
Partha Mukhopadhyay	পার্থ মুখোপাধ্যায়	জার্নাল ১-৪	138
		তিল	139
		জন্মদিন	139
Pipu Phishu	পিপুফিশু	ন হন্যতে	140
Pragga Mousumi	প্রজ্ঞা মৌসুমী	ধূলো, পাতা এবং অপেক্ষা	141
Pranab Kumar Chattopadhyay	প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়	হৃদয়নন্দন বনে	142
Prithwiraj Choudhury	পৃথীরাজ চৌধুরী	তিব্বতে টিনটিন	143
		খোলা চিঠি	143
		রোবট ও গাছের সংলাপ	143
Ramit Dey	রমিত দে	আ-দিম্	143
Rommel Chowdhury	রোমেল চৌধুরী	চলো, ভ্রমণগদ্যে	144
Sharatkamini Sen-Chaudhurani	শরৎকামিনী সেনচৌধুরানী	দোলাচল	145
Sharabajaya Mukhopadhyay	সর্বজয়া মুখোপাধ্যায়	বাঘিনীর বিরহে বাঘার খেদ ও মৃত্যু	146
Snehashis Banerjee	স্নেহশিস ব্যানার্জি	তোমাতে	147
Subha Adhya	শুভ আত্য	ভালোবাসি আলো-হাসি	148
Sudipta Biswas	সুনীল বিশ্বাস	যৌনতা কিংবা গিমিক বিষয়ক	149
		তর্ক	150
		ভেজাল	150
		অন্য গ্যালাক্সি	151
Suman Barick	সুমন বারিক	জানালার এপারে বন্দী	152
Swati Mitra	স্বাতী মিত্র	এক যে আছে রানী	153
Tapas Ray	তাপস রায়	দেখা, না-দেখা	154

## Poetry

Amit Shankar Saha	To Florence	155
Ratnadipa Banerjee	A Fine Day To Leave	156
Sudakshina Mukherjee	With	157

## প্রবন্ধ

Himadri Shekhar Dutta	হিমাদ্রী শেখর দত্ত	চাঁদ সদাগর- কিংবদন্তি?	158
Kaustubh Adhikari	কৌষ্টুভ অধিকারী	লালিকা	160
Mriganka Chatterjee	মৃগাঙ্ক চ্যাটার্জী	ফাটাফাটি ফুকেত	173
Sarojmohan Chakrabarty	সরোজমোহন চক্রবর্তী	ভাষা প্রহর	177
Sudipta Biswas	সুনীল বিশ্বাস	রাসিক রবীন্দ্রনাথের রসিকতা	179

**Essays & Opinions**

Prabir Ghose	Of the 'langchas' of Shaktigarh, of Singur and of Sourav	<b>182</b>
Sugata Sanyal	Childhood and Durgapuja and Some Memories	<b>184</b>

**Photography**

Abhik Das	অভীক দাস	Bird in the Garden Alone On the Rope Gathered Sipping Flying High	<b>186</b> <b>186</b> <b>187</b> <b>187</b>
Abhiruk Lahiri	অভীরুক লাহিড়ী	প্রতিবিম্ব ভোর অভিযাত্রী দুর্গম যাত্রা ভোরের আলোয় তারা	<b>188</b> <b>188</b> <b>189</b> <b>189</b> <b>190</b> <b>190</b>
Aranyak Banerjee	আরণ্যক ব্যানার্জি	ভারা উট মন্দির-প্রাঙ্গণ তুষার জেলে পাথর	<b>191</b> <b>191</b> <b>192</b> <b>192</b> <b>193</b> <b>193</b>
Chandan Biswas	চন্দন বিশ্বাস	নৌকা নদী বিজ্ঞাপন ঘোড়সওয়ার জল্পনা-কল্পনা ধূসর পাণ্ডুলিপি যাত্রার আগে নির্জন স্বাক্ষর জলসার আসরে	<b>194</b> <b>194</b> <b>195</b> <b>195</b> <b>196</b> <b>196</b> <b>197</b> <b>197</b> <b>198</b>
Pablo	পাবলো	Sunset, at Panchmari (M.P.) Cloud on the Sea, at Puri	<b>199</b> <b>199</b>
Pratap Sen Chowdhury	প্রতাপ সেন চৌধুরী	অশ্র নাগরিক অস্ত	<b>200</b> <b>200</b>
Sharbjayaa Mukhopadhyay	সর্বজয়া মুখোপাধ্যায়	the cottage Ecstasy	<b>201</b> <b>201</b>
Shiladitya Pujari	শিলাদিত্য পূজারী	flowers in the mountain	<b>202</b>

Subhajit Dutta	শুভজিৎ দত্ত	The mountain range	202
		সেতু	203
		খোকা	203
		খুকু	204
		নৌকা	204
		আরতি	205
		তাজমহল	205
Swati Das	স্বাতী দাস	রথ	206
		নৌকা	206
		বহুরূপী	207
		আরতি	207
		টুকি	208
		আলোছায়া	208

## Artwork

Riyanka Chanda	রিয়াঙ্কা চন্দ	খেয়ালের নাচ	209
Sujata Chaudhury	সুজাতা চৌধুরী	রঞ্জনীগন্ধা	210
		গাজানিয়া ফুল	210
		শাখা	211
		জঙ্গল	211

## Contributors

পালকির লেখক-পরিচিতি	212
---------------------	-----

## ধর্মকারীঃ একটি ব্যতিক্রমী বিনোদন



ধর্মই  
সকল  
কৌতুকের  
উৎস

**ধর্মকারী**  
**dhormockery**

আমাদের আলাপ-পরিচয়ের সিরিজে আবারও আমরা উপস্থিত হয়েছি একজন আন্তর্জাল-লেখক অর্থাৎ ব্লগারের সঙ্গে পরিচিত হতে। তবে এক্ষেত্রে, ‘স্পটলাইট’টা ব্লগারের উপর থেকে বরং ব্লগটির উপরেই বেশি যেতে বাধ্য। ‘ধর্মকারী’ ব্লগটির উদ্দেশ্য তো শব্দটির বুৎপত্তি থেকেই বোৰা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। আর এরকম একটা প্রয়াস যে একই সাথে সমাদৃত এবং নিন্দিত – মোট কথা, বিতর্কিত এবং বহুপঠিত হবে তা বলাই বাহুল্য। এর মূলে ‘ধর্মপচারক’ ছদ্মনামের যে ব্লগার আছেন (শব্দটি ‘ধর্মপ্রচারক’-এর উপর ওয়ার্ডপ্লে; বাংলাদেশের কথ্য ভাষায় পচানো বলতে হাসিঠাট্টার মাধ্যমে বিন্দুপ করা বোবায়) তাঁকে স্বত্বাবতই পরিচয় গোপন রাখতে হয়, কেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আসবে আলোচনায়। তাই সে কারণে সাক্ষাত্কারটি নিতে হয়েছে কয়েকটি ইমেল-বার্তালাপের মাধ্যমে। চলুন, পরিচিত হই এই ব্লগটির সাথে, যার হোতা বাংলাদেশী হলেও বিষয়বস্তু ও উপকরণের দিক থেকে আন্তর্জাতিক, এবং যাতে আমাদের বহু ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ বা ‘In God We Trust’-এর দেশ আমেরিকার কথা এসে থাকে প্রায়ই।

### শুরুতেই প্রশ্ন করি, ধর্মকারী কী এবং কেন?

সাইটে লেখা আছে, ধর্মকারী হল “যুক্তিমনক্ষদের নির্মল বিনোদনের ব্লগ। এই ব্লগে ধর্মের যুক্তিযুক্তি সমালোচনা করা হবে, ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে, অপদষ্ট করা হবে, ব্যঙ্গ করা হবে। যেমন করা হয়ে থাকে সাহিত্য, চলচিত্র, খেলাধুলা বা অন্যান্য যাবতীয় বিষয়কে।”

ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করার পূর্ণেদ্যম চর্চা বাংলায় ছিল কি না আগে, আমার সন্দেহ আছে। ধর্মবিরোধী, যুক্তিবাদী সাইট বাংলায় আছে বেশকিছু, যেমন ‘মুক্তমনা’ – আন্তর্জালে বাংলায় যুক্তিবাদ চর্চা ও প্রসারে এই সাইটটি পাইওনিয়ার বলেই মনে হয়। ওটির চরিত্র কিন্তু ধর্মকারীর চেয়ে ভিন্ন। যুক্তিবাদী আলোচনা, বিশ্লেষণ, বিতর্কের চর্চা হয় মুক্তমনায়। ধর্মকারীর ধরনটি সেরকম নয় একেবারেই। ব্যঙ্গ করাটাই এখানে প্রধান লক্ষ্য।

ধর্ম যদি একেবারেই নির্দোষ কোনো একটা ব্যাপার হত, তাহলে এ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু ধর্মের প্রতিক্রিয়া বলুন, কর্মকাণ্ড বলুন, এত বেশি ক্ষতিকারক, সব দিক দিয়ে...

### সাইটে কী ধরনের কন্টেন্ট থাকে?

ব্যঙ্গাত্মক সাইট হলেও মাঝেমাঝেই সিরিয়াস ম্যাটেরিয়ালও দিয়ে ফেলি। সজ্ঞানেই দিই। তবে সাইটের অধিকাংশ উপকরণই ব্যঙ্গভিত্তিক। সে কারণেই কাটুন, পোস্টার, কমেডিয়ানদের ক্লিপিংস, এসব বেশি দেবার চেষ্টা করি।



ধর্মকারীতে প্রকাশিত অধিকাংশ জিনিসই – কাটুন, পোস্টার, ভিডিও, সংবাদ – ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত, আমার মৌলিক নয়। এক্ষেত্রে সংগ্রহ করে গুছিয়ে পেশ করাটাকে যদি কৃতিত্ব বলা যায়, তবে সেটিই শুধু আমার।

**ধর্মে বিশ্বাস করেন না ঠিক আছে, কিন্তু বিশ্বাস না করলেই কি তাকে নিয়ে এভাবে মজা করতে হবে?**

কেন, প্রথিবীর সবকিছু নিয়েই তো ব্যঙ্গ করা সন্তুষ – ব্যঙ্গ করা উচিতও বলে আমি মনে করি। তার মধ্যে শুধু ধর্মকে স্পর্শ করা যাবে না, এ একেবারেই ফালতু কথা। আর, যে জিনিসের কোনোই ভিত্তি নেই, তাকে মক না করটাই তো অস্বাভাবিক! এই জিনিসটা সমালোচনা উর্ধ্বে, তাকে নিয়ে কিছু বলা যাবে না – এই স্টিরিওটাইপটা মানুষ যুগ যুগ ধরে ভাঙ্গার চেষ্টা করে এসেছে। সেই উদ্দ্যোগে ধর্মকারী ক্ষুদ্র একটা অবদান রাখার চেষ্টা করছে মাত্র।

যদি এমন হত যে, ধর্মের কোনো খারাপ প্রভাব সমাজে ছিল না, ইতিহাসেও কখনও ছিল না, এখনও নেই, তাহলে আমি তাতে মাথা ঘামাতাম না। মানুষ বিশ্বাস করে করুক। কিন্তু ধর্মের ক্ষতিকারক দিক এতটাই বেশি... সেই নেগেটিভ দিকগুলো তুলে ধরেই কাজ করার চেষ্টা করি। সেটা করতে গিয়ে কখনও কখনও অতিরঞ্জন হয়ে যায় হয়তো, তবে ব্যঙ্গ-কৌতুকে ওই অতিরঞ্জনটুকু ‘জায়েজ’।

**লোকে বলতেই পারে, ধর্মের যদি সাইড-এফেক্ট থাকেও তাতে আপনার গায়ে জ্বালা কিসে?**

তাতে আমি ‘এফেক্টিভ’ হলে জ্বালা থাকবে না? প্রশ্নটার অর্থ যদি এমন হয়ে থাকে, “ধর্মের সাইড-এফেক্ট থাকলেই আপনাকে সাইট খুলে ব্যঙ্গ করতে হবে কেন?” তাহলে বলি, “আপনি গল্প লেখেন কেন?” গল্পকারকে অনুযোগের সুরে এই প্রশ্ন করা কতোটা যৌক্তিক?

**সাইটটা শুরু করলেন কী ভাবে? বা, এটা শুরুর কথা মনেই বা হল কেন?**

ধর্মবিদ্যে আমার সব সময়ই ছিলো, তবে তাই বলে এ নিয়ে সাইট খুলে বসবো, সে চিন্তা করিনি কখনও। সাইটটা শুরু করি স্বেফ মজা করার জন্য। হঠাত যখন ‘ধর্মকারী’ শব্দটা মাথায় এসে গেল, মনে হল, আরে, এই দিয়ে তো একটা সাইট বানানো যায়! শুরুতে কাউকে বলিও নি, নিজেই গুঁতোগুঁতি করে বানালাম; কেবল একে-ওকে ধাক্কাই দেখার জন্য। করতে করতে এক সময় মনে হল, ধূর, এটাকে চালু করেই দিই ভাল করে।

**এই ধর্মকারী শব্দটা হঠাত মাথায় এল কী করে?**

শুরু নিয়ে খেলা করাটা আমাদের পরিবারেরই একটা রোগ বিশেষ; খেলতে খেলতে ওই মাথায় চলে এসেছিল আর কি।

**অনেকেই তো অনেক ব্লগ লেখে, ধর্মকারী প্রচার পেল কী ভাবে?**

ভাবলাম, শুরু যখন করলামই, লোকজন একটু পড়ুক! প্রথমেই জানালাম চেনা সমমনা লোকজনদের, তাদেরকেও বললাম চারদিকে জানাতে। সবাই অবশ্য জানাতে চায় না, বা চাইলেও পারে না, কারণ তারা তো আস্তিক-পরিবেষ্টিত। আমি তাদের বুঝাতে পারি বলে কোনও অনুযোগ করি না।

একদিন এক ব্লগ-বিশারদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ব্লগ পপুলার করার উপায় কী? তিনি বললেন, প্রথম উপায়ই হচ্ছে ফেসবুকে প্রচার কর। তখনও ফেসবুকে কোনো অ্যাকাউন্ট নেই আমার, কোনোদিন ঢুকিইনি (পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আমার এখনও নেই)। তখন ঢাকাবাসী আরেক শুভাকাঙ্ক্ষী (মুক্তমনা ও সচলায়তনের নিয়মিত লেখক), যিনি শুরু থেকেই আমাকে উৎসাহ দিয়ে আসছেন, তাঁকে বললাম একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে ফেসবুকে। তিনি তা করে দিয়ে আমাকে বুঝিয়েও দিলেন, এর পর থেকে আমার কী করণীয়। তখন থেকে ফেসবুকে পেজ শেয়ার করতে শুরু করলাম।

আজ ধর্মকারীতে পোস্টের সংখ্যা দুহাজার ছাড়িয়ে গেছে – প্রথম পোস্ট দিয়েছিলাম অক্টোবর ২০০৯-এ।

### ধর্মকারীর পাঠক-সংখ্যা কেমন?

পাঠকসংখ্যার গ্রাফ সবসময় উর্ধ্বমুখীই আছে। গুগল অ্যানালিটিক্স থেকে বিশদ তথ্য পাই; এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি, গত এক মাসে পাঠক বেড়েছে ২৩%।

সবচেয়ে বেশি ভিজিটর আসে বাংলাদেশ থেকে, তারপর আমেরিকা, কানাডা, ইউকে, তারপরেই ইন্ডিয়া। আরো আছে, জাপান, সুইডেন, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া। মজার কথা, সৌদি আরব ১২ নম্বর স্থানে, আর ওমান-কাতার-আরব আমিরাত হল ১৬-১৭-১৮ নম্বরে! এ যাবত মোট ১১৪টা দেশ থেকে ভিজিটর এসেছে।

গড়ে এখন দিনে দু'শো'র বেশি পাঠক আসে; তারা দৈনিক গড়ে ছয়শ থেকে হাজারটা পোস্ট পড়ে।



"GIVE HER 50 MORE LASHES FOR SHOWING BARE BACK IN PUBLIC..."

ধর্মকারী আকারে এবং পাঠকসংখ্যায় যেমন বড়, আমাদের মনে হয়েছিল একাধিক ব্যক্তি হয়ত এর পেছনে আছেন।

না, মূলত আমিই চালাই। কেউ কেউ ভালো লিঙ্ক পেলে ইমেলে পাঠান, কেউ বা নিজেরাও কিছু সংবাদ-আলোচনা, কৌতুক, প্রবন্ধ লিখে পাঠান। ‘কোরানের বাণী > কেন এতো ফানি’ সিরিজটা একজন লিখে পাঠান; সেটা বেশ দীর্ঘদিন ধরে চলছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ ছাড়া আরও কয়েকজন মোটামুটি নিয়মিত লেখা দিচ্ছেন। আশাবাদী তাই হতেই পারি।

### এত কাজ একা করতে সমস্যা হয় না?

আল্লাহ একা কর কিছু করতে পারে, আর এক আমি একটা সাইট চালাতে পারব না?

তবে আল্লাহর ফেরেশতা স্টাইলে কিছু ভলান্টিয়ার (স্বেচ্ছাঅনুবাদক) নিয়োগের আইডিয়াটি পছন্দ হয়েছিল। পোস্ট দিয়ে অনুরোধ করায় কয়েকজন আগ্রহীও হয়েছিলেন, তাদের কয়েকজন সোৎসাহে কিছু কাজও করে দিয়েছিন একটা সময়ে।

ধর্মকারীর এক পাঠিকা একদিন আমাকে মেইল করে জিজেস করলেন, “আচ্ছা, আপনি একা সব কাজ করেন, কী করে এত পারেন?” আমি উত্তর দিলাম, “তাহলেই ভেবে দেখুন, ধর্মগুলোর প্রতি আমার ঘৃণার প্রাবল্য কতোটা!”

ধর্মকারীতে কমিউনিটি ব্লগের তুলনায় পাঠকদের মন্তব্যের হার তো কম – ব্যক্তিগত ব্লগের মতই অল্প সংখ্যক কমেন্ট আসে?

ধর্মকারীকে কমিউনিটি ব্লগে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আমার নেই। এখন অনেকেই আছেন, যাঁরা কমেন্ট করেন না সংকোচে, বা করলেও ছদ্মনাম নিয়ে থাকেন। অনেকে নিয়মিত পাঠক অবশ্য মন্তব্য করেন না।

### পাঠকেরা তো অধিকাংশই ছদ্মনামে কমেন্ট করেন?

আসলে ভয় পান তাঁরা। সেটাই স্বাভাবিক। জঙ্গি ইসলামীরা যে কী চিজ, তা তো সবাই জানেন। আমিও তো নিরাপত্তার কারণেই নিজের নাম ব্যবহার করি না।

গতবার সাক্ষাৎকারে দেবাশীষ দেব বলেছিলেন যে, বাংলাদেশে পত্রিকার যে সংস্করণ পাঠানো হয় তাতে আপত্তিকর হতে পারে এমন সব ছবি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় – যেমন খোলামেলা পোশাকে মহিলাদের ছবি, ছেট পোশাক পরা মহিলা খেলোয়াড়দের ছবি ইত্যাদি। এগুলো কি সত্যিই প্রয়োজন হয়?

সংবাদকে এইরকম বোরখা পরিয়ে পাঠানোর প্রচলন থেকেই বোৰা যায়, সেলফ-সেন্সর ব্যাপারটা কতটা জরুরী বাংলাদেশে। যদিও এক্ষেত্রে সেলফ-সেন্সরশিপ সম্পূর্ণভাবেই নিরাপত্তাজনিত।

তা এরকম ‘ব্লাসফেমাস’ একটা সাইট চালাতে গিয়ে আপনাকেও নিশ্চয়ই ভূমকির মুখে পড়তে হয়েছে?

হ্যাঁ, ধর্মকারীটা খুব সেন্সিটিভ ব্যাপার এখানে, মানে বাংলাদেশী মহলে। এ পর্যন্ত অনেক ভূমকি তো বটেই, কয়েকখানা মৃত্যু-ভূমকিও পেয়েছি। একটির ভাষা ছিলো এরকম: ‘তোরে সামনে পাইলে আমি নিজের হাতে কাটতাম।’ এসব ইমেইলে এসেছে, মন্তব্যেও; তবে এরকম মন্তব্য এলে তা প্রকাশ পায় না। তাছাড়া গালিগালাজ তো আছেই।

সে সবই কী ইসলামীদের থেকে, নাকি অন্য ধর্মের লোকেরাও আছে?

ভূমকি পেয়েছি শুধু ইসলামীদের থেকেই। আমি কিন্তু কোনো ধর্মকেই কনসেশন দিই না, সবাইকেই সমানভাবে পচাই। তবে যে ধর্মের অপকর্ম যত বেশি, তাদের কথা বেশি আসে, এই আর কি।

আগে একটি সাক্ষাৎকারে জার্মানী প্রবাসী ব্লগার মাহবুব আজাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, যে বিদেশে থাকলে সমালোচনা করার খানিকটা

ইমিউনিটি পাওয়া যায়, নাকি? উনি বলেছিলেন, যে খানিকটা ঠিক, তবে এরকম প্রায়ই বলে, যে দেশে ফিরলে তোমায় দেখে নেব, বা দেশে থাকা তোমার আত্মিয়স্বজনকে দেখে নেব। তা আপনার ক্ষেত্রে, দেশে আছেন কি বিদেশে জানি না, তবে মনে তো হয় আইডেন্টিটি কখনও প্রকাশ পেয়ে যায় নি? অতএব পরিবার-সংক্রান্ত সমস্যাটা তো হয়নি, নাকি?

এখনও হয়নি, তবে কখনও হবে না, সেটি জোর গলায় বলতে পারছি না।

তা প্রচুর জনতা তো, বাংলাদেশে বা অন্যত্র, কটুর ধর্মীয় ভাবাপন্ন না হলেও সহানুভূতিশীল। তাঁদের অনেকে তো বলেন, নাস্তিকতাও একটা ধর্ম; যারা অহেতুক নিজেদের এই মত অন্যদের উপর চাপিয়ে বেড়াতে চায় তারা জঙ্গি নাস্তিক...

নাস্তিকতাকে ধর্ম মনে করা এক ধরনের কৃপমুণ্ডকতা বলেই আমি মনে করি। ধর্মের অতি আবশ্যিক ও অনিবার্য উপাদানগুলোর কোনটি আছে নাস্তিক্যবাদে? ঐশ্বী গ্রন্থ? ভগবানেশ্বরাল্লাহ? প্রথাগত রিচুয়াল? অঙ্গ বিশ্বাস? আসলে নাস্তিক্যবাদকে ধর্মবিশ্বাসের কাতারে নামাতে পারলে এক ধরনের তৃষ্ণি পেতো বিশ্বাসীরা। কিন্তু চাইলেই তো হবে না। ভিত্তি থাকতে হবে। একবার একটা পোস্ট দিয়েছিলাম ধর্মকারীতে, যাদেরকে জঙ্গি নাস্তিক বলা হয় তাদের নিয়ে। ওটাতে লিখেছিলাম, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নাস্তিক নাস্তিকতার নামে কোথাও রক্তপাত ঘটিয়েছে, কেউ দেখাক দেখি? একটি উদাহরণ দিক?

না, এখানে তো জঙ্গি মানে সশন্ত না, ওই ভাবধারার দিক থেকে আর কি...

পালকি পত্তন ও পড়ান [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)



তাহলে, জঙ্গি মুসলিম আর জঙ্গি নাস্তিক, দু'জনের ক্ষেত্রে এক রকমের বিশেষণ, সেটা কি ন্যায়সঙ্গত? একজন অস্ত্র ব্যবহার করে, বোমাবাজি করে, হত্যা করে জঙ্গি হিসেবে বিবেচিত। আর অন্যজন কোনওভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবি মানতে রাজি নয় বলে তাকেও একই জঙ্গি তকমা দেয়ার আদৌ কোনও যুক্তি কি আছে?

তবু সবাইকে এ কথা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। সবাই যুক্তি বুঝলে ও মানলে প্রথিবীতে ধর্মবিশ্বাসীদের অস্তিত্বই থাকতো না। তবে তারা আছে বলে কিছু বিনোদনের খোরাক আমরা পাচ্ছি, এটাই আমার কাছে ধর্মগুলোর প্রধান পজিটিভ দিক। এদেরকে টীজ করে, মক করে, রিডিকিউল করে আমি পরম তৃষ্ণি পাই।

### তা, এটাই তো আপনার ‘ধর্মকারী’ নামের মোটো?

আমি নিশ্চিত, ধর্মবিশ্বাসীরা সবচেয়ে বেশী ভয় পায় মকিং-কে। এটি শুধু আমার কথা নয়, মার্ক টোয়েনও বলেছিলেন, ‘Against the assault of laughter, nothing can stand.’

### কিন্তু মকিং করলে তো বুঝতে পারার মত বুদ্ধি থাকা চাই।

সে কথাটা বোধহয় কিছুটা সত্যি। ধর্মকারী চালু করার পরে যে পরিমাণ আমার হেইট মেইল পাবার কথা ছিল আমার, সেই পরিমাণ পাই না কিন্তু! আমার মনে হয় কি, মকিং-এর মাত্রা দেখে তারা হতচকিত হয়ে পড়ে। আমি যদি খুব সুশীল ভাষায় খুব ভদ্র একটা বিতর্কের অবতারণা করতাম, তখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্যঙ্গ লেখার একটা মুশকিল কি এটা নয় যে লেখাটার বক্তব্যের থেকে তার বাকচাতুর্যের দিকেই পাঠকের চোখটা বেশি চলে যায়?

আমার সেটা মনে হয় না। বাকচাতুর্য মনে ধরলেই বক্তব্যটি গৌণ হয়ে, পড়ে তা কিন্তু নয়। কোনও সমালোচনায় সচরাচর সমালোচকের নিজের বক্তব্যটাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু একটা ব্যঙ্গ রচনা, সবার আগে এফেক্ট করে বক্তব্যের দিক দিয়েই। লোকে ব্যঙ্গটা উপভোগ করছে, ব্যঙ্গের কারণে লেখাটা আরও জনপ্রিয়ও হচ্ছে, কিন্তু সবের মধ্যে দিয়ে লেখার বক্তব্যটা তার মনকে প্রভাবিত করছেই।

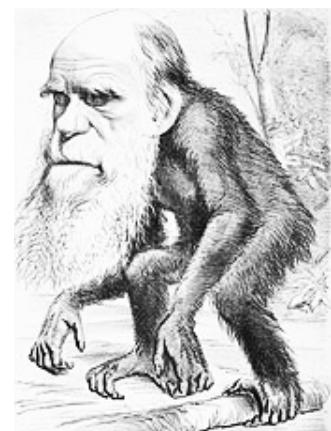
সরলীকরণ করা হয়তো ঠিক নয়, তবে আমি তো দেখি, লোকে ব্যঙ্গ খুব পছন্দই করে। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যঙ্গ-কৌতুক একট বিশাল অস্ত্র। ওই যে বললাম, কট্টরবাদীরা প্রচণ্ড অসহায় বোধ করে ব্যঙ্গের সামনে। অবশ্য স্যাটায়ারের তুলনায় হিউমারের পাঠক বেশি মনে হয়। স্যাটায়ার অনেকে ধরতে পারে না কিনা।

### ধর্মকারীতে আপনার সবচেয়ে প্রিয় পোস্ট কোনটা?

সে তো অনেকই আছে, তবে একটি পোস্ট লিখে এবং সেটির বিচ্ছি প্রতিক্রিয়া পড়ে আমি খুব মজা পেয়েছিলাম, সেটি হল ‘আল্লাহ অপেক্ষা সেক্স উত্তম’। ধর্মকারীতে সর্বাধিক পর্যটক পোস্টের তালিকাতে আছে সেটি।

আপনি যেমন ধর্মকে ভেঙিয়ে ধর্মকারী বলে সাইট খুলেছেন, কেউ যদি আপনার এই সাইটকে ভেঙিয়ে আবার একটা সাইট খোলে, ধরন... ‘ধর্মচারী’ নামে, আপনি কী করবেন?

খুলুক না, আমি কি বারণ করেছি? ধর্মের পক্ষে তো এমনিতেই কত সাইট আছে। আমার তাতে কোনও সমস্যা নেই। তবে প্রবল ধর্মবিশ্বাস ও রসবোধের সহাবস্থান সম্ভব নয় বলেই মনে করি। আর তাই তাদের সম্ভাব্য উদ্যোগের ফলপ্রসূতা নিয়ে আমি রীতিমতো সন্দিহান।



## এরকম ধর্মকে ব্যঙ্গ করে এমন দেশী বা বিদেশী কোনো ব্লগ আপনার পছন্দ?

মকারি করে এমন অনেক ব্লগই পেয়েছি, কিন্তু এমন নির্ভেজাল ব্যঙ্গের জন্যই তৈরি এতো সমৃদ্ধ (গর্ব করা হয়ে যাচ্ছে, তবে ধর্মকারীর ম্যাটেরিয়াল যথেষ্ট সমৃদ্ধ বলেই মনে করি) ব্লগ কোথাও দেখিনি। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। আমি অনেক সাইটেই নিয়মিত যাই, ভিডিও যেমন নিয়মিত পাই [www.atheistmedia.com](http://www.atheistmedia.com) থেকে, তবে সেটা শুধুই ভিডিওরই সাইট, লেখা-আলোচনা বা অন্য কোনও ম্যাটেরিয়াল এসব ওখানে থাকেই না। ভারতীয় বংশোদ্ধৃত আমেরিকান একটি ছেলের ব্লগ [friendlyatheist.com](http://friendlyatheist.com) আমার বেশ পছন্দ, খুবই জনপ্রিয় একটা এথিস্ট ব্লগ সেটা। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থানটা আমার ঠিক পছন্দের নয় – তারা খুব বেশিরকম সফট বলে আমার মনে হয়। সফট থাকার দিন পার হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা।

## বাংলাদেশে যুক্তিবাদী বা নাস্তিক ব্লগ হিসাবে জনপ্রিয় আর কী কী?

মুক্তমনা ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। মুক্তমনা থেকে অনেক পাঠক আসে। ওখানে অনেকেই ধর্মকারীর লিংক শেয়ার করে।

## আপনি নিজে ধর্মকারী ছাড়া অন্য কোথাও লেখেন না?

না।

## দেশবিদেশের কোনো নামীদামী এথেইস্টের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কখনও?

না তা হয়নি, আর দেখা হওয়ার যে খুব খায়েশ আছে, তা-ও বলব না। হ্যাঁ, তাঁদেরকে খুবই পছন্দ করি, কিন্তু পূজনীয় মানি, এমন তো নয়।

## যদি কখনও আপনার সঙ্গে রিচার্ড ডকিন্স কি ক্রিস্টোফার হিচেসের দেখা হয়ে যায়, আর তাঁদেরকে কিছু একটা বলার বা প্রশ্ন করার সুযোগ পান, তাহলে কী বলবেন?

বলবো, ধর্মকারীতে কন্ট্রিবিউট করুন!

## ধর্মকারী নিয়ে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা আছে কিছু?

হয়ত খুব সুদর্শন বা স্মার্ট ব্লগ এটা নয়, ইচ্ছে ছিল সাইটটাকে আরেকটু সাজিয়ে দৃষ্টিনন্দন করে তোলার, কিন্তু আমি একেবারেই টেক-কানা; তবে অনেকটা সময় যদি কখনও পাই, যার সম্ভাবনা খুবই কম, তাহলে কিছু পড়াশোনা করে একটা চেষ্টা করতে পারি।

ভবিষ্যতে বড়সড় কিছু করার পরিকল্পনা তেমন নেই, যেমন চলছে, চলুক। আমি কখনও হঠাতে করে ব্যাপক পরিবর্তনের পক্ষে নই। বেশি পরিকল্পনা করা আমার স্বভাবেও নেই।

## টেকনিকাল বিষয়ে গুগলের প্রতি আপনি অনেকটা নির্ভর মনে হয়?

গুগল কেন জানি ধর্মকারীর প্রচুর লিঙ্কও জোগায়। ওদের সার্চ ইনডেক্সে ধর্মকারী বেশ ভাল জায়গাতেই আছে মনে হয়। কে কোন সার্চ দিয়ে সাইটে আসে, আমি দেখতে পাই তো। আমি অবাক হয়েছি, উদ্ভট সব কীওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে তারা এসে পড়ে ধর্মকারীতে।

## শেষ প্রশ্ন – আমাদের পাঠকদের কিছু বলতে চান?

এটুকুই বলব, ব্যঙ্গ-কৌতুক যদি কেউ পছন্দ করেন, ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ যদি কারূর পছন্দ হয়, তাহলে ধর্মকারীতে আসুন। আশাহত হবেন না, সে নিশ্চয়তা দেওয়া রাইলো।



## Prayer

*How to do nothing  
and still think you're helping*

## দুই রাজকন্যা

### অভীক দাস

#### বেঙ্গলুর, বাইশে ডিসেম্বর দু'হাজার দশ

রাজকন্যা মৃত। ফেসবুক, অরকুট সব জায়গাতেই একই স্ট্যাটাস লেখা, ‘দ্য প্রিন্সেস ইস ডেড’।

অভি চেয়ার ছেড়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসল। নির্মল অরকুট এর ছবিগুলো দেখছে। ছবিগুলোতে কালো ব্রাশ দিয়ে কোনাকুনি নির্মমভাবে ক্রস আঁকা আছে এমনকি প্রোফাইলের ডিসপ্লে পিকচারটাও, যেন মনে হচ্ছে রাজকন্যাকেও ঠিক এভাবেই কেউ খুন করেছে।

অভি একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি মনে হয় নির্মলদা, ও কেন হঠাতে এরকম লিখল?

নারীমনের এ জটিলতা বোঝা বড় মুশকিল, নির্মল চেয়ার থেকে উঠে অফিসের পোশাক খুলতে খুলতে বলল, ভালো করে চেক করেছিস? অ্যাকাউন্টটা কিন্তু ফেকও হতে পারে, আজকাল তো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে এসবের কমতি নেই। আমার কাছেও কিছু পেশেন্ট আসে, ইন্টারনেট রিলেটেড সমস্যা নিয়ে, ইনফ্যাক্ট সবাই যে কম বয়সী, তাও নয়। তা তোর এত আগ্রহের কি কারণ? অনলি বিকজি শি ইস বিউটিফুল।

আরে না না, তোমায় তো বললাম সেদিন, অভি সিগারেটটা নির্মলের হাতে দিল, বাট শি ইস গর্জাস।

নির্মল মেয়েটার ফেসবুক প্রোফাইল দেখতে লাগল, প্রোফাইলের নাম, প্রিন্সেস প্রিয়াঙ্কা। এখানের ছবিগুলোও একি রকমভাবে ক্রস করা। গোটা তিনেক ছবি আছে। ছবিগুলো সে আগেও দেখেছে; অভির ল্যাপটপে সেভ করে রাখা আছে। ফটোগ্রাফির মান বেশ ভালো। একটা ফটোয় মেয়েটা বাগানে দাঁড়িয়ে আছে বেশ রাজকীয় ঘাগরা পরে, দূর থেকে পুরো শরীরটাকে নিয়ে ফটোটা তোলা। আরেকটা ফটো উর্ধ্বাংশ পর্যন্ত, শাড়ী পরে হাতে ফুলদানি নিয়ে দাঁড়িয়ে, পিছনে সাদা দেয়াল। তৃতীয় ফটোটা গলা থেকে মাথা পর্যন্ত, ক্লোজ আপ। ছবিটা এসএলআর ক্যামেরায় তোলা সেটা পিছনের আবছা হয়ে যাওয়া আনফোকাসড পটভূমি দেখে বোঝা যায়। কপালে চন্দনের টিপ, গলায় সোনার দামি হার, চুলে সাদা ফুলের সন্দৰ্ভত রঞ্জনীগন্ধার মালা জড়ানো। এই ছবিটাই প্রোফাইলের ছবি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সিগারেটে টান দিতে দিতে নির্মল বলল, হ্যাঁ রাজকন্যা যখন সুন্দর তো হবেই, তবে আমার পেশা তো মানুষের মন নিয়ে, চামড়ার আবরণে চোখ আটকায় না। সেখানেই বিপদ, কিন্তু অভি, তুই এত আপসেট হচ্ছিস কেন?

আপসেট না, অবাক বলতে পার, এক সপ্তাহ মত আমি ইন্টারনেট খুলতে পারি নি এর মধ্যে কি এমন হল!

দাঁড়া আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি তারপর তোর কাহিনী শুনব। নির্মল বাথরুমে চলে গেল।

অভি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। মাস ছয়েক আগে সে এসেছে ব্যাঙালোরে। ফাইনাল সেমিস্টার পরীক্ষার পরই কোম্পানি ডেকে নিয়েছে কাজে যোগ দিতে। তাদের কলেজের জনা পনেরো ছেলেমেয়ে এসেছে একসাথে, কেউ কেউ সিনিয়র বা আত্মীয়ের বাড়ীতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অনেকে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে, কিন্তু নতুন করে ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার খরচ পড়ে বেশি তাই ঘর ভাগাভাগি করে থাকতে হয়; অভির সেটা পছন্দ ছিল না। তখন সুপর্ণা বলে তার এক কলেজের বন্ধু খেঁজ দিল নির্মলের, আমার একটা সম্পর্কের রিলেটিভ হয়, ব্যাচেলর, পেশায় সাইকোলজিস্ট, অনেকদিন আছে ব্যাঙালোরে। ওর ফ্ল্যাটে একটা রুম খালি হয়েছে, নাম্বার দিচ্ছি কথা বলে দেখ।

করমঙ্গলা বেশ জমজমাট এলাকা, সেখানে দুই কামরার আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট, ফুল্লি ফার্নিশড, অফিস থেকেও কাছে, ভাড়া একটু বেশী হলেও ব্যাঙালোরের ট্রাফিক সমস্যার কথা ভেবে রাজি হয়ে গিয়েছিল অভি। নির্মল তার থেকে কয়েক বছরের বড়, আক্ষরিক অর্থে না হলেও তাকে চেইন স্মোকার বলা যায়। ভালো দাবা খেলে। প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে খেলতে বসে অভির সাথে; এই খেলা থেকে পরিচয় বাড়ে, বন্ধুত্ব হয় দুজনের। নির্মল খানিক প্রাচীনপন্থী আবার ঠিক প্রাচীনপন্থী নয়ও; আধুনিক জীবনযাত্রার সব তথ্য তার কাছে আছে, আবার সো-কলড আধুনিকও সে নয়। কোন কিছু সহজে মানতে চায় না সে। প্রচলিত ধারণার মানুষ সে একেবারেই নয়।

খানিক পরে নির্মল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সোফায় বসল, বল এবার, গোড়া থেকে শুনি।

বলার সেরকম কিছু নেই, অভি পাশ ফিরে নির্মলের দিকে কাত হল, মাস তিন-চার আগে আমার ফেসবুক আর অরকুটে প্রিয়াঙ্কা নামের একটা মেয়ের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসেছিল। দেখতে সুন্দর, উমম বেশ সুন্দর। দেখলাম আমার দুটো বন্ধুও কমন ফ্রেন্ডলিস্টে আছে, সো ফ্রেন্ডশিপ অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিলাম। প্রিয়াঙ্কার প্রোফাইল ডিটেইলস দেখলাম। নাম, ঠিকানা দেওয়া আছে, বাঙালি, বয়স একুশ, বাড়ি শিলিঙ্গড়ি, স্টুডেন্ট, কলেজের নামও দেওয়া ছিল। অস্বাভাবিক কিছু লেখা নেই, ফেক বলে মনে হল না।

অভিবাবু এটুকু দেখে বোঝা যায় না ফেক কিনা, নির্মল পা-টা বিছানায় তুলে আরাম করে বসল। ফটোগুলো মর্ফিং করা নয় তো?

দেখে তো মনে হলো না, তোমার?

আমারও না। তবে কপালে চন্দনের ফোঁটা, চুলে মালা; সাধারণত বাঙালিরা এভাবে সাজে না, ভারী সোনার অলঙ্কারও ব্যবহার করে না; এই তিনটে জিনিসের প্রচলন আছে দক্ষিণ ভারতে। সাউথ ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ হিরোইন নর্থ ইন্ডিয়ায় প্রায় অচেনা। এবং তাদের ছবি তোদের ঐ অরকুট, ফেসবুকে ইউস করার প্রবণতা নর্থ ইন্ডিয়ার মেয়েদের খুব আছে।

হেসে উঠল অভি। এই প্রবণতাটা আমিও লক্ষ্য করেছি, তাই গুগল-এ সার্চ মেরে যত সাউথ ইন্ডিয়ান এ-গ্রেড, বি-গ্রেড হিরোইন আছে সকলের ছবি মিলিয়ে দেখেছি। অফিসে তামিল, তেলেংগা, কানাড়া, মালয়ালী সবরকম কলিগ আছে, তাদেরও দেখিয়েছি। কেউ চেনে না। এটা ফেক প্রোফাইল নয়।

নির্মল মুচকি হাসল। ওকে। মানলাম। তারপর কি হল বল।

হুম্ম, তারপর ভাবলাম দেখি রাজকুমারীর সাথে পরিচয় করে কেমন লাগে, তাই চ্যাট উইন্ডো খুলে কয়েকদিন খুঁজলাম। কিন্তু কখনই অনলাইন দেখতাম না, সুতরাং পিং করার সুযোগ ছিল না। তখন প্রিয়াঙ্কার প্রোফাইলে চুক্তি অরকুটের স্ক্র্যাপ দেখতাম, ফেসবুকের ওয়ালের কমেন্টস পড়তাম, ফটোগুলোও দেখতাম। কম্পিউটার অন করলেই আমার ইচ্ছা করত ওর ফটোগুলো একবার দেখতে। এরকমও হয়েছে যে অফিস থেকে ফিরে নিজের অজান্তেই কখন ল্যাপটপ খুলে ওর ফটোগুলো দেখতে বসে গেছি, অনেকক্ষণ ধরে দেখতাম। একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতাম, যেন ঐ ছবিগুলোই আমার কাছে হয়ে উঠেছিল প্রিন্সেস প্রিয়াঙ্কা।

বোগাস। লাভ অ্যাট ফাস্ট সাইট? তাও পুরোপুরি সাইটও নয়।

না না, এটা লাভ অ্যাট ফাস্ট সাইট ঠিক নয়, জাস্ট অ্যাট্রাকশন, হন্দয়ের সাথে কোন যোগাযোগ নেই শুধু চোখের সাথে ছবির যোগ।

হেসে উঠল নির্মল, ভুলভাল বকে চলেছিস। যাইহোক, তোর সাথে কথা কিভাবে শুরু হল বল।

বলছি। কথা হল অনেকদিন পরে। ধরো প্রায় মাস দেড়েক পরে। কথা বলার আশা বা ইচ্ছা তখন আর আমার মধ্যে ছিল না, তা একদিন দেখি ল্যাপটপ ক্রিনে ‘হাই’ ভেসে উঠল, ফ্রম প্রিসেস প্রিয়াঙ্কা। দেখে অবাক হলাম, খুশীও হলাম। একটা জেনারেল ইন্ট্রোডাকসন হলো, যেমন হয়। তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে চ্যাট, ছুটির দিনে চ্যাট; তবে সমস্যা একটা ছিল। প্রিয়াঙ্কা চ্যাট বক্সে সবসময় ইনভিসিবল থাকত, তাই আমার ইচ্ছামত ওর সাথে কথা বলতে পারতাম না, কথা বলাটা নির্ভর করত তার ওপর।

হাহাহ, চ্যাটে এই ইনভিসিবল জিনিসটা খুব বাজে ঠিক মেঘনাদের মত। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ, আনফেয়ার ওয়ার, তারপর।

এই দু-আড়াই মাস ধরে চ্যাটের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। আমার দিক থেকে আকর্ষণ অনেকটা বেড়েছে, হয়ত বা ওর দিক থেকেও, সেটা ঠিকমত বুঝতে পারি না। লাস্ট উইক থেকে তো দেখেছ কাজের চাপ বেড়েছে আমার, ফিরতে রাত বারোটা বেজে যাচ্ছে তার ওপর যেহেতু পরশুদিন থেকে ছুটিতে যাচ্ছি তাই একটা কলিগকে ‘কে.টি.’ মানে নলেজ ট্রান্সফার দিতে ব্যস্ত ছিলাম; তাই প্রিয়াঙ্কার সাথে কথা হয়নি বেশ কয়েকদিন। তো আজ প্রোফাইল খুলে দেখছি এই হাল। আমার ওপর রেগে গিয়েই কি ও প্রোফাইলে ওরকম করেছে?

সফিস্টিকেটেড ফ্লাটিং, নাথিং এলস। নির্মল একটা সিগারেট ধরাল, আসলে সদ্য কলেজ ছেড়েছিস তো, তাই এখনও খোলা চোখে রঙিন স্বপ্ন দেখিস। তুই তো এখনও কথাই বলিস নি মেয়েটার সাথে মানে চ্যাট ছাড়া, আচ্ছা এতদিন হয়ে গেল তোরা ফোনে কথা বলিসনি কেন?

ইচ্ছা করেই, আমাদের মধ্যে সেরকম এগ্রিমেন্ট হয়েছে, কথা আছে নিউ ইয়ারের দিন প্রিয়াঙ্কা কলকাতা আসবে, আমরা দেখা করব।

ননসেন্স, ফিল্ম আইডিয়া যত সব, এভাবে কখনো রিলেশন গড়া যায়! প্র্যাকটিকালি ভাব, ফরগেট হার। আর এটা যে ফেক প্রোফাইল আমি ড্যাম শিওর। সিগারেটটা অন্ধকে পাস করল নির্মল, আর তোর হিয়ার কি খবর?

আমার হিয়া আবার কবে থেকে হল? অন্ধ উঠে বসল, সে ভালই আছে, খুব একটা কথা হয় না, গেট এর প্রিপারেশন নিচ্ছে, বাড়ীতেই থাকে, কারো সাথে সেরকম যোগাযোগ রাখে না।

বেচারি দুয়োরানী, সুয়োরানীর চক্রান্তে রাজপ্রাসাদ, রাজার মন, সব থেকেই নির্বাসিত। দেখি কতদিনে রাজার সুমতি ফেরে। নির্মল সিগারেটটা অন্ধর হাত থেকে নিল, হেই আর্নট ইউ সিরিয়াস অ্যাবাউট হিয়া?

ধূস, পাগল হলে নাকি! আমি কি কখনো বলেছি যে ওকে আমি ভালোবাসি বা বিয়ে করব। সি ওয়াস মাই ক্লাস মেট, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ডস, আমরা অনেক কথা শেয়ার করতাম, একসাথে সিনেমা, কলেজ স্ট্রীট যেতাম, অনেক রাত পর্যন্ত চ্যাটে, ফোনে গল্প হত বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আমরা বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড।

বাহ, এই হচ্ছে কলেজের প্রেম, কলেজ ফুরলেই ক্লাসমেট, আমাদের সময়ও হত। কিন্তু হিয়া তোকে ভালোবাসে সেটা তো তুই জানিস, তোর অন্তত যোগাযোগ রাখা উচিত।

সেই জন্যই যোগাযোগ কমিয়েছি, ওর দুর্বলতা বোঝার পর থেকে কমিয়েছি; এর পরে বেশ ইনভল্ব হলে দুজনের দিক থেকেই সমস্যা।

হুম্ম, বুঝলাম। বাই দ্য ওয়ে তোর হিয়া কে পছন্দ নয় কেন?

কখনো সেই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখিনি, তাছাড়া হিয়া ইস নট সো গুড।

দ্যাটস দ্য রিজন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজেস করে নির্মল, তা কি ভালো নয় মেয়েটার?

কি মানে? দেখতে ভাল নয়, ফিগারও খুব একটা ভাল নয়, কালো।

তুইও খুব একটা ফর্সা নস, পেটা শরীরও নয়, ওভারঅল খারাপ না হলেও হ্যান্ডসামও বলা যায় না।  
রূপটা ছেলেদের ক্ষেত্রে বড়ে ব্যাপার নয়।

ওয়েল। অ্যাকসেপ্টেড, আমাদের মানসিক বা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তা অনেকটাই ঠিক। যাই হোক,  
তার মানে সাদা কথায় এই দাঁড়াল যে হিয়ার শরীরটা আকর্ষক নয় তাই তোর অপছন্দ। কিন্তু মনটা সুন্দর কিনা  
খোঁজ নিয়ে দেখেছিস?

খানিক ভেবে অভি বলল, মনটা মে বি গুড। কিন্তু ওসবে আমার খোঁজ নিয়ে কি লাভ, আই অ্যাম নট  
ইন্টারেস্টেড। প্রিয়াঙ্কাকে কিভাবে খোঁজা যায় বল।

ঠিক আছে, কাল আমার ছুটি আছে, কাল ভেবে বলব। নির্মল হাসল, লোকে একটা সামলাতে পারে না,  
তুই দু'দুটো নিয়ে বেশ ভালই আছিস। আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবি, হিয়া যদি প্রিয়াঙ্কার মতো সুন্দরী হত,  
তাহলে কি তোর অ্যাঙ্গেলটা একই থাকত? সত্যি বলবি।

ভাবতে থাকে অভি।

### কলকাতা, পনেরোই জুলাই দু'হাজার দশ

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে বিকেল থেকে, বর্ষা বোধহয় পুরোদমে চালু হয়ে গেল। হিয়া জানালায় দাঁড়িয়েছিল  
অনেকক্ষণ ধরে, হয়তবা বৃষ্টি দেখছিল সে, বৃষ্টি পড়ার আগে থেকেই সে দাঁড়িয়েছিল জানালার ধারে। চারতলা  
ফ্ল্যাটবাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় সে থাকে, ছেটবেলায় জানালা দিকে তাকালে অনেক দূর অবধি দেখা যেত,  
রাস্তার লোকজন, চৌমাথার বাজার। গত চার-পাঁচ বছরে উঁচু উঁচু বাড়ীতে এলাকা ভরে গেছে। এখন জানালার  
অর্থ হল কেবলমাত্র একটু আলো, একটু হাওয়া, তাই দিয়ে কোনক্রমে জীবনকে মানিয়ে নেওয়া। চোখের  
প্রসারতা কমে আসছে মানুষের। মনের প্রসারতাও বোধহয় কমছে! পৃথিবীর সব কিছু যেন ছোট হয়ে আসছে।

হিয়ার চিন্তাগুলো দিন দিন এরকম হয়ে যাচ্ছে। ঠিক করে থেকে সে জানে না। এপ্রিলে কলেজ শেষ  
হয়েছে, মে মাসে ফোর্থ ইয়ার ফাইনাল সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তারপর একমাসের ওপর সে বাড়ীতে  
বসে। ক'দিন আগে অভি চলে গেছে ব্যাঙালোরে, কলেজের ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ে একটা বিদেশী সফটওয়্যার  
সংস্থায় সে চাকরি পেয়েছে, অনেক বন্ধুই পেয়েছে; ফাইনাল রেজাল্ট না বেরোনো সত্ত্বেও কোম্পানি তাদেরকে  
ডেকে নিয়েছে ট্রেনিংয়ের জন্য।

হিয়া ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ে বসেনি, তার ইচ্ছে এম.টেক. করে কলেজের লেকচারার হওয়া। গেট  
পরীক্ষা দিয়েছিল, রেজাল্ট খারাপ হয়নি, কিন্তু পছন্দের ইউনিভার্সিটিতে পছন্দের শাখা পায়নি, তাই আবার গেট  
দেবে। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি ক্যাম্পাসের পরীক্ষাগুলো দিত তাহলে সেও হয়ত যেতে পারত অভির সাথে।  
অবশ্য তাতে আর কি যায় আসত। অভি তাকে আজকাল পছন্দ করে না।

খানিক আগে দুপুরে হিয়া তার পুরনো ডেক্সটপ কম্পিউটারটা নিয়ে বসেছিল বেশ কিছুক্ষণ, নিজের  
অরকুট, ফেসবুকের পেজগুলো খুলে দেখছিল, নতুন কোন স্ক্র্যাপ বা কমেন্ট নেই। তখন পুরনো কমেন্ট, চ্যাট  
হিস্ট্রি এইসব পড়ছিল সে। তারপর কয়েকজন বন্ধুর বা তার বন্ধুদের পেজে ঘোরাফেরা করল। মুড়টা অফ হয়ে  
গেল তার, তখন জানালায় এসে সে দেখতে লাগল আকাশটাকে।

কাল কলেজ স্ট্রীট গিয়ে হিয়ার ফাঁকা ফাঁকা লেগেছিল। বই কেনার আগে সে অভির সাথে পরামর্শ করত,  
একসাথে বেরত, অভি কখনও না করত না। সেদিন রাস্তায় একা হাঁটতে হাঁটতে অভির না থাকাটা প্রথমবার টের  
পেয়েছিল হিয়া। ফেরার পথে বেশ অনেকক্ষণ বাসের জন্য অপেক্ষা করে শেষে একটা ভিড় বাসেই উঠেছিল,

এর আগে ভিড়ের জন্য অনেকগুলো বাস সে ছেড়ে দিয়েছে। বাজারের ভিড়, জলদি অফিস ফেরত লোকের ভিড়, কিছুতেই ওঠা যাচ্ছিল না।

লেডিস সিটের সামনের দিকে কয়েকটা সুন্দরী গোছের মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বোধহয় কলেজ থেকে বাড়ী ফিরছিল তারা। ভিড় বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের গা ঘেঁষে কয়েকটা সম-অসম-বয়সী লোকের উন্মত্ত জমায়েত হিয়ার চোখ এড়ায় নি, হিয়ার দিকে তারা কেউ তাকায়নি। সুন্দর না হওয়ার যে এই একটা সুবিধে আছে সেদিন সেটা নতুন করে জেনেছিল হিয়া।

কলেজের দিনগুলো বেশ ভালো ছিল, বাঁধাধরা নিয়মে থাকতে হলেও মাঝে মাঝে ক্লাস মিস করে গাছতলায় বসে আড়তা দেওয়া, এদিক-ওদিকে ঘোরাঘুরি, তর্ক-বিতর্ক, সবকিছুর মধ্যে মজা ছিল; কত তাড়াতাড়ি কেটে গেল চারটে বছর। অন্নর সাথে প্রথম দিকে ততটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না, সেকন্ড ইয়ারের পরে সেটা হল। সেবার কলেজের পিকনিকে গিয়ে গানের লড়াই চলছিল বিভিন্ন দলে। হিয়া মিষ্টি গলায় খুব আস্তে আস্তে একটা গান গেয়েছিল।

সেদিন হিয়াকে চোখে লেগেছিল অন্নর। তারপর একদিন কলেজের করিডোরে অন্ন নিজে থেকে তাকে ডেকে বন্ধুত্ব করে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব বাঢ়ে। হিয়া ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, অনেক ধরাধরিতে একদিন কলেজ মাঠে, গাছের নিচে নির্জনে বসে অন্নকে একটা গান শুনিয়েছিল সে, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক...।

হিয়ার খুব প্রিয় গান। এই গানের সাথে তার যেন মিল আছে। কৃষ্ণকলির রঙের মিল, কালো হরিণ চোখের মিল, অন্তরের আকুলতায় মিল। অন্ন একমনে শুনেছিল সেই গান। তারপর আরও অনেক গান সে শুনেছে; ক্যান্টিনে, ক্লাসরুমে বেঞ্চে বসে, মোবাইল ফোনে অনেক রাতে, কিংবা অন্ন বা হিয়ার বাড়ীতে সোফায়, বিছানায়, শুয়ে, বসে।

অন্ন যে কেন এমন বদলে গেল। নিজের কথা প্রায় কিছুই আর বলে না, অন্য বন্ধুদের থেকে মাঝে মাঝে তার খোঁজ হিয়া পায়। কেন এমন হল, সে তো অন্নর থেকে কিছুই চায়নি। ভালোবাসাও না, কেবল বন্ধুত্ব। সেটাও কি তার প্রাপ্য নয়।

ছবি আঁকতে ভালো লাগে হিয়ার। কয়েকমাস আগে কম্পিউটার ল্যাবরেটরির ক্লাসে বসে বসে নির্মলের একটা স্কেচ সে এঁকেছিল; নির্মল অবাক – আনবিলিভেবল। এটা তুই এঁকেছিস? অসাম, আমাকে মেল করে দে।

অন্নর সামান্য প্রশংসা তাকে ভীষণ রকম অনুপ্রেরণা দেয়, সে গানে হোক, আঁকায় হোক বা পড়াশোনায়। কলেজের অনেকের বিশ্বাস হয় না অন্ন এতটা পাত্তা দেয় হিয়াকে। বলে, অন্ন! ও তো কোন মেয়ের সাথে সেভাবে কথাই বলে না, তোর সাথে ফোনে কি কথা বলে...। এই তো ক'দিন আগে নদিনী, সুপর্ণার কানে কানে বলেছিল, হিয়ার বিয়ে হওয়া শক্ত আছে, একে তো ঐ দেখতে, ঠিকমতো সাজগোজও করতে জানে না।

ছোটবেলা থেকে হিয়া পড়াশোনা, গান আর আঁকা নিয়ে থাকে নিজের ছেট দুনিয়ায় নিজের মত করে। প্রসাধন বা সাজসজ্জা নিয়ে তার কখনো সেরকম আগ্রহ ছিল না। এটা যে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কখনও মনে হয় নি। হিয়া আধুনিক ডিজাইনের ফিটিংস পোশাক পরতে পারে না, অস্বস্তি হয়, তার ধারণা তাকে মানায়ও না। আটপৌরে চুড়িদার কিংবা মাঝে মাঝে শাড়ি, এই তার ভাল। কিন্তু তাকে দেখতে কি এতটাই খারাপ?

বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়ে থেকেছে অনেকবার অনেকক্ষণ ধরে। মুখ ঘুরিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে দেখেছে। সাবান দিয়ে বারবার মুখ ধুয়েছে। নখের আঁচড়ে গলার কাছে নুনছাল উঠে গেছে, ছাল পালকি পড়ুন ও পড়ুন [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

ওঠা সেই জায়গাটা কি ফর্সা। চামড়ার নিচটা কত সাদা, তবে উপরটা এত কালো কেন? আবার সে তাকিয়েছে আয়নায়, মনে সেই একই প্রশ্ন, তাকে কি দেখতে এতটাই খারাপ?

তবে ছোটবেলায় ঠাকুমা কেন মাকে বলত, “তোমার মেয়ে কালো হতে পারে বৌমা, কিন্তু মুখের গড়নখানি বড় চমৎকার, আমার রঙ না পেলেও পটল চেরা চোখ দু’খানা পেয়েছে দেখেছ, তোমায় আর কাজল লাগাতে হবে না।”

এবার কলেজে দোল খেলেছে হিয়া। প্রতি বছর দোলের আগের দিন, কলেজ ছুটির পড়ে ছোট করে হোলি খেলা হয়। হিয়া আগে কখনো খেলেনি এবার শেষ বছর বলে খেলেছিল। লাল, সবুজ রঙে সকলের মুখ, হাত, পোশাক সব রঙিন। সবাই যেন এক একটা কালো ভূত, কালো মুখের সারির মধ্যে শুধু চোখটা সাদা, তখন ছেলেদের মধ্যে কে একজন বলেছিল, দেখ দেখ হিয়াকে দেখতে ভালো লাগছে সকলের চেয়ে।

সে চোখে এখনো কি যাদু আছে? আয়নার আরও কাছে গিয়ে হিয়া চোখ রেখেছে নিজের চোখে। বড় বড় টানা টানা চোখ, ঘন কালো আঁখিপল্লব, যার আন্দোলনে চোখ যেন কথা কয়ে ওঠে। সাদা পটে আঁকা কালো রঙের তারা, আয়নার মতো চকচকে, তাতে ভেসে উঠেছে নিজের প্রতিবিম্ব। এই চোখের অতল গভীরে ডুবে যাওয়া যায় নির্দিষ্টায়। হিয়া মুন্দ হয় নিজেই।

কলেজে সেই দোল খেলার দিন অভি এসে ধরেছিল তাকে। সেটা যে অভি চেনা দায়, এই যে হিয়া, পালিয়ে বেড়াচ্ছিস, তোকে এখনো রঙ মাখাইনি সে খেয়াল আছে, দাঁড়া চুপ করে, নড়বি না।

হিয়া মুখটা তুলে বলেছিল, কোন জায়গা বাকি আছে কি মাখাতে?

অভি শোনেনি, হাতে রঙ গুলে দুই হাত চেপে ধরেছিল হিয়ার গালে, হিয়া চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। অভি ধীরে ধীরে তার হাত দুটো বুলিয়েছিল হিয়ার কপালে, গলায়, ঠোঁটে, কানের নিচে, ঘাড়ে। যেন সেখান থেকে প্রয়োজনীয় উত্তাপ শুষে নিচ্ছিল তার ঠাণ্ডা হাত। তারপরে সে চলে গিয়েছিল; হিয়া অবশ শরীরে চুপচাপ চোখ বুজে সেখানে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ।

সেদিন রাতে বৃষ্টি এসেছিল জানালায়। সে বৃষ্টি বিনা অনুমতিতে চুপিচুপি, বিন্দুবিন্দু ফোঁটা হয়ে লাগছিল কানের চারপাশে, ওখানে তার আলতো পরশ, শুকনো পাতায় প্রথম বর্ষণের মতো কাঁপাচ্ছিল হিয়াকে। সেই কাঁপুনি থেকে জ্বর ফুটে গিয়েছিল, সারারাত ঘুম হয়নি।

আজ হিয়া বোধহয় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে এসব বাড়ী ছাড়িয়ে অনেক দূরে তাকিয়েছিল আর এইসব কথা ভাবছিল। বৃষ্টি আসার আগে বিকেলের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলছিল। রোদের ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ কালো মেঘ ভেদ করে এসে পড়েছে হিয়ার কপালে, চোখে, গালে। হিয়া সেই রোদ মেঘে ঘর ফেরত পাখিদের মতো উড়ে আসতে চাইছিল আকাশে, কিন্তু আঘাতের রৌদ্রের কি-ই বা ভরসা। মুহূর্তে মেঘ ঘনিয়ে এল; ঘোর অঙ্ককারে ছেয়ে গেল ঘরের ভিতর-বাইরে, সারা আকাশ। তারপর নামল বৃষ্টি, ব্যর্থতার মূর্তিমান প্রতীক হয়ে সে চেয়ে রইল খণ্ডিত আকাশের দিকে, একটু রোদের সন্ধানে, পিপাসায়।

## শিলিঙ্গড়ি, তেরোই ডিসেম্বর দু’হাজার দশ

চার মাস আগে প্রিয়াঙ্কা অরকুট আর ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এই ক’দিনেই তার বন্ধুর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। নানা শহরের, নানা রাজ্যের, নানা দেশের, নানা বয়সের অসংখ্য বন্ধু। না বন্ধু নয়, রাজকুমারীর কখনো এত বন্ধু হতে পারে না; এরা হলো ফলোয়ার, ফ্যান বা অ্যাডমায়ারার। অরকুট এর স্ত্র্যাপন্ত পেজ ভর্তি হয়ে গেছে তাদের পাঠানো কয়েক হাজার স্ত্র্যাপনে। তার সারাদিন কেটে যায় এইসব পড়তে, তার উত্তর দিতে। ফেসবুকেও প্রচুর দেওয়াল লিখন। তবে এসবকে হার মানায় তার ফটোতে দেওয়া পালকি পড়ুন ও পড়ান [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

কমেন্টগুলো। সবগুলোই প্রশ়স্তিমূলক। অনেকে আবার সেখানে জুড়েছে দু এক লাইনের কবিতা; কোথাও থেকে টোকা কিংবা তাদের স্বরচিত।

প্রিয়াঙ্কার আবার গর্ব হয় নিজের রূপে। বার বার দেখে নিজের ছবিগুলো, সে কি সত্যিই এত সুন্দর। তার চোখ, নাক, ঠোঁট, তার পোশাকের বৈচিত্র্য, চুলের বাহার, লাস্যময়ী হাসি, মুখের প্রতিটা রেখা, শরীরের গঠন সব কিছুর সৌন্দর্য বিচার করেছে তার ভক্তরা।

প্রিয়াঙ্কা অনেকবার পড়েছে এই সব কমেন্টস, প্রত্যেকবার আনন্দে নেচে উঠেছে তার মন। আবার কখনো এসব লেখা তার মাত্রা ছাড়িয়েছে। এসেছে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা, কখনওবা নিজের বয়সের দ্বিতীয় বয়সের লোকের থেকেও; রাগে, ঘে়ুয়ায় সেই সব কমেন্টস ডিলিট করে দিয়েছে; আর ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে তাদের।

রোজ সকালে স্নান সেরে প্রিয়াঙ্কা গান শোনে তার আরাম কেদারায় বসে। ফুলের সুবাসে ভরে যায় সারা ঘর, আলোর ঝলমলে প্রবেশ ঘটে আধ খোলা কাচের জানালা দিয়ে, সাদা দেয়ালে অবিরত চলে রঞ্জের খেলা। পাখির ডাক ভরিয়ে দেয় চারিদিক, শুন্দ হয়ে যায় তার মন। সে তখন কবিতার বই নিয়ে আসে। পড়তে পড়তে, কিছু লাইন নিজের খাতায় লিখে রেখে দেয়, তার প্রিয় কিছু লাইন, সেগুলো সে পড়ে কখনো পড়ে, মনে মনে ব্যাখ্যা খুঁজে। মাঝে মাঝে তারও দু'লাইন লিখতে ইচ্ছা করে, লেখেও, আবার ভাবে এ লেখার কোন মানে হয় না।

দুপুরবেলা বারান্দায় বসে প্রিয়াঙ্কা তাকিয়ে থাকে অনেক দূরে, যতদূর তার চোখ যায়; মন ভেসে যায় তারও ওপাড়ে। সেখানে মেঘের সমুদ্রের উপর দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে, তেপাত্তরের মাঠ পেড়িয়ে সে উড়ে চলে কোন এক অজানা দেশে। কিন্তু এভাবে বেশিদিন আকাশে ওড়া যায় না, নামতে হয় ধরিত্বার বুকে। এই বিরাট প্রথিবীতে সব কিছু শূন্য মনে হয় তার, একা লাগে নিজেকে। চিন্তাভাবনাগুলো ওলট-পালট হয়ে যায় তখন।

এবার যে তার একটা বন্ধু দরকার, ভক্ত নয়, বন্ধু, বিশেষ বন্ধু। যাকে সব কথা বলতে পারবে, তার মনের সব কথা, তার সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা। সারা সন্ধ্যে কেটে যায় এইসব ভাবতে, তারপর একদিন রাত্রে সে খুঁজে পায় এরকম এক বন্ধু। তার এক মাত্র বন্ধু।

অভ্রকে চিনতে, তার কথা বুঝতে বেশী সময় লাগেনি প্রিয়াঙ্কার, মনের মিল রয়েছে অনেক। যেন কত জন্মের সম্পর্ক হয়ে আছে তার সাথে। কিন্তু অভ্র কি চিনতে পেরেছে তাকে, সে কি বুঝতে পারে তার মনের কথা, অনেক গভীরে লুকনো হৃদয়ের গোপন কথা? তার ছবির আড়ালে হারিয়ে যায় না তো অভ্র? তার বড় ভয় হয়। যদি সে তাকে ঠিক মতো না বোঝে, আর পাঁচটা সাধারণ রাজপুত্রের মতো সেও যদি চেয়ে বসে রাজকন্যার সাথে অর্ধেক রাজত্ব। তখন কি করবে প্রিয়াঙ্কা। বড় ভয় হয় তার।

প্রিয়াঙ্কা সাহস আনে মনে। বিশ্বাস আনে অভ্র প্রতি। অভ্র নিশ্চয়ই অত সাধারণ নয়। সে তার মনকে মেলে ধরে অভ্র সামনে, সমস্ত মন দিয়ে শোনে অভ্র মনের কথা। ভোরের আলোর মতো এক মিষ্ঠি অনুভূতি ভরিয়ে তোলে তার হৃদয়কে, এমনিভাবে দিনের শেষে নরম শুভ পালকে ঘুমিয়ে পড়ে সে। শোবার পড়ে ঘুমের মধ্যেও সেই আনন্দ লেগে থাকে তার মুখে।

অভ্র অফিস থেকে ফিরে সন্ধেবেলা তার সাথে বসে। প্রিয়াঙ্কা সারাদিন আর কারো সাথে কথা বলার আগ্রহ পায় না, কোন ভক্তের স্ত্র্যাপ পড়তে ভাল লাগে না, সে অপেক্ষায় থাকে, কখন অনলাইন হবে অভ্র। কোনদিন দেরী করলে চিন্তা হয়, মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন তার মনে হয় সে আর রাজকুমারী নেই, সে আর

পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো হয়ে গেছে। তার মন বলে ওঠে, আমি তো সাধারণ হয়েই থাকতে চেয়েছিলাম, রাজকুমারীর জীবন আমি কখনো চাইনি।

একদিন কথায় কথায় অভ্র জানতে পারে যে প্রিয়াঙ্কা কবিতা লেখে। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ আসে, প্লিজ একটা শোনাও। মেয়েরা ভাল কবিতা লেখে আমি জানি।

প্রিয়াঙ্কা বলে, ভালো আমি লিখি না। কাল রাতে তোমার একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, হঠাৎ ঘূর্ম ভেঙে গিয়েছিল আমার, বড় ভয় করছিল। ঠিক তখনি মনের ভিতর থেকে একটা কবিতা বেরিয়ে এসেছিল, লিখছি দেখো,

“পথের কোণে তোমার সাথে কখনো হলে দেখা,  
চোখের ভুলে চিনতে মোরে পারবে কি চিরস্থা?”

অভ্র হেসেছিল, প্রিয়াঙ্কা কেঁদেছিল নিঃশব্দে হয়ত অনেকদিন পরে প্রথমবার। নিজের মনে অভ্রকে নিয়ে গড়ে তোলা সুন্দর প্রথিবীতে যেন একটু মেঘের ছায়া এসে পড়েছিল, ঘনিয়েছিল অন্ধকার, আকাশে উড়তে গিয়ে ভারী লাগছিল ডানাটা।

প্রিয়াঙ্কা আবার সাহস আনে মনে। বিশ্বাস আনে অভ্রর প্রতি। যে বিশ্বাসে ভর করে প্রিয়াঙ্কা আবার ওড়ে আকাশে, তখন আর সারাদিন উড়তে তার একা লাগে না, দিনের আলস্যে মনের মধ্যে থাকে অনেক আশা। আর থাকে সন্ধ্যায় অভ্রর ঘরে ফেরার প্রতীক্ষা, রাত্রে দুজনে মুখোমুখি হবার প্রতীক্ষা।

কয়েকদিন আগে অভ্রকে জিজ্ঞেস করেছিল সে, তোমার কোন গার্লফ্রেন্ড নেই?

অভ্র একটু ভেবে টাইপ করেছিল, নেই তবে খুব শীঘ্ৰই একটা হতে পারে।

- তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং, আচ্ছা কোন মেয়ে বন্ধুও কি নেই, কলেজে বা অফিসে?
- না, তবে কলেজে একজন ছিল। ভালো বন্ধু, নাম হিয়া, আমরা একসাথে ঘুরতাম।
- বাহ, তাকে তুমি ফোন করো রোজ?
- না আগে করতাম, এখন ইন্টিমেসি কমে গেছে।
- আচ্ছা হিয়া কি তোমাকে ভালবাসত?
- উমম, মে বি। কিন্তু আমি না।
- কেন?
- এমনিই। সি ইজ নট সো বিউটিফুল টু গেট অ্যারাউসড।

চমকে উঠেছিল প্রিয়াঙ্কা, সবাই কি ওই একটা জিনিসই খোঁজে মেয়েদের মধ্যে, তাকে দেখতে ভালো বলেই কি শুধু তার প্রতি অভ্রর আকর্ষণ? অভ্রও তো তাহলে সাধারণ। সব ছেলেরাই কি সমান!

তক্ষুনি চ্যাট থেকে লগ আউট হয়ে গিয়েছিল সে। পরের দিন প্রোফাইলে লাগানো নিজের সব ছবি রাগে ডিলিট করে দিয়েছিল। তাতেও রাগ মেটেনি, তখন ল্যাপটপে রাখা সেই ছবিগুলোতে পেইন্ট সফটওয়্যার-এর মোটা ব্রাশ দিয়ে কোনাকুনি ভাবে কালো রঙ করে তারপর আবার প্রোফাইলে সেগুলো আপলোড করে দিয়েছিল। নামের নিচে স্ট্যাটাস বদলে লিখেছিল, ‘দ্য প্রিন্সেস ইস ডেড’।

**বেঙ্গালুরু, তেইশে ডিসেম্বর দু'হাজার দশ**

আজ অফিস থেকে ফিরেই অভ্র দেখল নির্মলদা তার ঘরে বসে তার ল্যাপটপে কিছু কাজ করছে, পাশে নিজের ল্যাপটপটাও খোলা। অভ্রকে দেখতে পেয়েই একটা প্রশ্ন করল সে, বলতো নেপোলিয়নের হাইট কত ছিল?

### নেপোলিয়নের হাইট?

ইয়েস স্যার, দ্য গ্রেট ফ্রেঞ্চ এম্পারর নেপোলিয়ন বোনাপার্টে। অভ্র মুখ দেখে নির্মলদা নিজেই উত্তরটা দিল, মাত্র সাড়ে পাঁচ ফুট, ইউরোপিয়ানদের তুলনায় যা যথেষ্ট কম।

অভ্র পাশের চেয়ারে বসল, তা হঠাত নেপোলিয়ন? আজ তো তোমার প্রিয়াঙ্কার বিষয়ে সমাধান দেওয়ার কথা।

সেটাও পেয়ে যাবি, পরে। আগে যা বলছি শোন, ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স কি জিনিস জানিস?

কোন ব্যাপারে অন্যের তুলনায় পিছিয়ে পড়লে বা ছোট হয়ে গেলে যে মানসিক জটিলতা তৈরি হয় সেটাই।

গুড়, এই ছোট হওয়া বাস্তবে সত্যি নাও হতে পারে, শুধু নিজের কল্পনায় নিজেকে ছোট মনে হলে তা থেকেও এই কমপ্লেক্স তৈরি হয়। তা নেপোলিয়নের ছোটখাটো শরীরের জন্য ওর মধ্যে এক ধরনের ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স কাজ করত। ভেবে দেখ ব্রিটেন ছাড়া প্রায় পুরো ইউরোপের সন্তানের নিজেকে ইনফিরিওর ভাবা। আসলে তার এই কমপ্লেক্সটা ছিল প্রথম থেকেই এবং সেই খেদ পূরণ করার জন্যই তার এই আগ্রাসন, যুদ্ধমঘ্নতা, তা থেকেই ক্ষমতার লোভ এবং যাবতীয় যুদ্ধজয়।

হুম্ম গ্রেট, অভ্র মন দিয়ে শুনছে।

সাইকোলজির ভাষায় এই কমপ্লেক্সটার নাম হল নেপোলিয়ন কমপ্লেক্স। ইনফিরিওটি কমপ্লেক্স কম বেশী সকলের মধ্যেই থাকে এবং সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কখনো সাময়িক প্রকাশ পায়। নির্মলদা নিজের বিষয় পেয়ে বেশ বিজ্ঞের মতো বলে চলেছে, কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তো আর নেপোলিয়নের মতো যুদ্ধ জয় করে মনের সেই খেদ মেটাতে পারে না, তাহলে কি করে তারা?

কি করে, বলো।

বলব। এই প্রসঙ্গে পড়ে আবার আসছি তার আগে তোর সাথে অন্য একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। এবার সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল নির্মলদা। তোকে কতকগুলো স্ট্রেটকাট প্রশ্ন করছি, স্ট্রেট আনসার দিবি। হিয়ার সাথে তোর ফোনে কতদিন কথা হয়নি?

মাস দু'য়েকের উপর।

চ্যাট, সোশ্যাল সাইট বা এসএমএস এ যোগাযোগ কতদিন নেই?

অনেকদিন, তিনিমাস ধরো।

যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলি?

হ্যাঁ করেছি, মোবাইল হয় বেজে বেজে কেটে যায় বা সুইচড অফ থাকে। মেল করলে, স্ক্র্যাপ করলে রিপ্লাই দেয় না, চ্যাটে অনলাইন দেখি না, কি করব এবার।

ল্যান্ডলাইনে ফোন করতে পারতিস, কমন ফ্রেন্ডদের থেকে খোঁজ নিতে পারতিস, নিয়েছিলি।

না, কেন নেব? হিয়াও তো খোঁজ নিতে পারে, মেলের রিপ্লাই করতে পারে। তাছাড়া আমি অফিসের কাজে বিজি ছিলাম, অত আদিখ্যেতা দেখানোর সময় নেই।

ওকে.ভেরি গুড, তোর অনুমতি না নিয়ে আমি কয়েকটা কাজ করে ফেলেছি। এবার সিগারেটটা ধরাল নির্মলদা, আজ ছুটি ছিল তাই তোর ল্যাপটপটা খুলে সকাল থেকে বসে আছি। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে তোর মেল, অরকুট, ফেসবুক সবেরই পাসওয়ার্ড সেভড আছে তাই সেগুলোও খুলে দেখেছি, পড়েছি, অ্যানালাইজ করেছি।

অসুবিধে নেই, আপত্তিকর কিছু পাওনি নিচ্যই।

হাহাহ। না, তা পাইনি, যাইহোক আমি হিয়ার প্রোফাইলে চুকেছি, প্রিয়াঙ্কার প্রোফাইলেও, হিয়া গত তিন মাস ধরে অরকুট, ফেসবুক ব্যাবহার করছে না, করলেও ইনঅ্যাক্টিভ ইউসারের মতো কারো মেসেজ এর কোন উত্তর দিচ্ছে না, যেমন তোরটারও দেয়নি। এটা তুই নিচ্যই খেয়াল করিস নি?

না, অত গুরুত্ব দিইনি, আসলে ওর সাথে সম্পর্কটা একটু ঢিলে করার ইচ্ছা আমার ছিল।

সব কিছু কি আর তোর হাতে, যে ঢিলে করতে চাইলেই ঢিলে হয়ে যাবে। অদ্শ্য হাত বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। একটা সিগারেট বের করে অন্ধকে দিল নির্মল, হিয়ার সাথে অন্য বন্ধুদের যোগাযোগ কেমন জানিস?

কারোরই তেমন কথা হয় না শুনেছিলাম, রিসেন্টলি কোন আপডেট নেই।

ওকে। আচ্ছা হিয়ার কি কি গুণ আছে বলে তোর মনে হয়?

উম্ম... গুণ তো আছে হিয়ার, পড়াশোনায় ভাল, গ্রে ম্যাটারস আছে। ভালো গান গায়, বেশ ভালো, মানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রাগ প্রধান টাইপের গানগুলো আছে, সেগুলো পর্যন্ত ও দারুণ নামায়। সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে অন্ধ বলতে থাকল, আর হ্যাঁ ভালো ছবি আঁকে, আমার একটা যা ক্ষেচ এঁকেছিল, ওহ অসাম।

হ্যাঁ তোর মেল-এ দেখেছি, পেইন্ট সফটঅয়্যার এ আঁকা।

মাউস দিয়ে যে কিভাবে এত সুন্দর আঁকে জানি না।

তাহলে তো অনেক গুণ মেয়েটার, এত গুণ একটা মেয়ের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। সিগারেটে কয়েকটা ঘনঘন টান দিল নির্মলদা, তারপর বলল, কিন্তু সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। প্রাচীন যুগে রূপকেই নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ হিসাবে বিবেচনা করা হত, তখনকার সাহিত্যে দেখ, কালিদাসের কুমারসন্তব; প্রাচীন শিল্পকলা দেখ সেখানেও পাবি, আরও হাজারো উদাহরণ আছে। এমনকি পরবর্তী কালেও আমাদের সমাজে, সাহিত্যে, মিডিয়া থেকে সিনেমায় সর্বত্রই নারীর রূপটাই বড় করে দেখা হয়েছে, বাকি সব কিছুর থেকে। কারণ নারীকে দেখা হয়েছে পুরুষের চোখে।

হ্যাম, একটা অঙ্গুত জিনিস আমিও অনেকবার লক্ষ করেছি, ধরো কোথাও বিয়ের দেখাশোনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে যদি দুটো প্রশ্ন ওঠে তাহলে প্রথমটা হবে, “ছেলে কি কাজ করে?” দ্বিতীয়টা, “মেয়েকে দেখতে কেমন?”

হাহাহ, কারেষ্ট। দুঃখের ব্যাপার হল এই একবিংশ শতকেও নারীর গুণের থেকে রূপ নিয়ে চর্চা হয় বেশী, নারীর বিপণন বেড়েছে অনেক গুণ। এগুলো কোনটাই নতুন কথা নয়, সবাই জানে, জেনেও ভুলে থাকে। এখানেও সেই এক পুরনো বিতর্ক বন্ধু, মেট্রিয়ালিস্ট আর নন-মেট্রিয়ালিস্ট এর ভিতর লড়াই। কিন্তু একটু ভেবে বলতো, নিজের বুদ্ধি দিয়ে ভাব, ব্যক্তিগত জীবনে কোনটা বেশী প্রয়োজন? ভালোবাসার জন্য, জীবন কাটানোর জন্য?

অবাক হয়ে খানিক ভাবল অভি তারপর একটা দীর্ঘশাস ফেলল, আচ্ছা তুমি তো এখনো বিয়ে করনি। তুমি কি কখনো কল্পনা করতে পারো, তোমার যে বউ হবে সে সুন্দর নয়?

বাহ ভালো পয়েন্ট ধরেছিস। একটা ছেলের পক্ষে এই ধরনের কল্পনা করা সত্যি কঠিন। প্রথম দিকে সৌন্দর্য পরম্পরার আকর্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে, পরে সেটার ততটা প্রয়োজন থাকে না, সেক্ষেত্রে ভিতরের মানুষটার সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব, রংচি বোধ এগুলোই প্রধান হয়ে ওঠে। তবে এ কল্পনা আর কেউ না পারলেও আমি করতে পারি। সুস্থ ও স্বাভাবিক শরীর হলেই হবে, লুক ডাসন্ট ম্যাটার, হোয়াট ম্যাটারস ইস দ্য ইনসাইড কোয়ালিটিস, অ্যান্ড অফকোর্স আ বিউটিফুল মাইন্ড, ছুইচ ইস ইভেন মোর ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড। সুন্দর মেয়ে খোঁজা তো বরং সহজ।

হ্রম, তা কি করতে বলো আমাকে?

মণীষীরা বলেছেন, ভালোবাসো গুণ দেখে রূপ দেখে নয়। আমি তো মণীষী নই তাই সেসব কিছু বলব না। কাল তুই বাড়ী যাচ্ছিস, দু'সপ্তাহ ছুটি আছে, এর মধ্যে হিয়ার সাথে দু-তিনটে দিন কাটাস, প্রেমিক হিসাবে না হোক, অন্তত: বন্ধু হিসাবে; কারণ সেটার প্রয়োজন এখন তার সবচেয়ে বেশী।

একটা দিন দেখা করতে পারি, ম্যাঞ্জিমাম। ও নিজেই তো রিলেশন রাখতে চায় না।

হেসে উঠল নির্মলদা। তারপর বলল, তার জন্য হিয়া দায়ী নয়, কিছু সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর দায়ী, আমাদের এই ভুলভাল সমাজ দায়ী। একটা মেয়ের মধ্যে যত গুণই থাকুক, সে যত শিক্ষিত, সমাজে যত প্রতিষ্ঠিতই হোক; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রোফেসর হোয়াটএভার, যদি কোনভাবে বলা হয় যে তাকে দেখতে খারাপ, তাহলে সে নিজেকে চরমভাবে অপমানিত বোধ করে, অনেকের ক্ষেত্রে জীবনটাই ব্যর্থ বলে মনে হয়।

অভি হাসল, ঠিকই বলেছ।

শুধু মেয়ে নয় মানুষ মাত্রই এটা হয় তবে ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রভাবটা তত গুরুতর নয়। কিন্তু মেয়েদের মনের ভেতরে বা অবচেতন মনে এটা দারুণ রকম প্রভাব ফেলে। বাইরে থেকে সেটা অনেকে স্বীকার না করলেও এটা সত্য। অবশ্যই কিছু ব্যতিক্রমও আছে। একটু আগে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স নিয়ে আলোচনা করছিলাম, কোন মেয়ে যদি তার রঙ, রূপ নিয়ে নেগেটিভ ভাবনা চিন্তা করে, তাহলে সেখান থেকেও এই জটিলতা আসে, হিয়া ইস আ ক্রনিক কেস অফ দ্যাট।

কি করে? কিভাবে বুঝলে?

হিয়ার সোশ্যাল সাইটের প্রোফাইল, কমেন্টস দেখে বুঝেছি তোর সাথে করা দীর্ঘ চ্যাট হিস্ট্রি পড়ে বুঝেছি, তোর মুখে শুনেও খানিকটা বুঝলাম। ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স এর অনেক রকমের মিশ্র লক্ষণ আছে, তার মধ্যে কতকগুলো আমি হিয়ার মধ্যে দেখতে পেয়েছি, সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলল নির্মলদা, সেগুলো হলো, অত্যন্ত সংবেদনশীলতা, বন্ধু-বন্ধব বা সমাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা, সব কিছুর জন্য দুনিয়াকে দোষ দেওয়া, সামান্য প্রশংসার জন্যও উন্মুখ হয়ে থাকা, আঁড়ুর ফল টক লাগা। এগুলোর প্রমাণ তোর পুরনো চ্যাটে আছে, ভালো করে দেখিস বুঝতে পারবি। এভাবে বেশীদিন থাকলে ওর মধ্যে একধরণের মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে যার নাম স্কিটজেটাইপ্যাল ডিসঅর্ডার, তখন আরও কঠিন হয়ে উঠবে ওকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানো, যদিও রোগটা জেনেটিক, কিন্তু সামাজিক বা অন্যান্য মানসিক কারণেও হয়।

কি করা উচিত বলো তো? মেয়েটা আমার ভালো বন্ধু ছিল।

বন্ধু সে তোর এখনো আছে। এই পরিস্থিতি থেকে হিয়াকে বের করতে হলে ওর আত্মিশ্বাস ফেরানো দরকার। পজিটিভ থিংকিংটা সবচেয়ে জরুরি, ভাল আর মন্দের তফাত ওকে বোঝাতে হবে। তুই সেটুকু শুরু

করে দে। বাকিটা ও নিজেই বুঝতে পারবে। নির্মলদা ল্যাপটপে মনোনিবেশ করল, আর নেপোলিয়নের যুদ্ধ জয় করে মনের খেদ মেটাবার কথা তোকে বলছিলাম, আমাদের মত সাধারণ মানুষও সেই রকম যুদ্ধ করে, বাট উইদিন দেয়ার লিমিটেসনস, টু কস্পেনসেট ফর দেয়ার ল্যাগ অর ল্যাক।

অভি একমনে শুনছে, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নির্মলদা আবার বলা শুরু করল, চল তোকে একটা জিনিস দেখাই আজ, তার আগে তোকে একটা ছড়া শোনাই, আমাদের সময় ফ্লাস টু'তে কিশলয়ে ছিল, আজ হঠাত মনে পড়ে গেল। যতটা মনে আছে শোনাচ্ছি।

একটি আছে দুষ্টু মেয়ে,

একটি ভারী শান্ত,

একটি মিঠে দখিন হাওয়া,

আরেকটি দুর্দান্ত।

আসল কথা, দুটি তো নয়

একটি মেয়েই মোটে,

হঠাত ভালো হঠাত সেটি

দস্যি হয়ে ওঠে।

একটি আছে ছিঁচকাঁদুনী

একটি করে ফুর্তি,

একটি থাকে বায়না নিয়ে,

একটি খুশির মূর্তি।

আসল কথা, দুটি তো নয়

একটি মেয়েই মোটে,

কান্না হাসির লুকোচুরি

লেগেই আছে ঠোঁটে।

বাহ দারুণ, আমরাও পড়েছি, মনে পড়ল। অভি সিগারেটে কয়েকটা টান দিল, কি জিনিস দেখাবে বলছিলে।

নিচয়ই, বলে হিয়ার মুখের একটা ফটো অভির ল্যাপটপ স্ক্রিনে খুলল নির্মলদা, ল্যাপটপে হিয়ার অনেক ফটো দেখছিলাম, দেখতে তো খুব একটা খারাপ নয়। চোখদুটো দেখেছিস?

হ্যাঁ, চোখদুটো সুন্দর। এটা এবছরই কলেজে তোলা, আমার নতুন ডিজিটালে।

কিন্তু, প্রিয়াঙ্কাকে দেখতে আরও সুন্দর, তাই না? বলে নির্মলদা নিজের ল্যাপটপে প্রিয়াঙ্কার সেই ক্লোস-আপ ফটোখানা খুলল। তারপর বলল, কিন্তু দেখ তো কার চোখটা বেশী সুন্দর, দাঁড়া আগে ফটোটা জুম করি।

নির্মলদা পাশাপাশি দুটো ল্যাপটপ রাখল তারপর দুটো ফটোকেই চোখ পর্যন্ত বিবর্ধিত করল। কাছে আয়, ভালো করে দেখে বল কার চোখটা বেশী সুন্দর, তোর প্রিয়াঙ্কার না হিয়ার?

অভি একবার দেখতে লাগল প্রিয়াঙ্কার ফটো একবার হিয়ার ফটো। তারপর চমকে উঠে হাতের সিগারেটটা অ্যাসট্রে তে ফেলে খুব কাছে চলে এল। সে একবার চোখ রাখল প্রিয়াঙ্কার চোখে, আরেকবার হিয়ার চোখে। মাথাটা হঠাত ঘুরছে তার, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক বাঢ়ছে, অবাক হয়ে সে দেখছে দুই জোড়া চোখ।

## কলকাতা, একত্রিশে ডিসেম্বর দু'হাজার দশ

এবছর কলকাতা তথা ভারতে শীত বড় জাঁকিয়ে পড়েছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা উন্মুরে হাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে আঙুলের ডগা, কানের পাতা। অব্র একটা জ্যাকেট পরে এসেছে হিয়াদের বাড়ী, কিন্তু টুপি, মাফলার, হ্যান্ড গ্লাভস কিছুই নেয়নি। ব্যাঙালোরের মনোরম জলবায়ু থেকে কলকাতার এই চরম ঠাণ্ডায় প্রবেশ বেশ সমস্যায় ফেলেছে তাকে।

ডাইনিং টেবিলে বসে চা খেতে খেতে অব্র খানিক গল্প করল কাকিমার সাথে, তিনি টেবিলে বসে মটরশুঁটি বাছছিলেন। অব্র সেখান থেকে কয়েকটা দানা তুলে খেল। হিয়ার বর্তমান কার্যকলাপের ব্যাপারে জানতে সাবধানে বেশ কিছু প্রশ্ন করল সে। তা থেকে বুঝতে পারল যে কাকিমাও খুব একটা খবর রাখেন না মেয়ের, নিজের অফিস নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কাকুও তাই, এখনো ফেরেনি অফিস থেকে, আজ তো আবার মাছ এন্ডের প্রেশার। তবে একটা জিনিস কাকিমা লক্ষ করেছেন, ইদানীং হিয়ার কথা বলা কমে গেছে, বাড়ীর বাইরে যাওয়াও কমে গেছে অনেক।

সেদিন নির্মলদার বলা কথাগুলো, সে অনেক রাতে একা শুয়ে শুয়ে ভেবেছে, অনেক প্রচলিত ধারণা বদলে গেছে তার। এরপর কয়েকটা টোকা মেরে অব্র চুকেছে হিয়ার ঘরে। আগেও সে ঠিক এভাবেই চুক্ত। চুকেই দেখত, হয় হিয়া জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে অথবা পাশের চেয়ারে বসে বই পড়ছে। আজও তাই, উল্লেদিকে মুখ করে সে বসে, হাতে মোটা বই, দরজায় টোকার শব্দ পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখছে কে এলো। হিয়া জানত না যে অব্র এসেছে। তাকে দেখে চমকে উঠল যথারীতি, মুখ দিয়ে কথা বের হল না তৎক্ষণাৎ। ঢোক গিলে নিজেকে খানিক সামলে নিয়ে বলল, তুই, কবে এলি? আয় বস।

কিছুক্ষণ চলল তাদের এটা-সেটা কথাবার্তা, তারপর কথা হারাল দুজনেই। অব্র দেখল হিয়া তাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে, জানালার ধারে একদিকে মুখ ফিরিয়ে সে দাঁড়িয়ে, কিছুতেই চোখে চোখ মেলাতে পারছে না। অনেকখানি সময় বিনা কথায় কেটে গেছে, কিন্তু দুজনেই দুজনের সাথে মনে মনে কথা বলে চলেছে এতক্ষণ। অব্র উঠে গেল হিয়ার কাছে, সে অনেকটা তৈরি হয়েই এসেছে, হিয়া তাকাল না, নিজের মনে কিসব ভেবে চলেছে সে। অব্র দেখল হিয়ার অভিমানে ভরা মুখ। হিয়ার মুখটা কেমন কাঁপছে, নাক ফুলছে, তার নিজের অজান্তেই, নিজের প্রতি তীব্র ক্ষোভে না অব্রর প্রতি ধিক্কারে। অব্র বুঝতে পারল না, এখন ঠিক কি বলা উচিত, কোন স্বাভাবিক কথা বের হচ্ছে না মুখে, পরিবেশ যেন ক্রমে থমথমে হয়ে উঠছে, সহ্য হচ্ছে না তার। এসময় কিছু না ভেবেই অব্র আবৃত্তি করে ওঠে,

“পথের কোণে তোমার সাথে কখনো হলে দেখা,  
চোখের ভুলে চিনতে মোরে পারবে কি চিরসখা?”

হিয়ার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা, কোন শব্দ বের হয় না মুখে। গাল বেয়ে খুতনিতে নেমে আসে জল। এই মুহূর্তে অব্র মনে হয় পৃথিবীতে হিয়ার থেকে সুন্দর কেউ নেই, কিছু নেই। তার মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করতে ইচ্ছে হয় তার। আবার পর মুহূর্তেই মনে হয়, না, সে তো এখানে তার প্রেমিক হিসাবে আসেনি, এসেছে বন্ধু হিসাবে, মনের মধ্যে এ ধরনের দুর্বলতাকে প্রশংস্য দেওয়া যায় না, অন্ততঃ এখন, এই মুহূর্তে না। সমস্ত আবেগকে দূরে সরিয়ে রাখল সে।

তারপর হিয়ার মাথায় একটা হালকা চাঁচি মেরে বলল, ধূর পাগলি, কাঁদছিস কেন, বোকার মতো? শোন, শোন, এদিকে দেখ।

হিয়া কান্না থামাল। ঘাড়টা একটু তুলে তাকাল অভ্র দিকে। অব্র দু'হাতে শক্ত করে তার দুটো হাত ধরল, তারপর বলল, কাল নিউ ইয়ার, মনে আছে, গতবার সবাই মিলে ভিট্টোরিয়া গিয়েছিলাম। চল কাল আমরা কোথাও ঘূরতে বেরব, কোথায় যাব সেটা তুই ঠিক করবি। যদিও কাল এক রাজকন্যার সাথে আমার ডেটিং আছে, সেটা না হয় বাতিল করব।

হিয়া এই প্রথম একটু হাসল।

### কলকাতা, চৌদ্দই আগস্ট দু'হাজার দশ

গ্রাফিত্রের কাজের সুবিধের জন্য র্যাম বেশি দেখে ক'দিন আগে একটা নতুন ল্যাপটপ কিনেছে হিয়া, সেটা কাল থেকে বেশ কাজে লাগছে। ল্যাপটপ ব্যবহার করা অভ্যাস নেই, কিবোর্ডের সুইচগুলো ডেঙ্কটপের মত বড় নয়, ছোট আর ঘেঁষাঘেঁষি, তাই টাইপ করতে গিয়ে ভুল সুইচে হাত পড়ছে তার।

খানিক আগে বৃষ্টি থেমে গেছে, গাছের পাতা থেকে টস টস করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে এখনো, সে আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে হিয়ার ঘর থেকে। গাছের পাতায় পড়ে থাকা জলকণার ওপর নানা দিকের আলোর প্রতিফলন দেখা যায় তার জানালা দিয়ে। জোলো হাওয়া আসছে, ঠাণ্ডা লাগছে বেশ, শরীর খারাপ করতে পারে। পরক্ষণেই হিয়ার মনে হয়, লাঞ্চ ঠাণ্ডা, সর্দি, জ্বর যাহোক কিছু হোক, এ আর ভালো লাগে না। এভাবে আর কতদিন পারা যায়।

কাল থেকে সে মুখ গুঁজে আছে ল্যাপটপে; তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি আর নিপুণ হাতে সে তৈরি করেছে কয়েকটি মূল্যবান বস্তি, এগুলো হলো তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু এগুলো কোনটাই মৌলিক সৃষ্টি না। হিয়ার মাথা গরম হয়ে ওঠে এটা ভেবে, নাই হোক মৌলিক, এই পৃথিবীতে কোন কিছুই মৌলিক না, শুধু তার বেলাতেই দোষ! এই দিয়েই সে যুদ্ধজয় করবে, এগুলোই তার হাতিয়ার, এগুলোই তার মাথায় এনে তুলবে শ্রেষ্ঠ রাজকন্যার মুকুট।

কাল সে ইন্টারনেট থেকে বেশ কিছু ছবি ডাউনলোড করেছে, দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রীর ছবি। তার মধ্যে হাই রেসোলিউশনের কয়েকটা ছবিকে বেছে নিয়ে রেখেছে একটা ফোন্ডারে। হাই রেসোলিউশন না হলে কাজে অসুবিধে হয়। তারপর একটা একটা করে ফটোগুলো পর পর সে খুলে খুলে দেখেছে। কখনো জুম করে দেখেছে নারী মুখের সূক্ষ্ম অংশ, তারপর খুলেছে ফটোশপ। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফটো এডিটিং টুল গুলো নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। কয়েকটা বাছাই করা ছবির মধ্যে থেকে মুখের নানা অংশ জুড়েছে, মিলিয়েছে নিখুঁতভাবে। তারপর দিয়েছে আরও অনেক রকমের এফেক্ট। কিন্তু চোখটা যেন কিছুতেই মনের মতো হচ্ছে না। অনেক ভাবনা চিন্তা করে সে নিজের একটা ফটো খুলেছে, অব্র তুলেছে এটা। সেখান থেকে তার চোখ দুটো তুলে লাগিয়েছে সেই অসম্পূর্ণ ছবিতে। তারপর দীর্ঘক্ষণ ভাল করে নিরীক্ষণ করেছে। না, কোথাও কোন খুঁত নেই, সার্থক চক্ষুদান। অসীম আনন্দে ফেটে পড়েছে হিয়া, যেন নতুন একটা নারীকে সৃষ্টি করল সে, অপরূপ এক নারী যে নারীমূর্তিকে শুধু ছবিতেই দেখা যায়, দেখে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই, এ নারী যেন তারই এক অবতার।

ফেসবুকের ওয়েবসাইটটা খুলল হিয়া, নতুন একটা অ্যাকাউন্ট বানাবে বলে। প্রোফাইলের নামটা লিখতে গিয়ে মনে হল, কি নাম দেওয়া যায় এর। তখন খেয়াল হল ব্যাকগ্রাউন্ডে কণিকার গলায় একটা গান বেজে চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। আজ গানটা সে শুনছে বার বার। তার খুব প্রিয় গান। কবি কি করে বুঝত নারীর হৃদয়ের এত গভীর বেদনার কথা? কিন্তু আজ কেন বাজছে দুঃখের গান, আজ তো তার আনন্দের দিন।

উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ারে চলতে থাকা গানটা স্টপ করে মিনিমাইজ করে দেয় হিয়া, তারপর দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে, কি নাম দেওয়া যায় প্রোফাইলের। কি নাম দেয়া যায়? ভাবতে থাকে হিয়া, মনে পালকি পড়ুন ও পড়ুন [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

মনে বলে, একটা নামই মানায়। বলেই টাইপ করতে হাত চলে যায় কিবোর্ডে। নামের আদ্যক্ষর বড়ো হাতের লিখবে বলে shift চাপতে গিয়ে ভুলবশত বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ঠিক তার নিচে Ctrl বোতামে পড়ে যায়, ডান হাতের মধ্যমা ততক্ষণে নাম লিখতে শুরু করে চাপ দেয় যথাস্থানে, তাই Ctrl+P টেপায় ঠিক তখনই ল্যাপটপের স্ক্রিনের নিচে মিনিমাইজ হয়ে থাকা মিডিয়া প্লেয়ারে আবার শুরু হয় সেই গান।

“সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।

কিসেরই পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না...”

## শয়তানের বাঁশি

### অনিবৃদ্ধ সেন

অনেকদিন পর আবার সেই অঙ্গুত শব্দটা শুনলাম। আমার অন্তরাত্তা শুকিয়ে গেল, কুলকুল ঘামে শাড়ী-ব্লাউজ সব ভিজে একশা। জানিনা এ শব্দের উৎস কোনো মানুষ না জন্ম, শরীরী না অশরীরী। শুধু জানি, মৃত্যু আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্মীর মাকে ডেকে লাভ নেই। এ শব্দ আমি ছাড়া কেউ শুনতে পায় না।

এ শব্দটা প্রথম শুনি বছর চারেক আগে। অভিশপ্ত সেই দিনটিতে কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে আমরা দু'বোন বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিলাম। দিনটি ছিলো মেঘলা। সম্ব্যার আগেই বেলাশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। একটা গাছের তলায় গোল হয়ে বসে আমরা একে একে গেয়ে যাচ্ছিলাম প্রকৃতির গান। দলছুট দিদি একটু দূরে ঝোপের আড়ালে নিবিষ্ট মনে কি যেন দেখছিলো। গাছপালার প্রতি ওর ছিলো অসন্তোষ টান।

এমন সময় সেই অস্বাভাবিক শব্দটা শুনতে পেলাম। তীক্ষ্ণ শিসের মতো এক তীব্র চড়া সুরের, যেন শ্রবণশক্তির সীমা ছুঁয়ে যাওয়া অচেনা আওয়াজ। একি চামচিকে বা প্যাঁচার ডাক, নাকি ভয়ার্ট কুকরের কানা অথবা কোনো পিশাচের উল্লাসধ্বনি? বুকটা ধক্ক করে উঠলো। আর্তনাদ করে বললাম, “শুনলি?”

গান থামিয়ে অবাক হয়ে রূপা বললো, “কি — ?” ওদের মুখের দিকে চেয়ে বুবালাম — ঠাট্টা নয়, সত্যই কেউ কিছু শোনেনি।

তবে কি আমারই মনের ভুল? এতবড় ভুল! হঠাৎ দেখি দিব্যেন্দুর কুকুর রোভার অস্তির হয়ে উঠেছে, শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

“না রে, রোভারের হাবভাব ভালো ঠেকছে না। কোনো জন্মতন্ত্র নয়তো?” আমি উঠে দাঁড়াই, “দিদিটা আবার ওদিকে গেলো, যাই দেখে আসি।”

“উঃ, বোনদুটো এ ওকে চোখে হারায়!” প্রিয়া কটাক্ষ হানে, “এ কি জঙ্গল নাকি যে বাঘ-ভালুক বেরোবে! তা মন যখন করেছিস যা গিয়ে দেখে আয়।”

“দাঁড়া, আমিও আসছি।” দিব্যেন্দুও আমার সাথে এগোয়।

ঝোপের কাছে দিদিকে চোখে পড়ে না। হঠাৎ রোভার কিছু দূরে কতগুলো গাছের জটলার দিকে খেয়ে যায়। ওর পেছন পেছন সেখানে পৌঁছে দেখি, একটা বড় গাছের আড়ালে দিদি পড়ে আছে। তার চোখ বিস্ফারিত, জিভ বেরিয়ে এসেছে আর গলা ঘিরে টানা একটা সুতোর মতো টকটকে লাল বৃত্ত।

দিব্যেন্দু ও অন্য সবাই অনেক রকম চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু দিদির দেহে প্রাণ ছিলো না। এই নিরাকৃত সত্যটা ইমার্জেন্সির ডাক্তারবাবুর মুখে শোনা অবধি আমি জোর করে শক্ত ছিলাম। বাকিটা মনে নেই, পরে অন্যদের কাছ থেকে জেনেছি।

সন্তুষ্টঃ গলায় একটা নাইলন কর্ডগোছের কিছু জড়িয়ে দিদিকে খুন করা হয়েছিলো। সন্ত্রমহানির চিহ্ন ছিলো না, কিছু খোয়াও যায়নি। অর্থাৎ মোটিভ শূন্য। পুলিশের অনুমান, আততায়ী পেশাদার ছিনতাইবাজ — আমরা তাড়াতাড়ি এসে পড়ায় কিছু নিতে পারেনি।

মাকে ছেটবেলায়ই হারিয়েছি। দিদি সেই শূন্যতা অনেকটাই পূর্ণ করেছিলো। এই আকস্মিক আঘাত তাই আমাকে বিধ্বস্ত করে দিলো। কিন্তু বাবার মুখের দিকে চেয়ে আমাকে শক্ত হতে হলো।

বাবা আদতে ছিলেন কেমিট। পরে অনেক ঝাকিঝামেলা করে কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠে তিনি একটি কারখানা খুলেছিলেন। সেখানে ক্যাফিন ও অন্যান্য কিছু ওষুধের উপাদান তৈরী হতো। তাঁর সততা ও নিষ্ঠার জোরে আমাদের ছেট শিল্পোদ্যোগ সুনামে অনেক বড় হয়ে উঠেছিলো। রপ্তানিরও ছিলো বাঁধা বরাত।

দিদির মৃত্যু কঠোর কর্মযোগী বাবার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিলো। তাঁর কাজের উৎসাহে ভাটা পড়লো। প্রায়ই কারখানায় যান না, বাড়িতে বসে কিসব বিড়বিড় করেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, “কর্মফল, কর্মফল!”

“যদি পূর্বজন্মে কোনো দোষ করেও থাকো”, আমি ভোলাবার চেষ্টা করি, “এ জন্মের কৃতকর্মে কি তার স্থালন হয়নি? পরিশ্রমে, সততায় তোমার জুড়ি মেলা ভার। কর্মীরা তোমায় দেবতুল্য জ্ঞান করে। এসবের কি কোনো দাম নেই?”

“তুই বুঝবি না।” বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন বাবা, তারপর আবার তাঁর নিজস্ব বিষাদজগতে ফিরে যান।

আমি তাঁকে মায়ের স্নেহে আগলে রাখার আপ্রাগ চেষ্টা চালাই, বুঝিয়ে-শুনিয়ে কাজে পাঠাই। আর গভীর রাতে বালিশ ভেজাতে ভেজাতে ভাবি, কে অকারণে আমাদের এ সর্বনাশ করলো? আর আমি সেদিন কিসের আওয়াজ শুনলাম? তবে কি মৃত্যুর নিজস্ব কোনো শব্দ আছে – যা আমি একাই শুনতে পাই?

মধ্যে একবার বাবাকে জোর করে দীঘা নিয়ে গিয়েছিলাম। ভালোই ছিলেন। উৎসাহিত হয়ে আমি এরপর সুযোগ পেলেই তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি – পুরী, গোপালপুর, দার্জিলিং। দেখলাম পাহাড়, সমুদ্র, আকাশের পাশে তিনি অনেকটা শান্ত হয়ে যান। হয়তো তাদের বিশালত্ব তাঁর মনে সাময়িক স্থিতি এনে দেয়।

শেষ অবধি এসেছি সারাঞ্জায়। বাবার এক সাপ্লায়ার পাহাড়ের মাথায় এক চমৎকার গেষ্টহাউসে বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। সেখান থেকে এখন জঙ্গল দেখতে বেরিয়েছি। গাড়ির চেষ্টা করিনি, এসব ব্যাপারে পায়ে হেঁটেই মজা।

জঙ্গল গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ওদিকে বেলা গড়িয়ে আসছে। বাবার হাবেভাবে কিন্তু কোনো ব্যস্ততার লক্ষণ নেই। মনে হয় প্রকৃতির নিবিড় প্রশান্তি তিনি প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন।

এক মুহূর্তের জন্যও বাবাকে কাছছাড়া করিনি। খেয়ালশূন্য মানুষ, কোথা থেকে কোথায় চলে যান। তাছাড়া এখন আমারও একটু গা ছমছম করছে।

কিন্তু একসময় দেখলাম বাবা কেমন অস্বস্তিরোধ করছেন। যেন আমার সঙ্গে কিছুটা ফারাক গড়তে চাইছেন। একটু পরে বুবলাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তাঁর একটু আড়ালে যাবার দরকার হয়েছে। “তুমি ঘুরে এসো, আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি” বলায় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। “আমি যাবো আর আসবো” বলে দ্রুতপায়ে পাশের ঘন জঙ্গলে ঢুকে গেলেন।

গেলেন, কিন্তু আর এলেন না। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট পর আমি ব্যগ্র হয়ে ডাকলাম, “বাবা!” কোনো উত্তর নেই।

এমন সময় আমার বুক কেঁপে উঠলো – আবার সেই তীব্র শিসের মতো আওয়াজ, যা শুনেছিলাম দিদির মৃত্যুর সময়। একবার, দু'বার, তিনবার – আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। শেষে কী করবো দিশা না পেয়ে অনিচ্ছিত পায়ে এগিয়ে গেলাম বাবার সন্ধানে।

বাবা আশেপাশে কোথাও নেই। সেই আওয়াজটাও আর নেই। এলোমেলো ঝোপজঙ্গল হাতড়াতে হাতড়াতে শেষে এসে পড়লাম একটা ঢালের কিনারায়। ঢাল বরাবর প্রায় ফুট কুড়ি নীচে কী যেন একটা পড়ে আছে। সন্ধ্যার আবছায়ায় ভালো করে চোখ সয়ে গেলে দেখলাম – মানুষের শরীর। বাবা!

খাড়াই ঢাল বেয়ে কোনমতে নেমে এলাম। বাবার ঘাড়টা অঙ্গুত ভঙ্গীতে মুচড়ে রয়েছে। নাকের কাছে হাত দিলাম, নাড়ি খুঁজলাম – প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই।

সেই মুভর্তে আমি স্থির হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আমার হাতে একটা তেলতেলে পদার্থ, বাবার শরীর থেকে লেগেছে। তারপর বুঝলাম মশার ক্রীম – সারাগুর ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য সর্বাঙ্গে যত্ন করে মেখেছিলেন।

এবার আমার বুক ছাপিয়ে কান্না উঠে এলো, উথাল-পাথাল কান্না। কতক্ষণ কেঁদেছিলাম জানি না, হঠাৎ অনতিদূরে জঙ্গলে শুনলাম একটা খস্খস্খ শব্দ। জন্ম? নাকি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর – মানুষ?

আমার সম্মিত ফিরে এলো। কে যেন আমায় বলে দিলো – বাবার মৃত্যু দুর্ঘটনা নয়, খুন। আর খুনী সন্তুষ্টতঃ খুব কাছেই আছে। শোক ছাপিয়ে আমার মনে জেগে উঠলো বাঁচার আপ্রাণ তাগিদ। ঢাল বেয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে উঠে এসে ঝোপবাড়ি ভেঙে ছুটতে লাগলাম আর চিংকার করতে লাগলাম, “খুন, খুন, বাঁচাও –”।

তারপর একসময় হঠাৎ এক বলিষ্ঠ বুকের পাঁচিলে সজোরে ধাক্কা খেয়ে আচমকা আমার গতি রুদ্ধ হলো।

এক সুদর্শন, সুপুরুষ যুবা। প্রাথমিক অপ্রতিভ ভাব কাটিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, “কি হয়েছে?”

“আমার বাবা – নেই –”, কান্নায় বিকৃত ঠোঁট চেপে বলি।

“চলুন তো দেখি, কোথায় –”

শিউরে উঠে বলি, “আমার ভয় করছে – কিছু যদি হয়?”

আমার কপাল থেকে ক'গাছি চুল সন্নেহে সরিয়ে দিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে সে দৃঢ়স্বরে বললো, “আসুন – আর কোনো ভয় নেই।”

আমি বাবাকে হারালাম, কিন্তু রজতকে পেলাম। রজত বোস, আই-আই-এমের উজ্জ্বল ছাত্র, নামী কোম্পানির ঝকঝকে এগ্জিকিউটিভ। ভাবতেও ভয় হয় সেদিন সে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক ওই জায়গায় এসে না পড়লে আমার কী হতো।

এসে পড়ার পর অবশ্য সেই সব করলো। পুলিশে খবর দেওয়া, পুলিশের জেরার মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করা, বাবাকে ও আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা এবং তার পরেও অনেক কিছু।

বুঝতে পারছিলাম, আমার কৃতজ্ঞতা প্রথমে নির্ভরতা ও পরে আরো গভীর কিছুতে রূপান্তরিত হতে চলেছে। ওদিক থেকেও কোনো আপত্তি ছিলো বলে কখনো মনে হ্যানি।

মাঝে মাঝেই ও আমার বাড়িতে আসতো, আমার বিষণ্ণতার নীরব সঙ্গী হ্বার চেষ্টা করতো। একদিন আমি করণস্বরে বললাম, “রজত, আমার যে কেউ নেই!”

“আমারও কেউ নেই।” বলে রজত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর যোগ করে, “অন্ততঃ ছিলো না।”

হঠাৎ আমরা দু’জনে একসঙ্গে হেসে উঠি – শরৎকালের মেঘভাঙ্গ খুশির হাসি।

বাড়খণ্ড পুলিশ নিশ্চিত প্রমাণ না পেয়ে বাবার মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা বলেই চিহ্নিত করেছিলো। তবে পুলিশি রিপোর্টে আত্মহত্যার সন্দাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

ঘটনার মাস দুয়েক পর আমার বাড়িতে বসে সেই কথাই আলোচনা করছিলাম বলাইকাকুর সঙ্গে। বলাইকাকুর বাবার অনেকদিনের বন্ধু, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার।

“সত্যিই অসন্তুষ্ট নয়।” বলাইকাকু বলেন, “সুনন্দা চলে যাবার পর থেকে দেবুদা একরকম মানসিক অবসাদেই ভুগছিলেন। আর তোর কথাতেও তো মনে হয় যে অঘটনটার কিছুক্ষণ আগে থাকতেই তিনি তোকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। তাছাড়া, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তাঁর তো অত দূরে যাবার দরকার ছিলো না।”

“কাকু, বেড়াতে বেরোবার আগে দেখছিলাম জঙ্গলে মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য বাবা ভালো করে মশা ক্রীম মাখছেন। সেই মানুষটাই ক’ঘণ্টা পরে –”, বলতে গিয়ে আমার কঢ়িরোধ হয়ে যায়।

কাকুর মুখ গন্তব্যীর হয়। বলেন, “না, তাহলে তো আত্মহত্যা বলে মনে হয় না! তবে কি নিছক দুর্ঘটনা?”

“তোমার কথাই ফিরিয়ে দিচ্ছি – আত্মহত্যা যদি নাই হবে তাহলে তাঁর অতদূর যাবার কী দরকার ছিলো?”

“তুই তবে কী বলতে চাইছিস্ম?” কাকুর স্বরে উত্তেজনার আভাষ।

“কোনো অজ্ঞাত আততায়ী তাঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বা ভয় দেখিয়ে অতদূর টেনে নিয়ে গেছে। তারপর মৃশংসভাবে হত্যা করেছে। মনে পড়ে, দিদিকেও যেখানে থাকার কথা তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাওয়া গিয়েছিলো?”

থমথমে মুখে বসেছিলেন বলাইকাকু। শেষে বললেন, “একই পরিবারে দু’বছরের মধ্যে দু’টি আপাত উদ্দেশ্যবিহীন খুন – কাকতালীয় না হ্বারই সন্দাবনা। তবে কি কোনো ব্যবসায়িক বা পারিবারিক শক্রতা?”

“সে আলোচনার জন্যেই তোমাকে বিশেষভাবে ডেকেছি।” আমি বলি, “ব্যাপারটা আমার বোঝা দরকার। বিশেষ করে পরিবারের আমিই যখন একমাত্র উত্তরাধিকারী আর বাবার ব্যবসাটাও যেহেতু আমিই আপাতত দেখছি।”

কাকু সচকিত হয়ে বলেন, “তোর বোধহয় একজন বিডিগার্ড দরকার।”

ম্লান হেসে বলি, “গার্ড দিয়ে ক’দিন বাঁচাবে? ক’মাস, ক’বছর? ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই। এক যদি আততায়ীর কোনো হৃদিস করা যায় –”

“ব্যবসার দিক থেকে তোর কাউকে সন্দেহ হয়?”

“আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে তেমন সন্দাবনা কম। আমরা কতগুলো স্পেশাল প্রডাক্ট তৈরি করি যাতে কম্পিউটেশন বিশেষ নেই, ডিম্যাণ্ডের তুলনায় সাপ্লাই কম। আর বাবা তো সাপ্লায়ার, কাষ্টমার, ইউনিয়ন সবার সঙ্গেই সন্দৰ্ব রেখে চলতেন।”

“হ্লঁ, আর ব্যক্তিগতভাবেই বা দেবুদার মতো লোকের সাথে কার শক্রতা থাকতে পারে! এক ওই কুণালের ব্যপারটা – সেও তো বছদিনের কথা –”

“কী, থামলে কেন – কী যেন বলছিলে, বলো –” আমি সন্দিঙ্গ হয়ে উঠি। কাকু কিছু একটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

“অ্যাদিন পরে আর শুনে কী করবি?” কাকু তবুও ইত্তেও করছেন।

“কী করবো আমি বুঝবো। তবে একবার যখন মুখ ফঙ্কে বেরিয়ে গেছে, পুরোটা না বলে তোমার রেহাই নেই”, আমি নীরবে অপেক্ষা করতে থাকি।

অগত্যা, কাকু শুরু করেন।

“তোরা দু’বোনই তখন খুব ছেট, তোর তো মনে থাকার কথাই নয়। ফ্যাট্টিরি করার আগে দেবুদার সঙ্গে তাঁর এক বাল্যবন্ধু কুণালের হঠাত যোগাযোগ হয়। কুণাল ছিলেন ক্লাসের ফার্ষ বয় আর দেবুদা বোধহয় ফোর্থ বা ফিফ্থ হতেন।

“কুণাল ছিলেন অসন্তুষ্ট মেধাবী। তাঁর মেধা আর দেবুদার ব্যবসাবুদ্ধি ও লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা – এই দুয়ে মিলেই তোদের ফ্যাট্টিরি দাঁড়ায়। পদ্ধতিগত ব্যাপারে কুণাল এমন কিছু অভিনবত্ব আনেন যার ফলে উৎপাদন খরচ অনেক কমে যায়। এই অতিরিক্ত সুবিধার ওপর ভর করে তোদের ব্যবসা প্রথম থেকেই দাঁড়িয়ে যায়।

“কিন্তু আপনভোগ কুণাল দেরিতে হলেও বুঝতে পারেন যে তাঁর নিজের সম্মতি ব্যবসার সম্মতির সাথে তাল রেখে এগোচ্ছে না। পার্টনারের বদলে তিনি কার্যতঃ সামান্য কর্মচারীতে পর্যবসিত হচ্ছেন। যখন তিনি বুঝতে পারেন, দেবুদার সাথে দেখা করে উত্তেজিতভাবে তর্কবিতর্ক করেন। ব্যবসার অনেক কিছুই দুজনের বন্ধুত্বপূর্ণ বোঝাপড়ার মাধ্যমে চলতো, সেসব বিষয়ে চূড়ান্ত লিখিত পড়িত ব্যবস্থার দাবি করেন।

“এর কিছুদিন পর এক সন্ধ্যায় কুণাল সপরিবারে গঙ্গায় নৌকাবিহারে বেরিয়েছিলেন। কোনো ঝড়বৃষ্টি ছিলো না, কিন্তু নদীর বুকে হঠাত নৌকাড়ুবি হয়। মাঝিমাল্লারা কোনোমতে সাঁতরে পারে ওঠে। কুণাল ও তাঁর স্ত্রী ভালো সাঁতার জানতেন না, তাঁদের তীরের কাছে ভাসতে দেখে লোকজনেরা টেনে তোলে। তাঁদের একটি ছেট ছেলে ছিলো, তার দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁদের পোষা কুকুরটি সঙ্গে ছিলো, সে তাকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো। কুকুরের মৃতদেহটি মাইলখানেক দূরে তীরে পাওয়া যায়, তার মুখে তখনো ছেলেটির প্যাণ্টের একটি টুকরো।

“শোনা যায়, পারে টেনে তোলা অবধি নাকি কুণালের দেহে প্রাণ ছিলো। ‘ভগবান এর বিহিত করবেন’ বলে তিনি চোখ বোজেন।

“বৌদ্ধি, অর্থাৎ তোর মা কুণালের পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কুণালের স্ত্রীর সাথে তাঁর ছিলো গভীর সখ্য, তাঁদের বাচ্চা ছেলেটিকেও তিনি খুব ভালোবাসতেন। এই ঘটনার পর তাঁর শরীর-মন ভেঙে পড়ে। হঠাত একদিন বাপের বাড়ি চলে যান। সেখান থেকে আর তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসেননি।”

আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। কানে বাজতে থাকে বাবার বিলাপ, “কর্মফল, কর্মফল!” শুকনো মুখে বলি, ‘তাহলে কি আপনার ধারণা বাবাই –’

“ନା, ନା, ଆମି ତା ବଲତେ ଚାଇନି।” ବଲାଇକାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରେନ। ତାରପର ଗନ୍ଧୀରମୁଖେ ବଲେନ, “ଦେବୁଦା ଚିରକାଳଇ ଆମାର ଦାଦାର ମତୋ। ତାଇ ଏହି ସ୍ଟଟନାୟ ଉତ୍ସକର୍ତ୍ତିତ ହୟେ ଆମି ଗୋପନେ ପୁଲିଶି ତଦନ୍ତେର ସବ ବିବରଣି ଜୋଗାଡ଼ କରେଛିଲାମ। ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେଓ ଗୋଯେନ୍ଦା ବିଭାଗ ନୌକାଭୁବିର କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ହତେ ପାରେନି। ତବେ ଏଟାଓ ଜେନେ ରାଖ, ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଦେବୁଦାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷଭାବେ ଯୁକ୍ତ ଥାକାର ଏକଟି ପ୍ରମାଣଓ କଥନୋ ପାଓଯା ଯାଇନି।

“ବରଂ ଏମନ ସନ୍ଦେହ କରାର କାରଣ ଛିଲୋ ସେ ବଡ଼ ଏକଟା ଧାକା ଖେଯେ କୁଣାଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସମସ୍ତେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲେନ ଏବଂ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକତାଯ ନିଜେର ପରିବାରକେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରେ ଦେବାର ଜନ୍ୟେ ନିଜେଇ ଓହି ସ୍ଟଟନାଟା ସଟିଯେଛିଲେନ।”

“ତାତେଓ ଆମାଦେର ଅପରାଧେର ଭାର ବିଶେଷ ଲାଭବ ହୟ ନା।” ଆମି ବାଞ୍ଚାକୁଳ କଟେ ବଲି, “ଏସବ ତୋମରା ଆଗେ ବଲୋନି କେନ?”

ବଲାଇକାକୁ ମାଥା ନୀଚୁ କରେ ବଲେନ, “ତୋର ତୋ କୋନୋ ଦୋଷ ନେଇ, ମା। ଆର ବଲଲେଇ କି କିଛୁ ଫେରାତେ ପାରତିସ୍?”

“ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରତେ ପାରତାମ। ନା ପାରଲେ ତାଁଦେର କାହେ ପା ଧରେ ପରିବାରେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ମାର୍ଜନା ଚାଇତାମ।”

“କାର କାହେ? ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରେଓ ତାଁଦେର ନିକଟାତ୍ମୀୟ କାରୋ ସନ୍ଧାନ ମେଲେନି। ଶେଷ ଅବଧି କୁଣାଳେର ଜିନିଷପତ୍ର, ବକେଯା ମାଇନେ ଜୋରଜାର କରେ ତାଁ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ବୁଡ଼ି ପିସିମାର ହାତେ ତୁଲେ ଦେଯା ହେଲାମ। ତିନିଓ ବହର ପାଁଚେକ ହଲୋ ଗତ ହେଲେନ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ଏଖାନେଓ ପ୍ରତିଶୋଧେର ଆଶ୍ରମ ବୁକେ ନିଯେ ବସେ ଥାକାର ମତୋ ଆର କେଉ ବାକି ନେଇ। ଏକ ଝଲକ ଦେଖା ଦିଯେଇ ଯେନ ଆତତାୟୀର ପଦଚିହ୍ନ ଆବାର ଅନ୍ଧକାରେ ମିଲିଯେ ଗେଲୋ।

କିଛୁକ୍ଷଣ ନୀରବ ହୟେ ବସେଛିଲାମ। ଏମନ ସମୟ ରଜତ ଏଲୋ ଆର ମେଘ କେଟେ ମୁହଁରେ ଜ୍ବଳେ ଉଠିଲୋ ଝଲମଳ ରୋଦ୍ଧୁର। କାକୁର ସଙ୍ଗେ ପରିଚଯ କରିଯେ ଦିଲାମ। “ଏକଟୁ ବସୋ, କାକୁକେ ଏଗିଯେ ଦିଯେ ଆସଛି” ବଲେ ଉଠିଲାମ।

“ଛେଲେ ତୋ ରତ୍ନ। କିନ୍ତୁ ମା – ଏକଟୁ ଖେଯାଲ ରାଖିସ୍। ମାନେ, ଦେବୁଦାର ସବକିଛୁର ତୁଇ-ଇ ତୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆର ବୁବିସ୍ ତୋ ଆଜକାଳ ଅନେକେ ଏସବେର ଜନ୍ୟ –”

“ତୋମାର ପରାମର୍ଶ ଆମି ମନେ ରାଖିବୋ।” ନଥ ଖୁଟିତେ ଖୁଟିତେ ବଲି।

ସତିଇ ରଜତେର ସାଥେ ଏ ବିଷୟେ ଆମାର ଆଲୋଚନା କରାର ଛିଲୋ। ବାଇରେ କେଉ ଜାନେ ନା ଦିଦିର ମୃତ୍ୟୁର ପର ବାବାର ଅମନୋଯୋଗିତାଯ ଆମାଦେର ବ୍ୟବସାର ଭେତରେ ଭେତରେ କଟଟା କ୍ଷତି ହେଲେବେ। ରଜତ ଯଥନ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତଭାବେ ବିଯେର ପ୍ରତ୍ୟାବାଦ ଦିଲୋ, ଆମି ଓକେ ପ୍ରଥମ ସେଇ କଥାଇ ଜାନାଲାମ।

“ଯା ଦେଖଛି ତାତେ ବଡ଼ଜୋର ବସତବାଡ଼ିଟା ବାଁଚତେ ପାରେ। ଏମନ ଏକଟା ଅନାଥ, ନିଃସମ୍ବଲ ମେଯେର ସାଥେ ନିଜେକେ ଜଡ଼ାବାର ଆଗେ ତୁମି ବରଂ ଏକଟୁ ଭେବେ ଦ୍ୟାଖୋ।”

“ଭାବାର କିଛୁ ନେଇ, ସୁଚନ୍ଦା। ତୁମି ବେଶ ଜାନୋ ଏହି ଅନାଥ, ନିଃସମ୍ବଲ ମେଯେଟାକେ ଛାଡ଼ା ଆମି ବାଁଚବୋ ନା। ଆର ବାଇ ଦ୍ୟ ଓଯେ, ପ୍ରୋମୋଶନ ପ୍ରୋମୋଶନ ଏବାର ଆମି ଏକଟା ବାଂଲୋବାଡ଼ିତେ ଉଠିଛି। କାଜେଇ ତୋମାର ବସତବାଡ଼ିଟା ଗେଲେଓ ତୋମାଯ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯ ରାଖିତେ ଏଥନ ଆମାର ତତ ଅସୁବିଧେ ହବେ ନା।”

খুশিতে আমার চোখে জল আসে। ভগবান আমাকে বিনা দোষে এত শান্তি দিয়েছেন বলেই কি শেষ অবধি এমন এক নিঃস্বার্থ ভালোবাসার নীড় জুটিয়ে দিলেন?

রজতের কাছে এখন আমার লুকোছাপা বিশেষ কিছু নেই। তবু কাকুর মুখে শোনা সেই না বলারই মতো পারিবারিক কাহিনী ওকে সঙ্কোচে জানাতে পারিনি।

আর গোপন রেখেছি সেই নিদারণ শব্দের বৃত্তান্ত। প্রথম আলাপের পর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজেস করে মনে হয়েছে, সেদিন জঙ্গলে সেও কোনো অজানা শব্দ শুনতে পায়নি। এতদিনে আমি নিশ্চিত, ওই আওয়াজ মৃত্যুরই পদ্ধতিনি। শুধু আমার মনের পর্দাতেই তা আঘাত করে।

এ কথা কাকে বলা যায়! বললে যদি সে আমার মানসিক সুস্থিতায় সন্দেহ করে? এমন কমনীয় স্বপ্ন যদি একটা ছোট ভুলের আঘাতে ভেঙে যায়? কী দরকার!

অবশ্যে এক শুভলগ্নে আমাদের জীবন এক হলো। আমাদের আত্মিয়স্বজন গোনাণুন্তি, তাই ছোটোখাটো অনুষ্ঠানেই কাজ সারা হলো।

বলাইকাকু একফাঁকে ফিস্ফিস্ করে বললেন, “অফিসে-কলেজে একটু গোয়েন্দাগিরি করেছি। রজত সত্যিই একটি জুয়েল। আর এ যুগে অমন দিলদরিয়া মানুষও বিরল।”

লাজুক হাসিতে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। স্বামীগরবিনির কি আর তার মনের মানুষটিকে চিনতে বাকি আছে! তবু গুরুজনস্থানীয়ের এই আশ্বাসবাণী জীবনের নতুন পথে যাত্রা শুরু করার আগে বাড়তি ভরসা জোগায়।

রাতে আমরা বাসরশয্যায় মিলিত হলাম। আমার মনের পূর্ণ দখল পেয়েও রজত আগে কখনো আমার শরীরের ওপর পৌরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়নি। তাই বিয়ের রাতেই আমরা প্রথম পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জানলাম আর অনন্দের প্লাবনে মুহূর্মূহ আপ্সুত হলাম।

তারপর আমাদের দিনগুলি যেন স্বপ্নের মতো কেটে যেতে লাগলো। শহরের দক্ষিণ উপকর্ণে এক নাতিশুদ্ধ বাংলো বাড়িতে আমাদের সংসার। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ছোট বাগান, ফুলের ঝাড়, ফোয়ারা। রজত খুব ব্যস্ত সাহেব। কিন্তু বাড়ির ওপর ওর এক দুর্নিবার টান, যা বিয়ের বছর দুয়েক পরেও বিন্দুমাত্র শিথিল হবার লক্ষণ নেই। আমি আমার ব্যবসাটাকে কিছুটা গুটিয়ে এনে দায়িত্বশীল ম্যানেজারদের হাতে ভার দিয়ে ধীরে ধীরে সরে আসার চেষ্টা করছি। ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ হয়েও কিন্তু রজত আমাদের ব্যবসার ব্যাপারে নিজে থেকে কোনো আগ্রহ দেখায় না — সন্তুষ্টঃ স্তৰ এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত মনে করে বলে। অনেক চাপাচাপি করলে তবেই ওর কাছ থেকে কিছু পরামর্শ পাওয়া যায়, যার প্রত্যেকটাই অমূল্য।

গৈত্রক ব্যবসা থেকে সরে এলে কি করবো তা রজত পুরোপুরি আমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। আমার যা যোগ্যতা-ক্ষমতা তাতে চাকরি বা পরামর্শদাতার কাজ যে চাইলেই পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে এ বিষয়ে ও দৃঢ়নিশ্চিত। আবার তেমন ইচ্ছে যদি নাও হয়, দু'টি ভাত যে ঠিক জুটে যাবে এ আশ্বাসও দিয়ে রেখেছে। সব ভেবেচিন্তে আমি আপাততঃ কিছু ফ্রি-ল্যান্সিং শুরু করেছি। ঘরে বসে কম্পিউটারেই মোটামুটি কাজ চলে যায়।

ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা জোর করে অবসর খুঁজে নিই। মাঝেমাঝে বেরিয়ে পড়ি। তবে স্থান নির্বাচন কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। জঙ্গল এখনও আমার বুকে ভয়ের কাঁপন জাগায়। আর সাঁতার জানে না দেখে সমুদ্র বা জলবিহারে রজতের আতঙ্ক। তাই প্রায়শঃই বাড়ি বসে স্বেফ আড়ডা মেরে আমাদের ছুটি কেটে যায়।

তাতে অবশ্য সময় কখনোই ভারী হয় না। রজত অসন্তুষ্ট সংস্কৃতিমনক্ষ। যে কোনো আলোচনাই সে প্রথর মননশক্তির জোরে সরস করে তোলে। কখনো রবীন্দ্র-সত্যজিৎ, কখনো বেগম আখতার অথবা কখনো দাবায় আমাকে কোনের হাম্পি করার চেষ্টায় মেতে ওঠে। আবার কখনো আসে কোনো গভীর, আবেগঘন মুহূর্ত। পরস্পরকে আবিষ্কার করার বিস্ময় আমাদের কোনোদিন পুরোনো হয় না।

এভাবে বিভোর হয়ে দিন কাটে। দেখতে দেখতে প্রায় দু'বছর চলে যায়। অতীতের ক্ষতকে ভোলার আপ্রাণ চেষ্টা করি। রজতও এ ব্যাপারে আমাকে সাধ্যমতো সাহায্য করে। বলে, “অতীতকে ভুলে চলো আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্নে মাতি।” ওর মমতায় ছলছল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে এক এক সময় মনে হয়, হয়তো ওরও অতীত ঘিরে কোনো একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে।

সত্যিই সেসব ভুলতে বসেছিলাম। কিন্তু আজ এই সুন্দর সন্ধ্যায় সেই অভিশাপ কি আচমকা আবার ফিরে এলো? বিশেষ কাজ ছিলো না, ঘরে বসে গল্পের বইয়ের পাতা নাড়তে নাড়তে রজতের পথ চেয়ে ছিলাম। পাশের ঘরে লক্ষ্মীর মা কাজকর্ম সেরে ঘুম দিয়েছে। এমন সময় হঠাতে শুনতে পেলাম সেই হাড় হিম করা আওয়াজটা। একবার-দুবার নয়, বারবার। ভুল বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই।

শব্দটা নীচের বাগানের দিক থেকে আসছে। এবার আমি একটা পায়ের আওয়াজ পেলাম। কে যেন আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। আমি সন্তর্পণে আলোটা নিভিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। রজতকে যে মোবাইলে যোগাযোগ করবো সে বুদ্ধি বা শক্তিটুকুও আমার নেই।

কলিংবেল বাজলো — একবার, দুবার, তিনবার। আমি দরজা না খুলে জড়েসড়ে হয়ে বসে আছি। যে দরজায় দাঁড়িয়ে, সে যেন ইত্ততঃ করছে। তারপর চাবি ঘুরতে শুরু করলো। খট্ট করে খুলে গেলো দরজা।

আমি আর্তনাদ করতে যাচ্ছি, হঠাতে পরিচিত গলার আওয়াজ শুনলাম, “কী ব্যাপার, বাড়িতে কি মানুষজন নেই নাকি!”

রজত! আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। ও আলোটা জ্বেলে দিলো। তারপর আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বললো, “কাণ্ডটা কী, ঘেমে নেয়ে উঠেছো দেখছি!”

থরথর করে কাঁপতে বললাম, “আমার ভয় করছে, ভীষণ ভয় —”

ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তারপর একটু পরে বললো, “ঠিক আছে, এখন তো আমি এসে গেছি। যাও, আগে জামা-টামা চেঙ্গ করে নাও।”

“রজত, আমার মন বলছে একটা কিছু ঘটবে — খুব খারাপ একটা কিছু —”

ও আমার দিকে চেয়ে হাসলো। তারপর বললো, “ঘটবে, তবে খুব ভালো একটা কিছু। উষ্টর মুখার্জি একটু আগে কনফার্ম করলেন, তোমার জন্য ‘গুড নিউজ’ আছে।”

“পাজি — এতক্ষণ আমায় বলেনি!” আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

“সুযোগ হলো কোথায়! খবরটা তো এইমাত্র মোবাইলে পেলাম আর তারপর তুমি যা কাণ্ড বাধালে!”

এতক্ষণে আমার হ্রেশ ফেরে। ছি ছি, রজত সারাদিন পর বাড়ি ফিরলো আর আমি ওকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানালাম! “যাও, তুমি হাতমুখ ধোও, আমি চা আনছি” বলে কোনোমতে রান্নাঘরে পালিয়ে মুখ লুকিয়ে বাঁচলাম।

খেতে বসে রজত বলে, ‘‘কখনো কিছু বলার জন্য তোমায় চাপ দিই না। তবে এখন তো বুঝতে পারছো তোমার শরীর-মন সুস্থ রাখা কত দরকার। তাই কোনো অসুবিধা হলে – মানে, অস্বাভাবিক কিছু মনে হলে খুলে ব’লো। অবশ্য যদি আমার ওপর তোমার ভরসা থাকে। কোনো বাস্তব সমস্যা হ’লে তার সমাধানে কোনো ক্রটি হবে না। আর তা যদি নাও হয়, উপযুক্ত পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।’’

অর্থাৎ কাউন্সেলিং? অভিমানভরে বলি, “তোমাকে না বললে কাকে বলবো রজত, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? অনেক চোখের জলের পথ পেরিয়ে আমি তোমাকে পেয়ে সব ভুলে গেছি। কিন্তু সেই বিভীষিকাময় অতীত এখনো মাঝে মাঝে আমায় তাড়া করে। তোমাকে সবই খুলে বলবো। তারপর তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাও, যাকে খুশি দেখাও কোনো মানা করবো না। শুধু আমাকে দু-একটা দিন সময় দাও, ব্যাপারটা মনের মধ্যে একটু গুছিয়ে নিতে দাও।”

“তাড়া কিসের!” রজত স্নিফ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, “শুধু ভালো থেকো, আনন্দে থেকো। আর ভরসা রেখো – আমি যখন পাশে আছি, বুক দিয়ে তোমাকে আগলে রাখবো।”

সেই প্রশংসন বুকের আশ্রয়ে আমার রাত কাটলো, আবার এলো একটি সহজ, স্বাভাবিক ভোর। তখন কি জানি যে এমন নিশ্চিন্ত ভোর আমার জীবনে আর কখনো আসবে না!

রজত অফিসে চলে গেছে, আমি ঘরদোর গোছাবার কাজে ব্যস্ত। ওর প্যান্টটা বদলে দিয়েছি। পুরোনো প্যান্টটা ওয়াশিং মেশিনে দেবো – সরাতে গিয়ে পকেট থেকে ঠঁ করে পড়লো একটা জিনিষ। নীচু হয়ে দেখি, একটা অঙ্গুত, ছোট বাঁশি।

কী ভেবে বাঁশিতে ফুঁ দিই আর মুহূর্তে ঘর কেঁপে ওঠে সেই পরিচিত গোঙানিতে, শয়তানের কান্নায়। নিশ্চিত হবার জন্য আবার চেষ্টা করি, আবার। তারপর আমার হাত থেকে বাঁশিটা পড়ে যায়, মাথা ঘুরে ধপ্ত করে বসে পড়ি।

লক্ষ্মীর মা কাজ করছিলো। এগিয়ে এসে বলে, ‘‘কী হলো দিদি?’’

‘‘কই, কিছু না তো, মাথাটা একটু ঘুরে গেছিলো।’’ আমি বলি, ‘‘তুমি কিছু শুনলে লক্ষ্মীর মা?’’

‘‘কী আবার শুনবো?’’ ও ভুরু কোঁচকায়।

‘‘না, মানে কী মজার বাঁশি দেখো – বাজালেও শোনা যায় না।’’ আমি জোর করে হাসি।

ও বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বলি, ‘‘তুমি একবার ছুটি নেবে বলেছিলে না – তা আজই বরং চলে যাও। রাতেও আর আসতে হবে না।’’

‘‘না, আজ নয় – তোমার শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না।’’

ও আমাদের সত্যিই খুব ভালোবাসে। কাছে টেনে এনে চুপিচুপি বলি, ‘‘আসলে বুঝলে না, দাদাবাবু আজ হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরবে। আমাদের আজ একটু বিশেষ ব্যাপার আছে।’’

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ও শেষ অবধি মুখ টিপে হাসে। একটু পরেই ছোট একটা পোঁটলা নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে আমি ওর হাতে জোর করে কিছু টাকা গুঁজে দিই।

তাহলে এই সেই মরণ বাঁশি – যার বাঁশরিয়া আমার স্বামী রজত! এক বটকায় পর্দা সরে গিয়ে এক নিষ্ঠুর সত্য আমার সামনে মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে – এই বাঁশরিয়াই আমার দিদি ও বাবার নির্মম হত্যাকারী। বিস্মিতপ্রায় অতীত রোমশ্বন করে একথাও এবার অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এই রজত পালকি পড়ুন ও পড়ান [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

বেসই আমার পিতৃবন্ধু কুগাল বোসের একমাত্র সন্তান। অলৌকিকভাবে নৌকাড়ুবি থেকে রক্ষা পেয়ে সে সন্তুষ্টতাঃ তার সেই দূর সম্পর্কের আত্মায়ার কাছে গোপনে বড় হয়ে উঠেছে আর পিতৃদণ্ড মেধার জোরে একের পর এক সাফল্যের সোপান অনায়াসে অতিক্রম করেছে। কিন্তু ছেলেবেলার সেই নির্দারণ দিনটি যে প্রতিহিংসার আগুন তার বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো তা কখনো নেভেনি। দিদি আর বাবা এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ অবধি সে একটিই ভুল করে ফেলেছে। গভীর জঙ্গলে এই ব্যাধভীতা হরিণীটিকে হাতের মুঠোয় পেয়েও সে তাকে ধ্বংস করার বদলে প্রবল ভালোবেসে ফেলেছে।

এ তুমি কী করলে, রজত! তুমি কি জানো না – শক্রের শেষ রাখতে নেই?

আর এই বাঁশিও এবার আমি চিনেছি – একে বলে ‘ডগ হাইস্ল।’ এই হাইস্ল বাজিয়ে ছোট্ট রজত তার কুকুর সঙ্গীকে ডাকতো – যে সঙ্গী নিজের জীবন দিয়ে ছোট্ট প্রভুর জীবনরক্ষা করে গেছে।

এই বাঁশির উচ্চ কম্পাক্ষের আওয়াজ সাধারণ মানুষের শ্রতিসীমার বাইরে, শুধু কুকুরের কানেই ধরা পড়ে। বুঝতে পারছি, আমার ব্যতিক্রান্ত শ্রবণযন্ত্রে সাধারণের শ্রতির অগোচর কিছু উচ্চস্বরের শব্দও ধরা পড়ে আর জানান দেয় এক অশ্রুতপূর্ব, দানবিক আওয়াজ হিসাবে।

আমার ধারণা, রজতও এ আওয়াজ শুনতে পায় না। তবু এই বাঁশি সে প্রাণে ধরে ফেলতে পারেনি। হয়তো এই বাঁশি তার বিষাদ ঢাকা মোহময় অতীত। জীবনের স্মরণীয় সন্ধিক্ষণে উত্তেজনায় বা আবেগে যখন সে অতীতকে কাছে পেতে চায় তখন এই বাঁশিতে ফুঁ দেয়।

ওই শয়তানের বাঁশি! কী ক্ষতি ছিলো যদি রজত ওর মোহ ত্যাগ করতে পারতো অথবা যদি আমি হতভাগীই ওর আওয়াজ না শুনতে পেতাম! মিথ্যের মায়ায় বেশ তো কেটে যাচ্ছিলো জীবন। কি দরকার ছিলো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে সত্যের আলোয় নগ্ন হয়ে পৃথিবীর সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হবার!

আমার শরীরের ভেতর উষ্ণ প্রবাহ বইছে। ঘৃণা, ভালোবাসা, দুঃখ, অভিমান সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এ আমার কী হলো? রজত, তোমায় যে আমি ঘৃণা না করেও পারবো না আবার ভালো না বেসেও পারবো না। এখন আমি কী করি? আমি তো কোনো পাপ করিনি – তবে কেন আমার এমন শাস্তি হলো?

মাথায় আগুন জ্বলছে। তবু আমাকে স্থির থাকতে হবে। বুঝতে পারছি অনেক কাজ বাকি, কিন্তু সময় হঠাৎ ফুরিয়ে এসেছে।

আমি আমার বিবাহিত জীবনের এক অলিখিত পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলাম – রজতের গোপন ডায়েরি পড়লাম। আমার আর উপায় ছিলো না।

সব কিছুর মধ্যেও আমি নিশ্চিত হতে পেরেছি যে রজতের আমার প্রতি ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিলো না। ডায়েরির ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ। পৈতৃক অধিকার ফিরে পাবার জন্যে নয়, করণ্ণা করে নয়, অনুত্তাপেও নয় – ও শুধু আমার জন্যেই আমাকে চেয়েছে। সবই যখন গেলো, এটুকু আমার পাওনা ছিলো।

আমাদের বিয়ের দিন ও লিখেছে, “সুচন্দার মা”র অস্ততাঃ একটি বাসনা পূর্ণ হলো। তিনি খুব চাইতেন প্রিয় বান্ধবী কৃষ্ণার ছেলের সাথে ছোট মেয়েটির বিয়ে দেন।”

আর ডায়েরির শেষ লেখা গতকাল রাত্রে – ““চন্দা মা হতে চলেছে। আমার প্রায়শিত্বের কি শুরু হলো?”

না রজত, আমি পারবো না! এত কিছুর পরও পোড়া চোখে জল কেন আসে কে জানে – আমি তোমায় নিয়ে বাঁচতে পারবো না। আবার তোমায় ছাড়াও বাঁচতে পারবো না। কতবার ভাবছি নিঃশব্দে বিলীন হয়ে যাই। কিন্তু তোমায় আমি একা ছেড়ে যেতে পারবো না, রজত। তোমার যে আর কেউ নেই।

আমি নিরূপায়।

মা, তোমার অবোধ সন্তানকে ক্ষমা ক'রো। ভগবান, এই নরম লাজুক মেয়েটিকে যখন এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেললে, তাকে উত্তীর্ণ হবার শক্তি দাও।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। একবা বাড়িতে আমি সাজতে বসেছি। রজতের আসার সময় হয়ে এলো। ও নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে। আমার দিকে মুঝ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। তখন যদি আমায় আলিঙ্গনে বেঁধে অন্তরঙ্গ হতে চায়, আমি ফিস্ফিসিয়ে বলবো, “এখন নয়, রাতে!”

তারপর রাত হলে আমি গিয়ে বসবো শয়নকক্ষের লাগোয়া প্রসাধনে। সেখানে প্রসাধন সামগ্রীর পাশে স্তুপীকৃত হয়ে আছে আমার ফ্যান্টেরির অজ্ঞ নমুনা শিশি। তার থেকে আমি বেছে রেখেছি এক পারদ যৌগ, যার কণামাত্র ওষুধে ব্যবহৃত হয় আর বোতলের বাইরে জলহাওয়ার ছোঁয়ায় যা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় প্রাণান্তক হলাহলে।

ওই শ্বেতচূর্ণ দরাজ হাতে টেলে মেশাবো আমার অঙ্গপ্রসাধনে। আমার পেলব দুঃখবল অঙ্গে সেই প্রলেপ মিলেমিশে বিলীন হয়ে যাবে। তারপর যখন আমরা শয্যায় গভীর আশ্বেষে একত্রিত হবো, দুরন্ত আবেগের মুহূর্তে সেই বিষকুস্তব্য তুলে দেবো দয়িত্বের শিশুর মতো নিশ্চিন্ত ওষ্ঠাধরে আর অচিরেই চুম্বনে, দংশনে অধীর উন্মত্তায় সেই কালকূট ছড়িয়ে পড়বে দয়িত্বারও শিরায়-উপশিরায়। প্রথিবী মাতাল হবে, রাত উচ্ছল হবে আর রক্তপ্রোত হবে উদাম। তারপর একসময় কাঁপতে কাঁপতে ধীরে ধীরে প্রথিবী স্থির হয়ে আসবে আর আমরাও তলিয়ে যাবো পরম শান্তির শীতল ছায়ায়।

--- তুঙ্গ মম শ্যামসমান।

এখন তাই আমি অভিসারিকার বেশে প্রতীক্ষায়।

## পালকি

### অঞ্জন নাথ

বুয়ালজুর গ্রামের সতীনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পন্ন গৃহস্ত – স্ত্রী, বছর ছয়েকের মেয়ে ননী, দু বছরের ছেলে ভানু ও মাকে নিয়েই ছোট সংসার। ওরা কুলীন আক্ষণ, তাই নানা রকম নিয়ম কানুন, সংস্কার ও সামাজিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে হয়। বাড়ির মেয়ে বৌদের কোন পুরুষের সাথে ছাড়া বাড়ির বাইরে একা যাওয়া একেবারেই বারণ, সেই জন্য ননী বাড়ির ভেতরেই থাকে – উঠোন, পেছনের বাগান ও পুরুর ঘাটের মধ্যেই ওর প্রথিবী – মানুষ সমান উঁচু ফাটা বাঁশের বেড়ার বাইরের জগৎ ওর কাছে প্রায় অপরিচিত। তবে উঠোনের কোনায় বেড়ার পাশে করমচা গাছের পেছনে দাঁড়ালে বাড়ির ভেতর থেকে বোঝা যায় না – ওখানে বাঁশের বেড়ার গায়ে ছোট একটা ফুটো করে নিয়েছে যার ভেতর দিয়ে বাইরের জগৎ ওর কাছে খুলে যায়। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে কত লোকজন, গরু ছাগলের যাতায়াত – কত মুখ ওর চেনা হয়ে গিয়েছে আর ওদের ও নিজস্ব নামও দিয়েছে। সকালে ঘাড়ে লাঙ্গল নিয়ে বলদের দড়ি হাতে চাষীরা চলে মাঠে চাষ করতে, গরু মোষের দল নিয়ে রাখালরা চলে মাঠে চরাতে, তারপর হাতে শ্লেট আর বই নিয়ে পড়ুয়ার দল চেঁচামেচি করতে করতে যায় পাঠশালাতে, গরুর গাড়িতে করে কত জিনিষ নিয়ে লোকে কোথায় যায় কে জানে, ধান কাটার সময় হলে গরুর গাড়ি বোঝাই ধান আর খড় যায় চাষীর বাড়িতে, ছাতা মাথায় পুরুতমশাই মস্ত টিকি নাড়তে নাড়তে চলেন কোন যজমানের বাড়ি, আরো কত লোক – বিভোর হয়ে এদের দেখতে দেখতে কি করে সময় কেটে যায় ননী জানে না। মাঝে মাঝে বাবার হাত ধরে চষ্টীমন্ডপে কোন পুজো দেখতে আর নয়তো ওর সই বকুল ফুলের বাড়ি যাওয়ার মধ্যেই বাইরের প্রথিবীর সাথে ওর যোগাযোগ। তবে গ্রামে যাত্রা এলে ননীর আনন্দ ধরে না – তখন গরুর গাড়ি করে মা ঠাকুমার সাথে যাত্রা দেখতে যায় – সীতা হরণ, কংস বধ এই সব। যাত্রা অবশ্য কোন দিনই ওর পুরো দেখা হয় না – আদেক দেখার পর ঠাকুমার কোলে ও চলে যায় ঘুমের দেশে তবে সেই যাত্রার রেশ চলে অনেকদিন – ওই নিয়ে হাজারো প্রশ্ন ঠাকুমাকে – মনে মনে যাত্রার নায়ক নায়িকা সেজে একা একাই পার্ট বলে আপন মনে আর নয়তো ওর পুতুলদের দিয়েই যাত্রা করায়। ননীর সমস্ত দিন কাটে ভাইকে সামলে আর না হলে উঠোনের কোনে ওর পুতুল ঘরে – ঠাকুমা ন্যাকড়া দিয়ে অনেক পুতুল বানিয়ে দিয়েছে – ছেলে, মেয়ে, বাচ্চা আর ওদের নিয়েই ওর ছোট পুতুল-সংসার। ওদের ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে ঘুম পাড়ায়, দুধ খাওয়ায়, ছোট ছোট মাটির হাঁড়িতে ঘাস পাতা দিয়ে রাখা করে ওদের জন্য। তাও ভালো না লাগলে উঠানে দাগ কেটে একা একাই একা দোকা খেলে। মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ায় পেছনের বাগানে বড় বড় আম কাঠালের গাছের তলায় – ওখানেই ওর কল্পনার ব্যাঙ্মা-ব্যাঙ্মীর দেশ, রাজকুমারের সাথে আপন মনে গল্প করে না হলে পুরুর ঘাটে বসে মাছেদের মুড়ি খাওয়ায়, ওদের ঘাই মারা দেখে, কখনও বা লুকিয়ে পেয়ারা গাছে উঠে ডাঁশা পেয়ারা খায়, তবে মা দেখতে পেলে চেঁচাতে থাকে,

‘ধিঙ্গী মেয়ে, দুদিন পর শুশুরবাড়ি যাবি – গাছ থেকে পড়ে কোন খুঁত হলে তো আর বিয়েই হবে না।’

সারা দিন উঠতে বসতে এই শুশুরবাড়ির কথা যে কত বার শুনতে হয় তার ইয়াত্রা নেই – ননীর কাছে শুশুরবাড়ি একটা ভয়ানক জায়গা আর ওখানে মেয়েরা একটু বড় হলেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় সারা জীবনের জন্য বন্দী হয়ে থাকতে – সেখানে শাশুড়ি নামের এক ভয়ানক চেহারার মহিলা হাতে যমদূতদের মত ডাঙস নিয়ে বৌকে পেটায় আর ননদিনীরা উঠতে বসতে চিমটি কাটে। এই কল্পনার জগৎ নিয়েই ননীর দিন কেটে যায় – সন্ধ্যা হলেই ঠাকুমার কোলের কাছে গুটিঙ্গি মেরে বসে, কখন ঠাকুমা জপ শেষ করে গল্প শোনাবে। ধীরে

ধীরে ঘুমে ঢলে পড়লে মা এসে নিয়ে গিয়ে জোর করে মুখে দুধ ভাত তুলে খাইয়ে দেয় — তারপর আবার স্বপ্নের জগতে। মাসে হয়তো একদিন বাবা দিয়ে আসে বকুল ফুলের বাড়ি নয়তো বকুল ফুল আসে ওদের বাড়ি — সারাদিন ধরে ওরা দুজনের কল্পনা ভাগ করে নেয় — পুতুলের বিয়ে দেয় তারপর পুতুল মেয়েকে পুতুল শাশুড়ী ডাঙস দিয়ে মারলে কাঁদতে থাকে। সেদিনটা যে কি করে এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় বুবুতেই পারে না — ওদের কত গল্প অসমাপ্ত থেকে যায়। সে বছরই যখন বকুল ফুলের বিয়ে হয়ে দূরের কোন গ্রামে চলে গেলো ননী মাটিতে পড়ে কেঁদেছিলো — ওর যে আর কোন বন্ধু রইলো না। এখন একমাত্র সহায় ঠাকুমা — বাবাকে দেখা তো ভাগ্যের কথা আর মা ছোট ভাই ও সংসার নিয়ে সারা দিনে সময়ই পায় না ওর সাথে দুটো কথা বলার। কোন দিন হয়তো হঠাৎই বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে ননী ওঁকে ডেকে নিজের পুতুল ঘরে এনে বসায় তারপর ওর ছোট ছোট হাঁড়িতে ধুলো, পাতা এই সব দিয়ে ভাত তরকারি রান্না করে খেতে দেয়। সতীনাথ মেয়েকে ভীষণ ভালোবাসেন — ওঁর সুন্দর ননী যার পান পাতার মত ছোট ফর্সা মুখে ডাগর ডাগর চোখ, পাতলা নাক, এক মাথা চুলের ঢাল পিঠ বেয়ে পড়েছে, একে কোন রাজপুত্রের সাথে বিয়ে দেবেন — ননী বাড়ি থেকে চলে গেলে ওঁর তো চারদিক অঙ্ককার — শৃঙ্গরবাড়িতে যদি কষ্ট দেয় তবে তো সহ্য হবে না। যদিও গিন্নী কিছুদিন ধরেই তাড়া দিচ্ছে মেয়ের জন্য ছেলে খোঁজার ব্যাপারে তবুও সতীনাথ গড়িমসি করছেন — মেয়েটা যতদিন পারে ওর কাছেই থাক। এবার মা ওঁকে ধরলেন,

‘সতু, আর কত দিন মেয়েটাকে আইবুড়ো করে রাখবি রে। কুলিনের মেয়ে — গ্রামে তো টিটি পরে যাবে। বয়েস তো সাত পেরিয়ে যাচ্ছে — এর পর ভালো বংশের ছেলেও পাবি না — যা তা ঘরে তো দিতে পারা যায় না — বংশ মর্যাদা বলে একটা ব্যাপার আছে। এবার একটু গা লাগিয়ে খোঁজ বাবা — হৃষি করলেই তো আর ছেলে পাওয়া যায় না।’

মার তাড়া খেয়ে অবশ্যে সতীনাথ ছেলে খুঁজতে লেগে পড়লেন — ছেলে ও বংশ দুটো একসাথে আর পচন্দ হয় না — দু তিন জন ঘটককেও আশে পাশের গ্রামে ভালো বংশের ভালো ছেলে খুঁজতে লাগিয়েছেন।

এখন মা ননীকে নিয়ে পড়েছে — যখন তখন রান্না ঘরে ননীর ডাক পড়ে। লাল ডুরে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে মার সাথে উনুন ধরানো, কুটনো কোটা, কড়াইতে তরকারি নাড়া, ঘর ঝাড়ু দেওয়া এই সব কাজ শেখে।

‘বাড়ির কাজ কর্ম না শিখলে শৃঙ্গরবাড়িতে আমাদেরই তো বদনাম হবে — বলবে কোন কাজ না শিখিয়ে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। — ধিঙ্গীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটবি না, এক্ষা দোক্ষা খেলবি না — হাঁটা, চাল চলন ঠিক কর। — ড্যাব ড্যাব করে লোকের দিকে তাকালে সবাই খারাপ মেয়ে বলে। — বড়দের সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হয়। —’

এই রকম হাজারো উপদেশ সারা দিন চলতে থাকে। বেশ ছিলো আগে — ঠাকুমা বিয়ের জন্য বাবাকে তাড়া দেওয়ার পর থেকেই ওর জীবনটা পালটে যাচ্ছে — দিনভোর শুধু শৃঙ্গরবাড়ি আর শৃঙ্গরবাড়ি — ডাঙসের ভয় ওর দিন দিন বাড়তেই থাকে। কেন মা বাবা ওকে অন্য বাড়িতে জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছে? কোন অন্যায় তো করে নি যে ওকে এত বড় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ওর ছোট মাথায় এর কোন উত্তর নেই তাই ঠাকুমাকে ধরে পড়লো।

‘ঠাম্মা, মেয়েদের বিয়ে করতে হয় কেন?’

‘সেকি রে? একি অলুক্ষুণে কথা! ভগবান তো মেয়েদের পাঠিয়েছেন অন্য বাড়ির জন্য সেটা জানিস না। মা বাবার কাজ হলো মেয়েকে বড় করে বিয়ে দেওয়া — মেয়েরা তো শৃঙ্গরবাড়ির জন্যই — মেয়ের ওপর মা বাবার তো কোন অধিকার নেই। মেয়েদের কাজই হলো স্বামী, শৃঙ্গ, শাশুড়ীর সেবা করা, রান্নাবান্না করা, পালকি পড়ুন ও পড়ান [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

সংসার সামলানো, ছেলেমেয়ে মানুষ করা – এই তো মেয়েদের জীবন আর আধিকাল থেকে এই নিয়মই তো চলে এসেছে। দ্যাখ, আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ – তোর বিয়ে সময় মত দিতে না পারলে সমাজের কাছে তোর বাবার মাথা যে হেঁট হয়ে যাবে – সেটা কি ভালো কথা – তুই-ই আমাকে বল?’

এর পর আর কোন প্রশ্ন ওঠে না – ননী চুপ করে কিছু সময় ভাবলো,

‘আচ্ছা ঠাম্মা, তোমার কোন নাম নেই?’

ঠাম্মা ফোকলা মুখে হাসলো,

‘আচ্ছা বোকা মেয়ে তো! মেয়েদের নিজের কোন পরিচয়ই নেই। ছোটবেলায় মা বাবারা আদর করে কোন নাম দেয়, যেমন তোর নাম ননী, তবে বাইরের কজন জানে? তোকে তো সবাই সতুর মেয়েই বলে। বিয়ের পর মেয়েরা হয়ে যায় অমুক বাড়ির বৌ, তারপর ছেলে হলে অমুকের মা, এই রকম। এই দ্যাখ না, আমি এখন কেবলই সতুর মা। বাবা তো আমাকে ছয় বছর বয়েসেই গৌরীদান করেছিলো। আমার কি ছাই মনে আছে মা বাবা কি নামে ডাকতো - ছোট বেলার মা বাবার দেওয়া নাম কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।’

ননী মনে মনে ঠিক করলো মা বাবার দেওয়া ননী নামটা ও কিছুতেই ভুলবে না। চুপ করে কিছু সময় নিজের মনেই ভাবলো তারপর ওর মনের কোনের সেই প্রশ্নটাই করলো – যদি ঠাকুমার কাছে কিছু আশা পাওয়া যায়।

‘ঠাম্মা, আমি আরো কিছুদিন তোমাদের কাছে থাকি না।’

ঠাকুমা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বললো,

ওমা, সে কি কথা রে! তোর বয়েস তো সাত পেরিয়ে যাচ্ছে – কুলীন বাড়ির মেয়ে – আর দেরি করলে তো তোর বাবাকে যে নরকে যেতে হবে। জানিস না, গৌরীদান করার মত পুণ্যি আর কিছুতেই নেই – সতু তো তাও দেরি করে ফেলেছে। তোর সহ বকুল ফুলের বিয়ে সাত বছর বয়েসেই হয়ে গিয়েছে।’

এই সব অকাট্য ঘুঙ্কির কাছে আর কোন কথাই ওঠে না তার উপর ও ভাবতেই পারছে না ওর বাবাকে নরকে যমদূতরা ডাঙ্গস দিয়ে মারছে – এর থেকে ভালো বিয়ে করা – তাহলে তো বাবা বেঁচে যাবে। বরং আমিই না হয় শাশুড়ির ডাঙ্গস খাবো – সেই ভালো। ননীর ছোট মাথায় এর থেকে বেশী আর কিছু এলো না – ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে চলে গেলো পেছনের পুরুর ঘাটে নিস্তরঙ্গ জলে নিজের মনের ছায়া দেখতে।

কিছুদিনের মধ্যে ঘটক খবর নিয়ে এলো এখান থেকে প্রায় চার ক্রেশ দূরে দুধপাতিল গ্রামের বিশ্বস্ত চট্টোপাধ্যায়ের উপযুক্ত ছেলে আছে – নবকৃষ্ণ – বয়েস বছর চৌদ্দ – চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে – ছোট বোনের বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছে – সেই হিসাবে নির্বঞ্চিত সংসার। বিশ্বস্ত চট্টোপাধ্যায় কবিরাজ – জমিজমা ভালোই আছে – সচ্ছল সংসার। মায়ের কথা মত শুভদিন দেখে ভোর বেলা ঘটককে নিয়ে সতীনাথ গরুর গাড়িতে বেরিয়ে পড়লেন দুধপাতিল গ্রামের দিকে। সন্ধ্যার মুখে ফিরে এসে বললেন, শুভ খবর – বিশ্বস্ত চট্টোপাধ্যায়রাও আগ্রহী – ছেলে দেখতে রাজপুত্রের না হলেও ননীর সাথে মানাবে ভালোই – পড়াশুনায় খুব মন। দিন দশেক পর বিশ্বস্ত বাবুরা সদলে মেয়ে দেখতে এলেন – এক নজরেই ওদের পছন্দ হয়ে গেলো। বিয়ের দিন ঠিক হতেও দেরি হলো না – বাড়িতে সবাই এখন বিয়ে নিয়ে খুব ব্যস্ত – শুধু ছোট ননীর মুখের হাসি দিন দিন শুকিয়ে এলো – দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটে পুরুর ঘাটে – মনে মনে নিজেকে তৈরি করছে শাশুড়ির ডাঙ্গস খাবার জন্য। একদিনই শুধু ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো,

‘ঠাম্মা, শুশুরবাড়িতে কি শাশুড়ি ডাঙ্গস দিয়ে মারবে?’

ঠাকুমা হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলো,

‘তা কেন রে – দেখিস শ্বাণ্ড়ী তোকে কত আদর করবে। তখন তো তুই আমাদের কথা ভুলেই যাবি।’

ঠাকুমার এই কথাটা ওর মনে একটু আশার আলো দিয়েছে। মা এখন ওকে নিয়ে পড়েছে ঘসে মেজে আরো সুন্দর করার জন্য – রোজ স্নানের পরে মাথায় গন্ধ তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে সুন্দর করে বেঁধে দেয় – শিখিয়েও দেয় কি করে চুল বাঁধতে হবে। মার চিন্তা ননী কি করে ওর এই পিঠ ছাপানো চুল নিজে বাঁধবে।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেলো। বরযাত্রীরা এসে প্রথমে গ্রামের চণ্ডীমন্ডপে উঠবে – তাই ওখানে গরম গরম জিলিপি আর সিঙ্গাড়ার ব্যবহা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা বরকে পালকি করে নিয়ে আসা হবে – বিয়ের পর দিন সকালে বরযাত্রী লুচি আলুর দম খেয়ে রওয়ানা দেবে। আত্মীয় স্বজনে বাড়ি ভরে গিয়েছে – দুদিন আগে থেকে বাড়িতে ভিয়েন বসেছে মিষ্টি তৈরি ও রান্নার জন্য। সময় যে কি করে কেটে গেলো ননী জানে না – বিকেলে ওকে সুন্দর করে চন্দন দিয়ে সাজিয়ে একটা বেনারসি শাড়ি পরানো হয়েছে যার ওজনে বেচারি হাঁটতেই পারছে না। মা কোলে করে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিলো – ননী মাথা আর তুলছে না – দুই চোখ তো জলে ভরে আছে। শুধু শুভ দৃষ্টির সময় এক ঝলক একটা হাসি হাসি ঝাপসা মুখ দেখতে পেলো তারপর নানা রকম মন্তব্যের মধ্যে কাঁপা কাঁপা হাতে মালা বদল – বাসরে বসতে না বসতে ননী ঘুমিয়ে পড়েছে তারপর আর কিছুই জানে না। পর দিন ভোর বেলা থেকে আবার তোড়জোড় শুরু – মেয়ে বিদায়ের পালা – ওদের যে প্রায় চার ক্রোশ পথ যেতে হবে তিনটে গ্রাম ছাড়িয়ে – তাড়াতাড়ি না বেরংলে সন্ধ্যার আগে দুধপাতিল গ্রামে পৌছাতে পারবে না। বিশ্বস্তর চট্টোপাধ্যায় বরযাত্রীদের তাড়া দিয়ে তৈরি করাচ্ছেন – বিয়ের জিনিসপত্র নিয়ে রাত করা একেবারেই উচিত হবে না। নবকৃষ্ণের পেছন পেছন ননীকে কোলে নিয়ে মা ফুল দিয়ে সাজানো চার কাহারের পালকিতে তুলে দিলো তারপর চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে নবকৃষ্ণের হাত ধরে বললো,

‘বাবা নবকৃষ্ণ, মেয়েটা বড় আদরের - কষ্ট যেন না পায়।’

ঠাম্মা ননীর পছন্দের মোয়া আর নাড়ুর পোটলা তুলে দিলো রাস্তায় খাবার জন্য। ননীর চোখের জল আর বাঁধ মানছে না – মুখের সুন্দর করে সাজানো চন্দনের ফোঁটা আদ্বেকের ওপর ধুয়ে মুছে গিয়েছে – কে যেন ওর হাত মার গলা থেকে ছাড়িয়ে দিলো – এ বাড়ির সাথে শেষ সম্পর্কও ছিঁড়ে গেলো। সতীনাথ নতুন বেয়াইএর হাত জড়িয়ে ধরা গলায় বললেন,

‘বেয়াই মশাই, মেয়েটাকে দেখবেন – এখন থেকে তো ও আপনারই মেয়ে—’

এর বেশী কথা আর গলা দিয়ে বেরোলো না।

ধীরে ধীরে বরযাত্রীদের গোটা আঞ্চেক গরুর গাড়ি আর কনেপক্ষের গোটা ছয়েক গরুর গাড়িতে বিয়ের জিনিষ পত্র সহ কনেপক্ষের কয়েক জন শোভাযাত্রা করে বেরংলো আর ওদের মাঝখানে ইঁম-না হুঁম-না করতে করতে বর কনেকে নিয়ে চার কাহারের পালকি – কাহারদের চলার তালে তালে পালকি দুলছে। সতীনাথ সব গাড়িতেই ঝুড়ি ভরে অম্ভতি, লুচি, তরকারি, মোয়া তুলে দিয়েছেন রাস্তায় খাবার জন্য। একটু এগিয়ে তখনও ননীকে অবোরে কাঁদতে দেখে নবকৃষ্ণ ওর হাত ধরলো,

‘কেঁদো না, আমি তো আছি।’

ননীর কান্না আরো বেড়ে গেলো – নবকৃষ্ণ ওর হাত ধরে বসে রইলো। একটু পর ননীর মনে হলো এই হাতের ওপর ভরসা করা যায় – ধীরে ধীরে মুখ তুলে নবকৃষ্ণের দিকে তাকাতে ও আস্তে করে নিজের জামা দিয়ে ননীর গাল মুখ মুছিয়ে দিলো।

‘দেখলে না, একটু আগেই একটা পুরুরে পানকৌড়ি ডুব দিচ্ছিলো। আমরা না এখন তোমাদের গ্রামটা ছাড়িয়ে এসেছি।’

বলে পালকির দরজার পর্দাটা একটু খুলে দিতে মুহূর্তের মধ্যে ননীর সামনে বাইরের প্রথিবী নিজেকে মেলে ধরলো আর সেই বিরাট দৃশ্যের প্রতিটি খুঁটিনাটি ননীর বড় বড় বুভুক্ষু চোখ দুটো যেন গিলে থেতে লাগলো পাছে কিছু হারিয়ে যায়। রাস্তার দুধারে যতদূর দেখা যায় ধানক্ষেত, তবে ধান কাটা হয়ে যাওয়াতে শুধু গোড়াগুলো রয়ে গিয়েছে - অনেক গরু মোষ সেগুলো থাচ্ছে, কোথাও বা গাছের ডালে বসে ফিঙে লেজ নাচাচ্ছে, কোথাও বা কোন নাম-না-জানা পাখীর মিষ্টি ডাক ভেসে আসছে, অনেক গাছে বাবুই পাখীর অঙ্গুত সুন্দর বাসা হাওয়ায় দোল থাচ্ছে, মাঝে মাঝে কোন একলা ঘুঘু উদাস মনে ডাকছে। মাঠে ঝাঁকেঝাঁকে পায়রা, ঘুঘু আরও অনেক অচেনা পাখী পড়ে থাকা ধান খুঁটে থাচ্ছে। ছোট ছেট বাচ্চুরগুলো কাহারদের হুঁম-না হুঁম-না আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে দৌড়ানো দেখে ননীর খুব মজা লাগলো - মাঠের পাখীরাও চমকে উঠে কি সুন্দর ঝাঁক বেঁধে উড়ে গিয়ে আর একটু দূরের ধান ক্ষেতে বসলো। অনেক জায়গাতে চাষীরা মাটি কোপাতে শুরু করেছে নতুন ফসল চাষের জন্য আর মাটি নরম করার জন্য পাশের ছেট খাল থেকে কি সুন্দর বাঁশের কল দিয়ে জল তুলে জমিতে ঢালছে - একটা মোটা বাঁশের ওপর দাঁড়িয়ে আর একটা লম্বা বাঁশকে ধরে টানছে আর সেটার মাথায় লাগানো সুপুরি গাছের খোলে জল উপরে উঠে জমিতে পড়ছে - ননী অবাক হয়ে ওই কলটার দিকে তাকিয়ে রইলো ওটা পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। বিয়ের শোভাযাত্রা দেখে মাঠের চাষীরা হাতের কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে পড়েছে - রাস্তার কাছের দু এক জন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

‘কোন গ্রামের বর কনে চলেছে গো?’

কাহাররা হুঁম-না হুঁম-নার ঝাঁকে জানালো,

‘দুধপাতিল গ্রামের বিশ্বন্তর চট্টোর ছেলে - বুয়ালজুর গ্রামের সতীনাথ মুখোর মেয়েকে বিয়ে করে ফিরছে গো-ও।’

রাস্তার পাশের একটা বিলের জল প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে - বেশীর ভাগ জায়গাতেই কাদা তবে মাঝে মাঝে এখনো বেশ জল আছে আর তার মধ্যে প্রচুর বক, লম্বা লম্বা ঠোঁটওয়ালা সারস, কাদাখোঁচা আর আরো অনেক পাখী লম্বা ঠোঁট দিয়ে কাদা আর জলের ভেতর থেকে পোকা, ব্যাঙ এই সব বের করে থাচ্ছে। বকগুলো কেমন একদম না নড়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন বক-সন্ধ্যাসী আর হঠাৎই ঠোঁট নামিয়ে কপ করে কিছু একটা তুলে নিচ্ছে। সারসগুলোর কাঠি কাঠি ঠ্যাং দুটো যে এত লম্বা জলের মধ্যে বোঝাই গেলো না - উড়ে গেলেই বোঝা যায় কত লম্বা আর যখন উড়েছে ওদের পাখা দুটো কি বিরাট হয়ে যাচ্ছে - পা আর মাথা এক লাইনে চলে আসছে। মাঝে মাঝে গাছে বসে থাকা মাছরাঙ্গা হঠাৎই জলে ঝাঁপিয়ে ঠোঁটে ছেট ছেট মাছ তুলে নিচ্ছে - কি নজর রে বাবা! বিরাট নীল আকাশে অনেক চিল উড়েছে - মনে হয় ওদের নজরও বিলের জলের দিকেই। ননী নবকৃষ্ণের হাত টেনে বললো,

‘দ্যাখো, দ্যাখো, সারসগুলো কত বড় - বসে থাকলে বোঝাই যায় না।’

‘তুমি দেখো নি আগে?’

‘আমার তো বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ ছিলো - দেখবো কি করে? সারাদিন তো একা একাই খেলতাম - আমার তো কোন বন্ধু ছিলো না।’

‘এখন থেকে আমি তোমার খেলুড়ি হলাম - আমরা এক সঙ্গে বসে গল্প করবো, লুড়ো খেলবো।’

ନନୀ ମାଥା ହେଲିଯେ ପ୍ରଥମବାର ହାସଲୋ — ନବକୃଷ୍ଣ ଛେଳେଟା ମନେ ହ୍ୟ ଭାଲୋଇ ।

‘ଏୟାଇ, ନାଡୁ ଖାବେ? ଆମାର ଠାମା ନା ନାଡୁ ଆର ମୋଯା ଦିଯେଛେ ।’

ଏକଟା ବଡ଼ ଝିଲେର ପାଶେ ସବାଇ ଦାଁଡ଼ାଲୋ — କାହାରଦେର ଏକଟୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର । ନନୀ ଦେଖଲୋ କାଳୋ ଲୋକଗୁଲୋର ସମସ୍ତ ଗା ଘାମେ ଭିଜେ ଚକ ଚକ କରଛେ — ଓରା ରାନ୍ତର ଧାରେର ଘାସେ ବସେ ଘାଡ଼େର ଗାମଛା ଦିଯେ ଗା ପୁଞ୍ଚେ ଓଟା ନେଡ଼େ ନେଡ଼େ ହାଓୟା ଥେତେ ଶୁରୁ କରଲୋ । ଏକଦମ ପ୍ରଥମ ଗରୁର ଗାଡ଼ି ଥେକେ ବିଶ୍ଵସ୍ତର ଦେଖଲେନ ମାବେର ଗାଡ଼ି ଥେକେ ଓର ମେଯେ ଅନୁ ନେମେ ବର ନବୀନେର ହାତ ଧରେ ଦୌଡ଼ାଇଁ ପାଲକିର ଦିକେ — ମାଥାର ଘୋମଟା ଖ୍ସେ ପଡ଼େଛେ — ପିଠ ଛାପାନୋ ଏଲୋ ଚୁଲ ହାଓୟାତେ ଉଡ଼ିଛେ — ବଡ଼ ସୁଖେର ସେ ଦୃଶ୍ୟ । ମୁଚକି ହେସେ ପାଶେ ବସା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଶାଇକେ ବଲଲେନ,

‘କି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ଭାୟା, ଏଦେର ଦେଖେ କିଛୁ ମନେ ପଡ଼େ?’

ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଶାଇ ଥେଲୋ ଛାକୋତେ ଏକଟା ସୁଖ ଟାନ ଦିଯେ ଏକ ମୁଖ ଧୋୟା ଛାଡ଼ିତେ ଛାଡ଼ିତେ ହାସଲେନ,

‘ସେ ଆର ବଲତେ — ବିଯେର ସମୟ ଗିନ୍ନୀ ତୋ ଛିଲୋ ବହର ଛଯେକେର — ଆମି କିଛୁତେଇ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଶୋବୋ ନା - ରାତ୍ରେ ଯଦି ବିଚାନା ଭିଜିଯେ ଦେଇ? ଗିନ୍ନୀର ଆବାର ଶେଯାଲେର ଡାକେ ଭୀଷଣ ଭଯ — ରାତ୍ରେ ଶେଯାଲ ଡାକଲେଇ ଭୟେ ଗୁଡ଼ିଶୁଣ୍ଡି ମେରେ ଆମାର ପ୍ରାୟ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଚୁକେ ଯେତୋ । ଓର ବହର ଆଷ୍ଟେକ ବସି ହତେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ରାତ୍ରେ ଆମରା ଜାନାଲା ଟପକେ ପାଲିଯେ ଯେତାମ ମାଠେ, ଖାଲେର ଧାରେ — ଗିନ୍ନୀକେ ଅବଶ୍ୟ ଜାନାଲା ଥେକେ କୋଲେ କରେଇ ନାମାତେ ଓଠାତେ ହତୋ । ସେଦିନ କି ଆର ଫିରେ ଆସବେ ଭାୟା — ଏଖନ ଛେଲେ ମେଯେଦେର ଦେଖେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ।’

ଏର ମଧ୍ୟେ ଅନୁ ଓ ନବୀନ ପୌଛେ ଗିଯେଛେ ପାଲକିର କାଛେ — ଦୁଜନେ ପ୍ରାୟ ଏକଇ ସାଥେ ପାଲକିର ମଧ୍ୟେ ମାଥା ଢୁକିଯେ ହେସେ ଉଠିଲୋ ଆର ଓଦେର ଦେଖେଇ ନନୀ କେମନ କୁଁକଡ଼େ ଗେଲୋ ।

‘ଏୟାଇ ଦାଦା, ତଥନ ଥେକେ ଦୁଜନେ ପାଲକିର ମଧ୍ୟେ ଗୁଡ଼ି ଶୁଣ୍ଟି ମେରେ ବସେ ଆଛିସ - ଏବାର ତୁଇ ନାମତୋ, ଆମି ନତୁନ ବୌଏର ସାଥେ ଯାବୋ । ଗରୁର ଗାଡ଼ିତେ ବସେ ବସେ ଆର ବାଁକୁନି ଥେଯେ କୋମର ଧରେ ଗିଯେଛେ ।’

ନବୀନେର ମୁଖେ ଫିଚେଲ ହାସି — ଚୋଥ ମଟକେ ବଲଲୋ,

‘କି ରେ ନବା — ବଲି ହଚ୍ଛିଲୋଟା କି ଦୁଜନେ ମିଲେ? ଆମରା ଯେନ ବୁଝି ନା! ତା ନତୁନ ବୌଏର ସ୍ଵାଦ—’

ଅନୁର ଏକଟା ଜୋର ଚିମଟି ଥେଯେ ଉଃ କରେ ଉଠିଲୋ ।

‘ଏୟାଇ, ତୁମି ଫାଜଲାମି କରୋ ନାତୋ — ଅସଭ୍ୟ କୋଥାକାର । ଆନକୋରା ନତୁନ ବୌ — ତାର ସାମନେ ଯା ତା ବଲବେ ନା । — ଓମା, ଆମାଦେର ତୋ ଏଖନେ ଆଲାପଇ ହ୍ୟ ନି । ବୁଝାଲେ ବୌଦି, ଆମି ତୋମାର ନନ୍ଦ — ବସି କିନ୍ତୁ ତୋମାର ଥେକେ ବଡ଼ — ଏକଦମ ରାଯବାଘିନୀ — ତୋମାକେ ଖୁବ ଚିମଟି କାଟବୋ କିନ୍ତୁ । ଏଇ ଯେ ଏଟା ଆମାର କର୍ତ୍ତା — ବୁଝାତେଇ ପାରଛୋ ଭୀଷଣ ଫାଜିଲ — ଓକେ ଏକଦମ ପାତା ଦେବେ ନା ।’

ଏର ମଧ୍ୟେ ନବା ପାଲକି ଥେକେ ନବୀନ ଫୋଡ଼ନ କାଟିଲୋ,

‘ଏହି ଅନୁ, ଚଲୋ ନା ଆମରା ଦୁଜନେଇ ପାଲକିତେ ଉଠିଟି ।’

ଅନୁ ଜିଭ ଭେଂଚେ ଉଠିଲୋ,

‘ଇଲ୍ଲି ଆର କି, ତୋମାକେ ପାଲକିତେ ଉଠିତେ ଦିଚ୍ଛି ଆମି । ଦାଦାକେ ନିଯେ ସୋଜା ପାଲାଓ ଗରୁର ଗାଡ଼ିତେ । ଆମି ବୌଏର ସାଥେ ଗଲ୍ପ କରତେ କରତେ ଯାବୋ ।’

ଓରା ଚଲେ ଯେତେ ଅନୁ ନନୀର ଗା ସେବେ ବସଲୋ ।

‘ତୋମାର ସାଥେ ବାସରେ ତୋ ଗଲ୍ପ କରାଇ ହଲୋ ନା — ତୁମି ତୋ ଘୁମିଯେ କାଦା । ଅବଶ୍ୟ ସାରା ଦିନ ଯା ଧକଳ ଗିଯେଛେ — ଆମି ତୋ ବୁଝି । ଆମାର ବିଯେର ବାସରେ ଆମିଓ ଘୁମିଯେ ପଡ଼େଛିଲାମ ଆର ତୋମାର ନନ୍ଦାଇ ନା ଚିମଟି କେଟେ କେଟେ ଆମାକେ ତୁଳେଛିଲୋ — ଆମାର ଭୀଷଣ ରାଗ ହୁଯାତେ ଓର ହାତେ କାମଡ଼େ ଦିଯେଛିଲାମ ।’

বলেই অনু হেসে গড়িয়ে পড়লো তারপর ননীকে দুই হাতে জড়িয়ে গালে চুক করে একটা চুমু খেয়ে বললো,

‘তোমাকে না আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এ্যাই, তুমি আমার মৌটুসি হবে? আমি বাপের বাড়ি থাকলে আমরা খুব খেলবো – আমার পুতুলগুলো তোমাকে দিয়ে যাবো।’

তারপর ফিক করে হেসে ফেললো,

‘অবশ্য তোমার নন্দাই আমাকে থাকতে দিলে তবে তো – ও যাবার সময় কোন না একটা ছুঁতো করে আমাকে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। বলে কি না আমি না থাকলে ওর মনটা কেমন হুহু করতে থাকে তাই পড়া না করে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। ও ভাবে কর্তাকে ছাড়া কি যায়? তুমিই বলো। তাছাড়া আমি না থাকলে শাঙ্গড়ীমায়ের সংসার অচল – তাই তো দাদার বিয়ের জন্য কটা দিন মাত্র ছাড়া পেয়েছি।’

ননীর ননদিনী ভয় কেটে গিয়েছে – অনু কি সুন্দর ওকে আপন করে নিয়েছে। গল্পে গল্পে সময় কেটে যাচ্ছে – ওরা এখন একটা গ্রামে ঢুকেছে। রাস্তার ধারের একটা বড় পুকুরে কিছু ছেলে জলে ছাঁটোপাটি করছিলো – পালকি আর শোভাযাত্রা দেখে জল থেকে উঠে দৌড়ে পুকুরের এ পাড়ে চলে এসেছে – সব কটাই পুরো ন্যাংটো। ননীর মুখ লাল হয়ে গেলো,

‘এ্যাই মৌটুসি, ছেলেগুলো কি ভীষণ অসভ্য।’

অনু ফিক করে হেসে ননীর গালটা টিপে কানের কাছে মুখটা নিয়ে ফিস ফিস করে বললো,

‘তুমি তো একদম নতুন বৌ, তাই বিচ্ছিরি লাগছে। কিছুদিন যাক – আর লাগবে না।’

ব্যাপারটা ননীর মাথায় ঠিক ঢুকলো না। ওদের শোভাযাত্রা গ্রামের ভেতরের রাস্তা দিয়ে চলেছে – কারুর উঠানের পাশ দিয়ে, কারুর গোয়ালের গা ঘেঁসে, কলা বাগানের মাঝে দিয়ে। বৌ-ঝিরা বাড়ির কাজ ফেলে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখছে দাওয়া থেকে, উঠানের বাঁশের বেড়ার ধার থেকে। বাচ্চা ছেলে মেয়েরা দৌড়ে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে – অনেকে এক হাতে ইজের সামলাতে সামলাতে এসেছে। গ্রামের চণ্ণীমন্ডপের সামনে দিয়ে যাবার সময় ননী দেখে গ্রামের বুড়োদের দল থেলো হঁকো টানতে টানতে নিজেদের মধ্যে মক্ষরা করছে আর পাশার চাল দিচ্ছে। পাটশালার পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলো পড়োদের একসাথে চেঁচিয়ে এক-একে-এক, এক-দুগুণে-দুই পড়া আর পঙ্গিত মশাই ছোট মনোহারি দোকান চালাতে চালাতে হাতে বেত নিয়ে পড়াচ্ছেন। পুকুরপাড়ে কোন বাড়ির বৌ বাসন মাজতে মাজতে শোভাযাত্রা দেখে তাড়াতাড়ি এঁটো হাতের গোছে মাথার ঘোমটা আর গায়ের কাপড় ঠিক করে নিলো। আজ গ্রামের হাট নেই তাই বাজার প্রায় ফাঁকা – এধার ওধার তরকারির খোসা, আবর্জনা ছড়িয়ে – ঘেয়ো কুকুরগুলো শালপাতা চাটছে। একটু পরেই কামারের বাড়ির ধার দিয়ে যাবার সময় ননী দেখে গনগন করে হাপরে আগুন জ্বলছে আর সেই আগুনে লাল হয়ে যাওয়া লোহার উপর কামারের হাতুড়ির ঘায়ে চার দিকে আগুনের ফুলকি ছেটাচ্ছে। এই রকম কত ছবি ননীর চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক চলে গেলো ওর মনের গভীরে দাগ কেটে। গ্রামের পর আবার মাঠ – বর্ষার কাদা শুকিয়ে একেবারে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ফলে গরুর গাড়ি গুলো আর পালকি অনেক ধীরে চলেছে। পালকির দুলুনিতে ওরা দুজন এর ওর ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎই অনেক গলার আওয়াজ, শাঁখ আর উলুঞ্বনিতে ওদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো – অনু একটু উঁকি মেরেই বললো,

‘আরে বাপরে, আমরা তো বাড়ি পৌছে গিয়েছি – এ্যাই মৌটুসি, চটপট তোকে ঠিক করে দি – সব অগোছাল হয়ে গিয়েছে।’

বলে ননীর শাড়ি গোছ গাছ করে মাথার ঘোমটা লস্বা করে টেনে, নিজের আঁচল দিয়ে মুখটা ভালো করে পুঁছিয়ে দিয়ে সিঁদুরের গাছ কৌটোটা হাতে ধরিয়ে দিলো।

‘কিছু ভয় নেই, চুপ করে বসে থাক – এবার সবাই তোকে বরণ করতে আসবে। দেখি দাদা কোথায় গেলো – তোদের তো জোড়াতেই নামতে হবে।’

বলে পালকি থেকে বেরহতেই কয়েকজন মহিলা বলে উঠলো,

‘এ কি রে অনু, তুই কেন বৌর সাথে – নব কোথায়?’

বলতে বলতে নবকৃষ্ণ দৌড়ে এসে পালকিতে উঠেই গাঁটছড়ার চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলো। ননী এখন ভয়ে প্রায় কাঁপছে – এবার শাশুড়ী ডাঙ্গস হাতে আসছে – তারপর? ভয়ে নবকৃষ্ণের চাদরের তলা দিয়ে ওর হাত চেপে ধরেছে। এক মহিলা প্রদীপ হাতে পালকির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে আস্তে করে ঘোমটা তুলে খুতনীতে হাত দিয়ে ননীর মুখ তুলে ধরেছেন – ভয়ে ননীর চোখ বন্ধ, ঠোঁট কাঁপছে।

‘আহা, কি সুন্দর মেয়ে গো – ভয় পেয়ো না মা – তাকাও।’

আস্তে আস্তে ননী চোখ খুলে দেখলো একটা সুন্দর ঢলচলে হাসি মুখের মহিলা – চোখ দিয়ে স্নেহ ঝরে পড়ছে – ওই চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ননীর ভয় কেটে গেলো। মহিলা ননীর গালটা টিপে কপালে মিষ্টি একটা চুমু খেয়ে বললেন,

‘নব, তোর কপালটা খুব ভালো রে তাই এমন সুন্দর বৌ পেয়েছিস। বৌমা, আমি তোমার শাশুড়ী – নবর মা। এসো মা, আস্তে আস্তে নেমে এসো।’

বলে কোলে করে ননীকে পালকি থেকে নামিয়ে আনলেন – পেছন পেছন নবকৃষ্ণও নেমে এলো। আর এক বয়স্কা মহিলা এগিয়ে এসে ঘোমটা তুলে ননীর মুখ দেখে বললেন,

‘আরে, এত দেখছি বাঁদরের গলায় মুক্তের মালা – দস্যি নবর কপালটা দেখছি খুব ভালো বৌমা।’

ঘোমটার ভেতর ননী ফিক করে হেসে ফেললো। ধীরে ধীরে দুধ ও আলতা মেশানো থালায় পা ডুবিয়ে ছোট ছোট পায়ে দুধ আলতার ছাপ ফেলে ননী শুশুরবাড়িতে ঢুকলো।

### ঘোমটাঘোমটাঘোমটাঘোমটাঘোমটা

বৃন্দাশ্রমের দোতলার বারান্দায় বসে নিভাননী দেবী সামনের রাস্তার মানুষ ও গাড়ির ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন – সারাটা দিন ওঁর এই রাস্তা দেখেই কেটে যায়। পুরনো দিনগুলো সিনেমার ছবির মত নানা ঘটনার পসরা সাজিয়ে টুকরো টুকরো ভাবে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায় – ওরাই এখন ওঁর একমাত্র সঙ্গী। নিভাননীর আপন বলতে একমাত্র নাতি, সেও এখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদেশ পাড়ি দিয়েছে, তাই যাবার আগে ঠাম্বিকে এই বৃন্দাশ্রমে নিয়ে আসে। ভর্তি করার সময় নাম জানতে চেয়েছিলো – জীবনে এই প্রথম কেউ ওঁর নাম জিজ্ঞেস করলো। সূতির অতল গভীরে হাতড়ে খুঁজে পেলেন বহু স্বতন্ত্রে গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে রাখা সেই নাম – ননী। নামটা শুনে নাতি মুচকি হেসে ওর এই নতুন নাম নিভাননী দেবী খাতায় লিখিয়ে দিলো।

সেই ছোট ননী ছিয়াশীটা বছর পেরিয়ে জীবনের শেষ বেলায় এই বারান্দাতেই অপেক্ষায় বসে থাকে – কখন ওই রাস্তার মোড়ে সেই চার কাহারের পালকিটা আবার ফিরে আসবে ওকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য।

## সেলিব্রিটি

### দিব্যেন্দু বিশ্বাস

প্রতিদিনের মতোই সাইরেন বাজিয়ে টেবিল ঘড়িটা জানিয়ে দিল সকাল সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে। আর প্রচণ্ড অনিচ্ছা নিয়েও চোখ মেলে তিতাস বুঝতে পারল প্রতিদিনের মতোই সেই মনখারাপ আবার ফিরে আসছে। গত বেশ কয়েক বছর যে মনখারাপ নিঃসঙ্গ তিতাসের সারাদিনের সঙ্গী। রান্নাঘরে বাসনপত্র ধোঁয়ার আওয়াজ আসছে – তার মানে মা উঠে গেছে আগেই। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। আবারও একটা দিন শুরু হয়ে গেল!

তিতাস, তিতাস সেনগুপ্ত, কোলকাতার একটি নামী বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। বাবা কলকাতার একটি রাষ্ট্রীয়ত্ব ব্যাঙ্কের কর্মচারী, মা গৃহবধূ। মা সারাদিন বাড়িতে থাকলেও তিতাস ভীষণ একা। স্কুল খোলা থাকলে তাও বন্ধুদের সাথে দিনের একটা বড় অংশ কেটে যায়, একা লাগে না। কিন্তু আর মাসদেড়েক বাদেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। স্টাডি-লিভ চলছে তাই। কাজেই সারাটা দিন কাটাতে হয় বাড়িতেই। ভাল লাগে?

- কীরে তিতাস? বাথরুমে আর কতক্ষণ কাটাবি? মায়ের গলা।

- বাবু তাড়াতাড়ি কর। কাল ফিজিক্যাল সায়েন্সের প্রশ্ন তৈরি করেছি। উত্তরগুলো লিখে ফেল। বাবার গলা।

শুরু হয়ে গেছে আবার-প্রতিদিনের মতই। ভাল লাগে না, একদম ভাল লাগে না। দমবন্ধ হয়ে আসে। কান্না পায় খুব। এখন আর এক সেকেন্ড বেশী বাথরুমে থাকলে চেঙ্গিস খান আর ঝাঁসি কি রাণী একসাথে আক্রমণ করা শুরু করে দেবে।

- এইভাবে চললে পড়াশোনা লাটে উঠবে, চেঙ্গিস খান আক্রমণ করবে ঝাঁসির রাণীকে, তোমার জন্যই ওর পড়াশোনা হয় না। ছেলেকে একটু চটপটে হতে বলো। এইভাবে চললে খবরের কাগজে ছবি আর বের হতে হবে না।

এটা অবশ্য বাবার পেটেন্ট কথা। সবসময় কানের কাছে রেকর্ড বাজিয়েই চলেছে – মাধ্যমিকে এমন ফল করতে হবে বাবু যে কাগজে যেন তোর ছবি বেরোয়। ছবি, খ্যাতি, পরিচিতি; বাবা সারাজীবনে এর থেকে বেরোতে পারেনি, তাকেও বেরোতে দেবে না। মা'ও কি বুঝতে পারে না তিতাসকে? সারাদিন শুধু পড়তে বস, পড়তে বস আর বুঁচিমাসীর ছেলে কত ভাল রেজাল্ট করেছিল, পটলাদার ভাস্তু ক্লাস ফোরেই কত সিরিয়াস, এইসব আলোচনা। উঠতে-বসতে-শুতে-খেতে শুধুই তুলনা, তুলনা আর তুলনা।

রেজাল্ট যে খুব খারাপ করে তিতাস, তা নয়। পাঁচ থেকে দশের মধ্যেই থাকে প্রতিবার। কিন্তু না, তাকে শুধু ফাস্ট হতে হবে – টপ্। তিতাস কবিতা লিখত খুব সুন্দর। ভালবাসত প্রাণ দিয়ে। কিন্তু এসবের কোন মূল্যই দেয় না কেউ। হি শুড বি অন দ্য টপ্ – কাগজে ছবি বের করতে হবে না? পড়ার টেবিলে বসতেই আজ সেই ডায়েরীটার দিকে চোখ গেল। তার কবিতা লেখার ডায়েরী – তার অনুভবের ডায়েরী। এখনো সবত্তে সেই ডায়েরীতে রেখে দিয়েছে ফটোটা – যে একমাত্র পাঠিকা ছিল তার অনুভবের। কলাবেণী করা ঘন কালো চুল, শ্যামলা গায়ের রং, হাসিমুখের ছবিটা এখনো একাকী মুহূর্তে সঙ্গ দেয় তাকে। মৌ---কোথায় আছে এখন কে জানে? বাবা-মায়ের কাছ থেকে অতখানি অপমান কি প্রাপ্য ছিল ওর? কি করেছিল ও? সকালে ঝগড়া হয়েছিল বলে রাত বারোটায় ফোন করে ‘সরি’ বলতে চেয়েছিল শুধু। তিতাস বুঝতেও পারেনি বাড়ির প্যারালাল লাইনে পালকি পড়ুন ও পড়ুন [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

দাম্পত্যের শক্ত মানে না-জানা দুটো ছেলে-মেয়ের কথোপকথন শুনে চলেছে তার কাগজে ছবি প্রত্যাশী বাবা! তারপর—তিতাস আর কোনদিনও যোগাযোগ করতে পারেনি মৌ’এর সাথে। অনেক সাহস সঞ্চয় করে গিয়েছিল মৌ-এর বাড়ি। বদলীর চাকরি করা মৌ-এর বাবা ততদিনে সপরিবারে কাঠবুমরির পাট উঠিয়ে চলে গেছেন অন্য কোথাও! তুই’ও আমায় ভুল বুর্বলি মৌ?

- কীরে তিতাস? এখনও পড়তে বসিস নি?

- ঐ ছেলের কিছু হবে না। সারাদিন বাড়িতে থাকো, ছেলের পড়াশোনার দিকে নজর দিতে পারোনা?

চলতেই থাকবে এখন। তিতাস উঠে বাথরুমে গেল। বাবার দাড়ি কামাবার ব্লেডগুলো যেন কোথায় থাকে? তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে মৌ।

পরেরদিন প্রায় সবকটা কাগজেই তিতাসের ছবি বেরোলো। নীচে ছিলো একটা খবরও — মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা। কারণ এখনো অজানা।

‘খবরের কাগজে আমার ছবি বেরিয়েছে বাবা!’

## না বলা কথা

### জয়তা মণ্ডল

এক ঘরে বাবা আর কাকুরা তাসে, আরেকবারে মা-কাকিমারা গল্পে মশগুল। অথচ এই তিনি পরিবারের ছেটে গেটুগেদার-টা জয়ন্তীরই ভাল নম্বর পেয়ে গ্যাজুয়েট হওয়ার সুবাদে। অনেক সময় নিয়ে সালাড সাজাতে সাজাতে বোর হয়ে গেল সে। পাশ থেকে রমা কাকিমার গলা ভেসে এল — ‘উঃ, ছেলেটাকে কত করে বলে তবে আনতে পারলাম। এত মুখচোরা ছেলে!’

কে যে বলেছিল আনতে, নিজের মনেই গজগজ করল জয়ন্তী। ‘রণ’, রমাকাকিমার একমাত্র ছেলে, জয়ন্তীর থেকে বছর খানেকের বড়ই হবে। এসে গন্তীরমুখে কনগ্যাটস্ বলে সেই যে চুপ, একঘন্টা হতে চলল। আর কথা বলারও কোন সন্তাননা দেখা যাচ্ছে না। প্রথমে আজকের নিউস্ পেপারটা শেষ করল (ঘরে পেপার নেই নাকি!), তারপর সেই যে বারান্দায় গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, কি দেখছে, কি ভাবছে ভগবান জানে।

মা কাকিমার আসরে ঢেকার চেষ্টা যে করেনি তা নয়, তবে পরনিন্দা-পরচর্চার বহর দেখে আস্তে করে সরে পড়েছে, খেতে বসতে এখনও ঘন্টাখানেক দেরী। কি করবে, টিভি চালাবে নাকি একটা গল্পের বই নিয়ে বসবে, ভাবতে ভাবতে কি মনে করে বারান্দাতেই চলে এল জয়ন্তী।

‘হাই রণ।’

রণ তাকাল, মুখের পেশীতে কিছু তো পরিবর্তন হল, তবে সেটা হাসি কিনা বোৰো গেল না। বড় অস্বস্তিকর অবস্থা, এ ছেলের সাথে কি কথা বলবে? কি করতে যে বারান্দায় আসতে গেল।

জয়ন্তী — “তুমি পরের সপ্তাহে আমেরিকা যাচ্ছ শুনলাম?”

রণ — “ভূমম।”

জয়ন্তী — “কেমন ফিলিংস হচ্ছে?”

জিজ্ঞসা করে লজ্জা পেল একটু, এত উত্তেজিত ভাবে কথাটা বলে ফেলল যেন রণ নয় ও নিজেই যাচ্ছে আমেরিকা। কিন্তু যার উত্তেজিত হয়ে গড়গড় করে বলে যাওয়া উচিত, সে নিষ্পত্তিভাবে বলল — “এক্সাইটেড্”। “ওহ্”, জয়ন্তী মনে মনে নিজেকেই বলল “এটা এক্সাইটমেন্টের প্রকাশ!”

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। রণ মোবাইলে একটার পর একটা মেসেজ পাঠিয়ে যাচ্ছে। বেখাঙ্গা প্রশ্নটা করেই ফেলল জয়ন্তী — “তুমি তো সফ্টওয়্যার-এর লোক। চ্যাটিং কর না?” এক সেকেন্ডের অবাক দৃষ্টি আর দুই সেকেন্ডের ভাবনা, যে ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর অচেনা মেরেটাকে দেবে কিনা। বলল — “করি।” জয়ন্তী যেন পণ নিয়েছে ওকে দিয়ে কথা বলিয়েই ছাড়বে। — “এত চুপচাপ তুমি, কথাই বল না, তো চ্যাট করো কি করে?” ঠান্ডা দৃষ্টি দিয়ে সোজাসুজি তাকাল রণ — “চ্যাটে কথা বলতে হয় না, টাইপ করতে হয়, আমি ভয়েস চ্যাট করি না”।

— “ওঃ, তার মানে তোমার টাইপ করে কথা বলতে অসুবিধা নেই, মুখে কথা বলতেই যত বামেলা।” নড়েচড়ে উঠল জয়ন্তী, পরনিন্দা পরচর্চা না করলেও বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার মেয়ে ও নয়। রণের দিকে ঘুরে গিয়ে বলল — “আচ্ছা, কোন অসুবিধা নেই, তুমি টাইপ করে কথা বলো, আমি মুখে উত্তর দেব।”

সত্তরভাগ বিরক্তি আর তিরিশ ভাগ কৌতুহল নিয়ে ভুরু কুঁচকে রণ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল – ‘‘মানে?’’ তাতেই শতকরা একশ ভাগ উৎসাহ নিয়ে জয়ন্তী এক্সপ্লেইন করল – ‘‘মনে কর যে তোমার সামনে একটা কম্পিউটার রাখা আছে, তুমি টাইপ কর, আমি দেখি ঠিকঠাক বুঝে উভর দিতে পারি কিনা, রংলস্ হল পুরো স্পেলিং লিখতে হবে আর ওয়ান ওয়ার্ড অ্যাট এ টাইম।’’

ভুরু কুঁচকে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়িয়ে রণ রেলিং-এ টাইপ করল – ‘‘টক্ টক্ টক্’’।

জয়ন্তী – ‘‘ম্যাড!! তুমি আমাকে ম্যাড বললে?’’

একটু লজ্জাই পেল রণ, সত্যিই মনেমনে তাই ভেবেছিল। বোকা বোকা একটা হাঙ্কা হেসে আবার টাইপ করল।

জয়ন্তী – ‘‘সরি? ইটস্ ওকে।’’

রণ – ‘‘টক্ টক্ টক্’’।

জয়ন্তী – ‘‘কেমন করে বুঝালাম? কারণ, যখন থেকে তোমাকে দেখছি মনে হয়েছে যেন তুমি আমার অনেক দিন এর চেনা।’’

কথাগুলো শুনে রণ একটু থমকে গেল, মেয়েটা কি বলছে রে বাবা। তারপরেই মনে হল কম্পিউটার চ্যাটিং-এ এরকমই হয়। অচেনা অজানা লোকের সাথে সব এমন ভাবে কথা বলে যেন কতকালের প্রেমিক প্রেমিকা। তবুও টাইপ করা ছোট ছেট লেখাগুলো পড়ে কোনদিন কিছু মনে হয়েনি, কিন্তু এই আলো আঁধারিতে একটা সুশ্রী, কমবয়সী মেয়ের সোজাসুজি বলা কথাগুলো শুনে ভিতরে কিরকম একটা অন্ধৃত অনুভূতি হল রণর। আবার রেলিং-এ টাইপ করল।

জয়ন্তী (মুচকি হেসে) – ‘‘নো ফ্লার্ট!!’’

কি মেয়ে রে বাবা, আন্দাজ করার এতটাই ক্ষমতা! হাল ছেড়ে দিল রণ। দুহাতে রেলিংটা ধরে বলল – ‘‘ছাড়ো, তুমি বল, পাশ তো করে গেলে, এবার তোমার কি প্ল্যান?’’

ওঁ, এত তাড়াতাড়ি এ ছেলে কথা বলবে ভাবেনি জয়ন্তী; ব্যাস কথা চলতে থাকল। যদিও রণ কথা বলার থেকে প্রশ্নই বেশি করছিল, আর জয়ন্তী বকেই যাচ্ছিল। বকবক করতে অবশ্য কোন আপত্তি নেই। তবুও কতক্ষণ আর একতরফা বকবক করা যায়? জিজ্ঞাসা করল – ‘‘তুমি এত কম কথা বল কেন? তোমার কি কিছুই বলার থাকে না?’’

কঠিন দৃষ্টিতে রণ সোজাসুজি তাকাল জয়ন্তীর দিকে, কেটে কেটে উত্তরটা দিল – ‘‘আমি তো জানতে চাইনি তুমি এতো ফালতু বকবক কেন কর? আমি কথা বলি যারা আমার কাছে স্পেশ্যাল বা যাদের কাছে আমি স্পেশ্যাল, তাদের সাথে। আলতুফালতু সবার সাথে নয়। আর এখন আমি একটু একা আর চুপচাপ থাকতে চাই, ইফ্ উ ডোন্ট মাইন্ড।’’

মাথা গরম করে কথাগুলো বলার পর রণর খেয়াল হল, মেয়েটা বড়বড় চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, শুধু হঠাতে অপমানে গালটা লাল হয়ে গেছে, আর ... আর চোখে জল এসে থমকে গেছে, শুধু মনের বাঁধ ভেঙ্গে বন্যা হতে পারেনি। সেই অবস্থাতেই হাসল মেয়েটা, গলা একটুও না কাঁপিয়ে বলে উঠল – ‘‘আসলে আমার কাছে সবাই স্পেশ্যাল, তাই সবার সাথেই বক্বক করি, তবে আমি কারোর কাছে স্পেশ্যাল নই। ওকে, বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, এনজয় সাইলেন্স।’’

চুপ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়ন্তী, রণর অনুমান সত্যি করে চলে গেল না। হঠাৎ একটা খারাপ লাগা এসে ধরল রণর মনে, আর ছলছলে চোখ দুটোই ভেসে উঠতে লাগল বার বার, আর ‘আমি কারোর স্পেশ্যাল নই’ কথাটা।

কয়েকবার আড়চোখে তাকাল জয়ন্তীর দিকে, নির্বাক শূন্য দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। স্তন্তা চেয়েছিল কিন্তু এই স্তন্তা যেন অসহ্যকর। ইগো ঝোড়ে ফেলে আবার টাইপ করল রেলিং-এ – “আই অ্যাম সরি”। তাকাল মেয়েটা। মলিন হেসে বলল – “ইটস্ ওকে”। ওঃ, তার মানে বুঝেছে। এবার বেশ কয়েকটা লাইন একসাথে টাইপ করে গেল রণ। তাকিয়ে দেখল ভুরু কুঁচকে কিছু না বোঝার ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে জয়ন্তী। তারপর হেসে ফেলল। আগের মতোই সহজ ভাবে বলল - ‘কি লিখলে? এত কিছু একসাথে, কি করে বুঝব?’। খোলা গলায় হাসল রণ বহুদিন পরে, বলল – “ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবার পেতে পারি কি?”

“অবশ্যই, চলে এস, মা-বাবাদের আড়ডাও ভেঙ্গে দেওয়া যাক, কি এত গল্প করে কে জানে, আমিও অবশ্য খুব বকি, দ্যাখ তোমাকে আবার বোর করছি...” বকেই চলল আবার একভাবে। কিন্তু এবার রণর আর খারাপ লাগল না। হাসতে হাসতে জয়ন্তীর সাথে মা-কাকিমাদের আড়ডা ভাঙ্গার খেলায় ঢুকল। আড়চোখে দেখল তার মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে – এ কি পরিবর্তন!

রাতে নিজের বিছানায় শুয়ে ভাবছিল রণ, শেষে খেলার নিয়ম ও মানে নি – শর্টফর্মে আসলে লিখেছিল, “তুমি আমার কাছে স্পেশ্যাল; আমি ফিরে আসব, অপেক্ষা করবে আমার জন্য?” – কিন্তু চেষ্টা করেও সেটা বলতে পারে নি জয়ন্তীকে। পাঁচ বছরের জন্য আমেরিকা যাচ্ছে সে; শেষে জয়ন্তীর কাছে ফিরে সে আসবে, যদিও জানে না ও ততদিন তার অপেক্ষায় থাকবে কিনা। আর ততদিন জয়ন্তীকে অনিশ্চিত অপেক্ষায় ফেলে রেখে যেতেও তার মন সায় দিল না। জয়ন্তীর না বোঝা সেই কথাটুকু তাই তার না বলা-ই রয়ে গেল।

## নাম রাখার বিপদ

### মাহবুব আজাদ

পালকির গত সংখ্যায় আমরা এই প্রথ্যাত ব্লগারের একটি ইন্টারভিউ প্রকাশ করেছিলাম। আর এবার পাঠকপাঠিকদের জন্য দিচ্ছি তাঁর একটি গল্প। তাঁর অন্যান্য প্রায় সব লেখার মতই এটিও পূর্বে তাঁর ব্লগ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও ব্লগে পূর্বপ্রকাশনা আমাদের নিয়মের পরিপন্থী নয়, পুনঃপ্রকাশ কর রাখতেই আমরা ইচ্ছুক; পালকির আগামী লেখকদের জন্য এটি অনুরোধ রইল।

১.

সাহিত্যিকরা পদে পদে বিপদগ্রস্ত।

মোফাকে দেখে আমাদের খুবই খারাপ লাগে। বেচারা নিতান্ত নিরীহ কিসিমের মানুষ। কারো কোন ক্ষতি করা দূরে থাক, সাহিত্যের প্রসঙ্গ না উঠলে কারো সাথে তর্কাতর্কিতেও যায় না সে। এমন একটা লোককে কে এমন নৃশংসভাবে পেটাতে পারে? মোফার কালো হয়ে থাকা ডান চোখ, আর ফুলে থাকা বাম চোয়াল দেখে আমরা রাগে মুখ কালো করে ফুলতে থাকি। সেই পাতক ঘাতককে হাতের কাছে পেলে মোফার আদলেই তার মুখে আলু তুলে দেবার কঠিন সংকল্প আঁটি আমরা।

তবে হ্যাঁ, যতই নিরীহ হোক না কেন, সাহিত্যের প্রশ্নে মোফা অটল। এই একটি ক্ষেত্রে সে মেষ নয়, রীতিমতো বঙ্গীয় রাজশার্দুলের মতো বীরবান। খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে সে এক ইয়া পালোয়ান বকলম মাঠাওয়ালার সাথে রীতিমতো লড়াই করেছে, শুনেছো নিশ্চয়ই। লড়াইয়ে নেট লস ওরই হয়েছে, খামোকা হাসপাতালে পড়েছিলো কয়েকদিন, কিন্তু লড়াইতে হারজিত চিরদিন থাকবেই, হারের চিঞ্চ মাথায় পুষে বীরেরা লড়ে না।

এবারও নিশ্চয়ই মোফা এমনি কোন সমুখসমরে হেরে এসেছে। হয়তো গারিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ কিংবা ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার বদনাম করেছে কোন এক ষণ্ডমার্ক পাষণ্ড, অমনি মোফা উত্তেজিত হয়ে উল্লেখিত সাহিত্যিকদের আশ্রিত সম্মতি বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। কিংবা হয়তো কোন স্বাস্থ্যবান সাহিত্যমূর্খ বক্ষিমচন্দ্রকে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি দিয়ে বসেছে, তাতে চট্টোপাধ্যায় হয়ে মোফা তাকে মৌখিক বা দৈহিক আক্রমণ করে বসেছে। কিংবা হয়তো বুদ্ধদেব বসু আর বুদ্ধদেব গুহ, কিংবা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে গুলিয়ে ফেলেছে কেউ। সাহিত্যিকের এমন অপমান, এমন অপরাধ, কি একজন জীবন্ত কবি হয়ে মোফা সইতে পারে?

আমি সহানুভূতির সাথে জানতে চাই, ‘কে রে শালা ইডিয়েটটা? এভাবে জমিয়ে মারলো তোকে?’

রেজা বলে, ‘থাক রে মোফু, কান্দিস না। নে, পুরি খা। — ওহহো, তোর তো চাপা ফাটিয়ে দিয়েছে, খাবি কিভাবে?’

শিবলি বলে, ‘ইশশ, একেবারে হৃদয়হীনের মতো মেরেছে রে, কিছু আস্ত রাখেনি, চোখমুখ ফুলে চিত্রবিচিত্র হয়ে তোকে বুড়োবয়সের নূরজাহানের মতো দেখাচ্ছে! — কী দিয়ে মারলো তোকে? হকিস্টিক না নানচাকু?’

মোফা সদ্যজাত বাচ্চুরের মতো করুণ চোখে তাকায় আমাদের দিকে। কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

আমি বলি, ‘জুতো পেটা করেনি তো?’

মোফা এমন একটা সম্মতিসূচক মৌনতা অবলম্বন করে, যে আমাদের গা ঠান্ডা হয়ে যায়। ভাবতে থাকি, নিরীহ বুদ্ধিজীবী মোফাকে এমনভাবে ঠ্যাঙ্গাতে পারে, কে বা কাহারা এতবড় ন্শংস নরপশু হতে পারে? কোন সাংসদ? কিংবা মন্ত্রী? কিংবা তাদের পোষা মঙ্গানৃন্দ?

আমরা মনের জিঞ্জাসাকে মুখের বাইরে বের করি। মোফা মাথা নাড়ে। বলে, ‘মনিকা খালু।’

মনিকা খালু? এ আবার কি চীজ? খালুর নাম মনিকা হয় কখনো? মনিকা নামের কোন লোককে কোন সুস্থ খালা বিয়ে করে তাকে খালু হয়ে ওঠার সুযোগ দিতে পারেন কখনো? এ-ও কি সন্তুষ?

আমরা জানতে চাই। ‘মনিকা খালুটা কে রে? এ আবার কেমন ধাঁচের নাম? মনিকা লিউয়িনফ্রি পর্যন্ত শুনেছি – ইদানীং খালুরাও মনিকা হচ্ছে নাকি?’

মোফা গুম হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, ‘আমাদের মনিকা খালার বর। সে জন্যে আমরা মনিকা খালু ডাকি।’

আমরা তৎক্ষণাত জানতে চাই, ‘মনিকা খালা কে?’

মোফা বলে, ‘আমাদের পাশের বাসায় থাকতো আগে, এখন অন্য জায়গায় থাকে।’

‘মনিকা খালার বর তোকে খামাখা মারলো কেন? কী করেছিস তুই? – মনিকা খালার সাথে কোন রকম ইয়ে –?’ আমি অনুসন্ধিৎসু হই।

মোফা ভাবি বিরক্ত হয়। বলে, ‘বেকুব কোথাকার, মনিকা খালার মেয়ের বয়স আমার সমান – আর তাছাড়া আমি কেন যাবো এইসব করতে –?’

আমরা নড়েচড়ে বসি।

‘মনিকা খালার মেয়ে দেখতে কেমন রে?’ শিবলি জানতে চায়।

মোফা বলে, ‘ভালো।’

আমাদের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন আসে। হৃম। তাহলে একটা দেখতে-ভালো-মেয়ের বাবা মোফাকে আচ্ছামতো পেঁদিয়েছে। কেন? আমরা দল পাল্টাবো কি না ভাবতে থাকি। মোফার দলে থেকে খুব একটা লাভবান হতে পারবো না মনে হচ্ছে। হারু পার্টির পোঁ ধরে কী লাভ?

আমরা বিস্তারিত ঘটনা জানতে চাই।

২.

ঘটনা হচ্ছে সরল।

মোফা যেহেতু বাংলা ভাষার ওপর ভালো দখল রাখে, তাই অনেকেই তার কাছে আসে নামের জন্যে। আমাদের নিত্যদিনের আড়তাস্ত্র, এই কলিমুদ্দির তেলেভাজার দোকানটার নাম মোফারই রাখা – তেলোত্তমা রেস্তোরাঁ। আমাদের পাড়ার মানবাধিকার কর্মী ইঞ্জিন আব্রাহাম ভাই কয়েকজন বন্ধুর সাথে জেটি বেঁধে তাঁর খালি গ্যারেজে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি খুলেছিলেন কয়েক দিনের জন্য, কিন্তু জেদ ধরেছিলেন সেটার নাম বাংলা ভাষায় রাখবেন। বাতলে দিয়েছে মোফা, ছায়াসুনিবিড় বিশ্ববিদ্যালয়। পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন দালান বানিয়েছেন আজম চাচা, নাম রাখার জন্যে ছুটে গেছেন মোফার কাছে। চাওয়ার সাথে সাথে নাম পেয়ে গেছেন, আজমহল। নামকরণে মোফার দক্ষতা তুলনারহিত, কেবল নিজের নামটা বেচারাকে রাখবার সুযোগ দেয়া হয়নি বলেই একটা বদখদ লস্বাচওড়া কাবুলি নাম নিয়ে ঘূরতে হয় তাকে। সে দুঃখ সে ভুলেছে হরেক রকম ছদ্মনামে কবিতা লিখে।

এমনই একসময় মোফার ডাক পড়েছে, মনিকা খালার বাসায়। মোফার মা মোফাকে ডেকে বলেছেন, ‘মোফা রে, তোর মনিকা খালার বাসায় চল আজ। বাচ্চার নাম রাখতে হবে।’

মোফা খুব উৎসাহের সাথে রাজি হয়েছে। সে জানতে চেয়েছে, ‘কিসের বাচ্চা মা, বেড়াল না কুকুর?’ বলে নেয়া ভালো, এ পাড়ায় তাবৎ জীবজন্মের নাম ওর রাখা। কুদুস সাহেবের পোষা গরু ধ্বলীর যমজ বকনা বাছুর হলো, একটা কালো আর একটা সাদা। মোফা এক নজর দেখেই নাম দিলো সরসী আর ফরসী। মনজুর চাচার দুর্ধর্ষ নতুন কুকুরটা, খাবলুর পর যার আগমন, যেটার জ্বালায় পাড়ার বেড়ালগুলো অতিষ্ঠ, সেটার নামও জুগিয়েছে মোফা, ম্যাওছাতুং – সমাস করলে দাঁড়ায়, ম্যাও পেলেই ছাতু করে ফেলে যে।

কিন্তু মোফার মা ক্ষেপে ওঠেন। ‘মানুষের বাচ্চা, মানুষের! মনিকার মেয়ে হয়েছে, তার নাম রাখতে হবে তোকে, বুঝালি? আজকে সন্ধ্যায় তৈরি থাকিস।’

মোফা মনিকা খালার বাসায় যেতে হবে ভেবেই পুলকিত হয়, কারণ মনিকা খালার মেয়ে দুটি, কুন্ত আর খান্ত, বেশ ইয়ে, নাম বদখদ হওয়া সত্ত্বেও। আর দেখতে ইয়ে হলে নামে কী-ই বা আসে যায়? শেঙ্গপিয়ার তো বলেছেনই – যাক গে! বিনা বাক্যব্যয়ে সে খোঁচা খোঁচা কবিসুলভ গোঁপদাঁড়ি কামিয়ে, পাঞ্জাবী ইঙ্গিরি করে পাতলুনের ওপরে এঁটে একেবারে ঘোপদুরস্ত কবিটি সেজে পুলকিত চিত্তে সন্দেয়বেলা মায়ের সাথে মনিকা খালার বাসায় গেলো।

কিন্তু বিধি বাম। মনিকা খালু বাসায় ছিলেন সে সন্দেয় বেলা। ব্যাটা ব্যবসা করেন, নিশ্চয়ই দ্বিসাংখ্যিক কিছু, মোফা অভিমত জানালো। দ্বিসাংখ্যিক মানে যে দুইলম্বি, তা আমরা জানতাম না। যাই হোক, কত কিছুই তো আমরা জানি না। সেই ব্যাটা নাকি দেখতে ময়দানবের মতো, কালো ভূত, সারা গায়ে লোম, কুতকুতে চোখ, এক কথায় বিচ্ছিরি। এই লোকের যে কেমন করে পরীর মতো সুন্দর দুটো মেয়ে হলো, সেটা মোফা বুঝতে পারে না, কাজেই আমরাও পারি না। এই রহস্য ভেদের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে কেবল আমাদের এ পাড়ার আরেক গর্ব, উপমহাদেশের প্রথ্যাত গোয়েন্দা গুলু ভাইকে।

যাই হোক, সেই ব্যাটা বেনিয়া মুখ্যটা বাসায় ছিলো, এই হলো সমস্যা। কুন্ত আর খান্তের সাথে চোখের দেখা হয়নি মোফার। বাপটা হচ্ছে মহা চামার কিসিমের। যেহেতু মোফা বেগানা পুরুষ, কাজেই মেয়েদুটো ভেতরের ঘরে লুকিয়ে রইলো, বাইরে আসার সাহসই পেলো না। মোফার মা চলে গেলেন মনিকা খালার সাথে, নতুন পিচিকে দেখতে। আর মোফা বসবার ঘরে মনিকা খালুর সাথে বসলো।

মনিকা খালু শুরুতেই বললেন, ‘দ্যাখো বাবা, আমার কপালটা কী খারাপ একবার দ্যাখো। ভেবেছিলাম এবার একটা ছেলে হবে, কিন্তু এবারও সেই মেয়েই হলো। নাম রাখা নিয়েও একটা পেজাঘি লেগে গেলো। কী যে করি, ভালো লাগে না।’

মোফা হাসি হাসি মুখে বললো, ‘নাম রাখা নিয়ে কি সমস্যা?’

মনিকা খালু বললেন, ‘না, ছেলে হলে বোনদের নামের সাথে মিল রেখে বেশ একটা ছন্দ রেখে নাম রাখা যেতো, বুঝালে? আগেই ভেবে রেখেছিলাম একটা নাম, কিন্তু ছেলের বদলে মেয়ে হয়ে একেবারে সব পরিকল্পনা মাঠে মারা গেলো। দেখি, আর একবার চেষ্টা করে –।’

৩.

এইটুক পর্যন্ত শুনে শিবলি ঠা ঠা করে হেসে উঠলো, ‘ব্যাটা দেখি পরিবার পরিকল্পনাও মাঠে মেরে দিচ্ছে। পশু কোথাকার!’

মোফা তার বন্ধ হওয়া ডান চোখ টিপে বললো, ‘ঠিক বলেছিস, আস্ত জানোয়ার ব্যাটা, কিন্তু আগে বাকিটা শোন।’

৮.

মোফা মনে মনে ভাবলো, এই ব্যাটার ছেলে তো এর মতোই হবে দেখতে, মেয়েদের সাথে মিল রেখে কী নাম রাখা হতো, জন্ম? কিন্তু এ তো আর মুখে বলা যায় না, সে বললো, ‘কী নাম ঠিক করেছিলেন, খালু?’

মনিকা খালু একগাল হেসে বললেন, ‘টনিক!’

মোফা আঁতকে উঠে আর একটু হলেই সোফা থেকে পড়ে যাচ্ছিলো, এমন অসংকৃত, অভব্য নাম শুনে। টনিক একটা নাম হলো?

মনিকা খালু হেসে বললেন, ‘হে হে হে – জিন অ্যান্ড টনিক আবার আমার খুব প্রিয় জিনিস, বুঝলে কি না? ব্যবসা করার এই একটা সমস্যা, বুঝলে বাবা – নানা দেশের নানা রকম লোকের সাথে মিশতে গিয়ে নানা বদ্ব্যাস তৈরি হয়ে যায়। তবে জুম্মার নামাজটা ঠিকই পড়ি, আর ইচ্ছা আছে চুলদাঢ়ি আরেকটু পাকলে গিয়ে হজ্জ করে আসবো। – আর ছেলের জন্যে একটা ইসলামি নামও ঠিক করে রেখেছিলাম।’

মোফা আর জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না, সেটা কি।

মনিকা খালু বলেন, ‘শুনবে নামটা?’

মোফা বহুকষ্টে ঢোক গিলে, নিজেকে শক্ত করে নিয়ে মাথা ঝাঁকায়।

মনিকা খালু উদ্ভাসিত মুখে বলেন, ‘কাবুল হোসেন!’

মোফার কাছে জগৎ আঁধার হয়ে আসে, কাবুল হোসেন নামটাকে তার কাছে টনিকের মতোই ভদ্র সমাজে অপাওড়তের মনে হয়। অনাগত পুত্রসন্তানটি যে কী পরিমাণ ফাঁড়ার ওপর আছে, কল্পনা করতে গিয়ে মোফা শিউরে ওঠে। টনিক নামটা নিয়ে যাও ছেলেটা টলমলিয়ে খানিকটা দূর যেতে পারতো, কাবুল হোসেন নামটা এর ওপর জবরদস্তি চাপিয়ে দিলে সেই অনাগত ছোকরার ভবিষ্যত আকিকার পরদিনই দফারফা হয়ে যেতো। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, ওগুলো পার করার পর ব্যবসাবাণিজ্য বা চাকরিবাকরি, সবকিছুতেই বেচারা টনিকের টনক নড়ে একেবারে টনটনিয়ে থাকতো। তাছাড়া তার বিয়ে দেবার সময় কী একটা হজ্জতেই পড়তে হবে! কোন মেয়ে যদি শোনে, তার হবু বরের নাম কাবুল হোসেন, ডাক নাম হচ্ছে গিয়ে টনিক, সে কি কখনো স্বেচ্ছায় রাজি হবে এমন একটা লোককে বিয়ে করতে? ছোকরা না জন্মে বড় শক্ত বাঁচা বেঁচে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে।

৯.

আমরা খিকখিক করে হাসতে থাকি। ‘কাবুল হোসেন টনিক! হে হে হে, কাবুল হোসেন টনিক!’

মোফা বলে, ‘তাছাড়া দ্যাখ! ছোকরা যদি ভবিষ্যতে পলিটিক্স করতে চায়, এই নামটা নিয়ে কি বাটে পড়বে? এমনিতেই আমাদের পলিউসুক গুলোর নামের যা ছিরি! মেয়রের নাম হচ্ছে কাসেদ হোসেন খোকা, খেলাধূলামন্ত্রীর নাম বজলুর রহিম পটল – !’

আমরা তবুও হাসি, ‘কাবুল হোসেন টনিক! হে হে হে!’

মোফা বলে, ‘হাসি রাখ, এর পর শোন কি হলো।’

৬.

কিন্তু মনিকা খালু তৃপ্তি ভঙ্গিতে হাসেন। ‘আমার নামের সাথে মিল রেখেই রাখলাম, বুঝলে কি না?’  
মোফা ভাঙ্গা গলায় বলে, ‘আপনার নাম কি? আবুল হোসেন?’

মনিকা খালু ভারি বিরক্ত হন। ‘কথার মাঝখানে কথা বলো কেন? — আমার নাম বাবুল হোসেন। আবুল হোসেন আমার বাবার নাম।’ বলতে বলতেই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ‘লক্ষ্য করেছো? বেশ একটা ছন্দ তৈরি হলো কিন্তু? আবুল হোসেন, তস্যপুত্র বাবুল হোসেন, তস্যপুত্র কাবুল হোসেন — বেশ চলছে কিন্তু, তাই না? আমাদের খানদানের সুরটা বেশ স্পষ্ট বোৰা যাচ্ছে! — কিন্তু সমস্যা একটা, হারামজাদা ছেলেটা আদপে হলোই না, বরং আরেকটা মেয়ে এসে হাজির! ছেলেটা হয়ে গেলে বেশ একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারতাম! ব্যবসাবাণিজ্য তো কারো হাতে ছেড়ে যেতে হবে, নাকি? মেয়ে দু'টাই হয়েছে পটের বিবি, আলতা পায়ে হাঁটে, এদের ওপর এই গুরুভার ন্যস্ত করা মোটেও বুদ্ধির কাজ হবে না।’

মোফার মাথায় এই সমস্যাটা বেশ টোকা দেয়। সে বলে, ‘কিন্তু খালু, কাবুল হোসেনের ছেলের নাম কি হবে? মানে, খানদানের সুরটা বজায় থাকবে কিভাবে?’

মনিকা খালু বিরক্ত হন। ‘তার আমি কি জানি? আমি কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবো? আমার বাবা যখন আমার নাম রাখলেন বাবুল হোসেন, তখন কি তিনি ভেবেছিলেন, আমি আমার ছেলের নাম কি রাখবো? ভাবেননি! তিনি যখন ভাবেননি, আমিও ভাববো না। ঐ শালা কাবুল হোসেনই এইটা নিয়ে মাথা ঘামাবে! তাছাড়া কাবুল হোসেনই এলো না এখন পর্যন্ত, আবার তার ছেলে! — আর খানদানের সুর! খানদান ডুবতে বসেছে ছেলের অভাবে!’

মোফা কাঁচুমাচু হয়ে বললো, ‘ইয়ে খালু, একটা প্রশ্ন ছিলো।’

মোফার আদবকায়দায় সন্তুষ্ট হয়ে এবার মনিকা খালু খুশি খুশি গলায় বললেন, ‘একটা কেন, দশটা করবে, তুমি তো বলতে গেলে ঘরের ছেলে। বলো বলো?’

মোফার মনে একটা হালকা খুশি উলু দিয়ে গেলো। অ্যাঁ, বলে কী ব্যাটো? ঘরের ছেলে? ওকে নিয়ে কোন মধুর পারিবারিক মতলব আছে নাকি কাবুল হোসেনের বাবার মনে? কিন্তু নিজের সন্তান্য শুশ্রের নাম বাবুল হোসেন, কিংবা শালার নাম কাবুল হোসেন, এটা ভাবতে গিয়েই মোফার মেজাজ খিঁচড়ে গেলো। নাহ, পাঁচে পদে কোনকিছু মেলে না এ জগতে, একটা না একটা ক্রটি রয়েই যায়!

মনের খুশি চেপে রেখে মোফা বললো, ‘কাবুল হোসেন নামটা ইসলামি হলো কিভাবে?’

মনিকা খালুর মুখ এবার গোমড়া হয়ে গেলো। ‘এটা তো একটা বলদের মতো প্রশ্ন হয়ে গেলো বাবা! তোমরা, এই ইয়াং ছেলেপেলেরা খালি প্যাচাল পাড়তে জানো! কাবুল হোসেন নামটা ইসলামি হবে না কেন, শুনি? — হোসেন তো একটা ইসলামি নাম, তা তো মানো? এই যেমন ধরো বাপের ব্যাটা সাদ্দাম হোসেন, মুসলিম বিশ্বের প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষের —! তবে সাদ্দাম হোসেন নামটা কমন হয়ে গেছে, সব চাষাভূষাতেলিমুদ্দির ছেলের নামও দেখি সাদ্দাম হোসেন! আর ধরো গিয়ে — এই বাগদাদ, বোখারা, কাবুল, এসব শহরকে ভিত্তি করেই তো ইসলাম আমাদের দেশের দিকে এগিয়ে এসেছিলো, নাকি? আমি তো ছেলের নাম মক্ষে হোসেন রাখতে পারি না! এখন তুমি এই প্রশ্ন আবার করো না, আমি আমার ছেলের নাম কেন বাগদাদ হোসেন রাখলাম না। — আর সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, কাবুল হোসেন বাবুল হোসেনের সাথে মেলে! ব্যস!’

মোফা সায় দেয়। ‘জি জি।’

ମନିକା ଖାଲୁ ବିମର୍ଶ ମୁଖେ ବଲେନ, ‘ଏତୋ ଦିନରାତ ଚିନ୍ତା କରେ ଏକଟା ନାମ ରେଖେଛିଲାମ, ନିମକହାରାମ ଛେଳେଟା ମେଯେ ହେଁ ଦୁନିଆୟ ଏଲୋ। କି ସୁନ୍ଦର ମିଷ୍ଟି ହତେ ବ୍ୟାପାରଟା, ଆମାର ଦୁଇ ମେଯେ, କୁନ୍ତ ଆର ଖାନ୍ତ, ତାର ସାଥେ ଛେଳେଟା, ଟନ୍ତ୍ର! ’

ମୋଫା ଆବାର ଟଲେ ଓଠେ। କୁନ୍ତ ଆର ଖାନ୍ତର ନାମଟା ପାନ୍ତ୍ରୟାର ମତୋଇ ମିଷ୍ଟି ଶୋନାୟ ଓର କାଛେ, କିନ୍ତୁ ଟନ୍ତ୍ର ଏକଟା ନାମ ହଲୋ?

ମନିକା ଖାଲୁ ବକେ ଯାନ, ‘ଏଥନ ଏହି ମେଯେର କୋନ ନାମ ଆମାର ମାଥାୟ ଆସଛେ ନା। ଏର ନାମ ତୋ ଆର କାବୁଲ ହୋସେନ ରାଖା ଯାଇ ନା, ସତୋଇ ଇସଲାମି ନାମ ହୋକ ନା କେନ! କିଂବା, ଟନିକ ଥେକେ ତୋ ଆର ଓକେ ଟନିକା ବାନିଯେ ଦେଯା ଯାଇ ନା। ଛେଳେଦେର ତୋ ନାମ ନିଯେ କୋନ ବାମେଲା ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଆଜକାଳକାର ମେଯେଦେର ନାମ ନିଯେ ବଡ଼ ହୁଙ୍ଗତ! କି ବିଟକେଲ ବିଟକେଲ ସବ ନାମ! ଶାଙ୍ଗଫତା, ଆଫ୍ରୋଦିତି, କାସାରାଂକା – ଏମନ ସବ ନାମ! ଏଞ୍ଜଲୋର ସାଥେ ପାଣ୍ଡା ଦିଯେ ଚଲାର ମତୋ ନାମ ଆମାର ଜାନା ନାଇ, ତାଇ ତୋମାର ଶରଣାପନ୍ନ ହଲାମ।’

ମୋଫା ତବୁ ଖୁବି ଖୁବି କରେ। ‘କିନ୍ତୁ ଖାଲୁ, କୁନ୍ତ ଆର ଖାନ୍ତର ସାଥେ ଟନିକ କିଭାବେ ମିଲିତୋ?’

ମନିକା ଖାଲୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହନ। ‘କି ଆପଦ, କୁନ୍ତ ଆର ଖାନ୍ତର ସାଥେ ଟନିକ କେନ ମିଲିବେ? କୁନ୍ତ ଆର ଖାନ୍ତର ସାଥେ ମିଲିବେ ଟନ୍ତ୍ର! ଆର ଏ କଥା କେନ ଉଠିଛେ, ଯେଥାନେ ଟନିକ ଏକେବାରେଇ ଅନୁପାଦିତ?’

ମୋଫା ବିରତ ହେଁ ବଲଲୋ, ‘ବା ରେ, ଆପନିଇ ତୋ ବଲଲେନ, ମେଯେଦେର ନାମେ ମିଲିଯେ ଛେଲେର ନାମ ରାଖବେନ ଟନିକ – ।’

ମନିକା ଖାଲୁ ବଲେନ, ‘ତାଇ ତୋ! ଆମାର ମେଯେଦେର ଆସଲ ନାମ କଣିକା ଆର କ୍ଷଣିକା, ତାଦେର ମାଯେର ସାଥେ ମିଲିଯେ ରାଖା, ତାଇ ତାଦେର ସାଥେ ମିଲିଯେ ଛେଲେର ନାମ ରାଖତାମ ଟନିକ! କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ମାଯେର ସାଥେଇ ମିଲିଯେ ଯାବେ, ବାବାର ସାଥେ ମିଲିବେ ନା, ତାଇ କି ହ୍ୟ? ତାଇ ଆସଲ ନାମ ଠିକ କରେଛିଲାମ କାବୁଲ ହୋସେନ! – ବୁଝଲେ, ଏହି ମେଯେଦେର ମା-ଇ ହଚ୍ଛେ ସବ ଗନ୍ଦଗୋଲେର ମୂଳେ! କେମନ ବାରବାର ଖାଲି ନିଜେର ନାମେର ସାଥେ ମିଲିଯେ ନାମ ରାଖା! ଏଥନ ଏହି ନୃତ୍ୟ ମେଯେଟାର ନାମ ରାଖିତେ ଗିଯେ ଆମି ପଡ଼େଛି ବାଟେ। ତା-ଓ ଯଦି ଉନି ଏକଟା ଛେଲେ ପଯଦା କରତେନ, ଏକଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମି ନିଜେଇ ନିତେ ପାରତାମ। କିନ୍ତୁ ଉନି ଆମାକେ କୋନଭାବେଇ ସହ୍ୟୋଗିତା କରତେ ରାଜି ନନ! – ଯାକଗେ, ସବକିଛୁ ତୋମାର କାଛେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତୋ? ଏଥନ ବାପଧନ, ଆମାକେ ଏକଟା ସୁହିଟ ଅୟାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ନାମ ବଲୋ ଦେଖି ସୁଟ କରେ!’

ମୋଫାର ଅନ୍ତର ଏକେବାରେ କାନାୟ କାନାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁ ଉଠିଲୋ ଖୁଶିତେ। କଣିକା! ମାନେ କୁନ୍ତ! କ୍ଷଣିକା, ମାନେ ଖାନ୍ତ? ଈଷନ୍ ସଂକ୍ଷେପଣେର ପାଣ୍ଡାଯ ପଡ଼େଇ ତବେ ତାଦେର କୁନ୍ତତ୍ଵ ଆର ଖାନ୍ତତ୍ଵ ଲାଭ? ମୋଫାର ମାନସଚୋଥେ ମନିକା ଖାଲାର ନାମବିତକୋର୍ଧବର୍ତ୍ତିନୀ କନ୍ୟାଦୁଟିର ରୂପସୀ ଚେହାରା – ଆର ତେମନି ଲାଗସଇ ଫିଗାର – ଭେସେ ଓଠେ। କଣିକା, ଅର୍ଥାତ୍ କି ନା ବଡ଼ଜନ, ବେଶ ଚକିତହରିଗପ୍ରେକ୍ଷଣା କିନ୍ତୁ ଓଦିକ ଦିଯେ ଠିକଇ ଶ୍ରୋଣିଭାରାଦଲସଗମନା, ସେଇସାଥେ ଶ୍ରୋକନନ୍ଦା – ହେଁ ହେଁ ହେଁ! କ୍ଷଣିକା, ମାନେ ମେଜୋ ମେଯେଟା, ସେଇ ଶିଖରୀଦଶନା, ଆର ସେଇ ସଙ୍ଗେ ପକ୍ଷବିଷ୍ଵାଧରୋଷୀ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତପୁଷ୍ପତକାନନ୍ଦା ସଂଘାରିଣୀ ପଲାବିନ୍ନି ଲତା? ଆର ସେ ନିଜେ, ମୋଫା, ସେ ତୋ ଘରେର ଛେଲେ, ସେ କଥା ତୋ ବାବୁଲ ହୋସେନ ନିଜେଇ ବଲଲେନ। ଇଯାହୁ କବି କାଲିଦାସ, ଜିତା ରହେ କୁମାରସନ୍ତବ, ମାର ଦିଯା କେଳା! କଣିକା ବା କ୍ଷଣିକା, ଦୁଟି ନାମଇ ତାର ପଛନ୍ଦ, ନାମେର ମାଲକିନଦେର ଆରୋ ପଛନ୍ଦ। ଅୟାଦିନ ତୋ ଏ ସୁଖବର ସେ ପାଇନି। ଏଦେର ନାମ ତୋ ତୈରିଇ ରଯେଛେ ଦେଖା ଯାଚେ। ନଇଲେ କୁନ୍ତ/ଖାନ୍ତକେ ଏକଟା ସୁନ୍ଦର ନାମ କି ସେ ଉପହାର ଦିତେ ପାରତୋ ନା? ରବିଦା କି କିନ୍ତୁ ଏ ଗେଯୋ ନାମ ବରଦାନ୍ତ କରା ତାଁ ମତୋ ଭାବୁକେର ପକ୍ଷେ ସନ୍ତବ ହୟନି, ଶ୍ରୀର ଏକଟା ଆପଟୁଡ଼େ କାବ୍ୟସୁଷମାମନ୍ତିତ ଲାଗସଇ ନାମ ଠିକଇ ଦିଯେଛିଲେନ ତିନି, ମୃଣାଲିନୀ, ଆବାର ସେଟାକେଓ ଦମେ ବସିଯେ ଛୋଟ କରେ

ডাকতেন শুধু ছুটি বলে। মোফা কি পারে না, কুন্তকে কুমুদিনী নামে, খান্তকে ক্ষীণতনু নামে কাছে ডাকতে? আলবাত পারে, ঠিক যেমনটি পেরেছিলেন মোফার মানসগুরু রবিদা।

যেহেতু সত্যযুগের মতো, আইয়ামে জাহেলিয়াতের মতো, ভূটানের রাজপরিবারের মতো একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এখন আর সন্তুষ্ট নয়, তাই কণিকা নাকি ক্ষণিকা, কোনটি তার ভাগ্যে জুটতে পারে, এই বিশ্লেষণে মোফা কল্পনায় বুঁদ হয়ে যায়, আর শুনতে পায়, নিচে, অর্থাৎ কল্পনালোকের নিচে শক্ত মাটির ওপর কঠোর বাস্তব জগতে বসে মনিকা খালু বলছেন, ‘— তোমার খালা গোঁ ধরেছেন, ঠিক ছন্দ রেখে, মিল রেখে যুৎসই একটা নাম রাখতে হবে মেয়ের। বললাম, বেশ তো, রাখো না, কে মানা করেছে? কিন্তু অ্যাদিন হয়ে গেলো, মা আর বোনেরা মিলে কোন নাম ঠিক করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত তোমাকে তলব করা হয়েছে। তুমি নাকি বেশ বিশেষজ্ঞ, পদ্যটদ্য লেখো, সেগুলো আবার পেপারটেপারে ছাপাটাপা হয় — তুমিই একটা নামটাম ঠিক করো বাবা — কণিকা আর ক্ষণিকার পর এই মেয়েটার কী নাম দেয়া যায়?’

আর নিজের হবু শালির নাম রাখতে গিয়ে ঠিক তখনই মোফা করে বসে সেই মারাত্মক ভুল, যেই ভুলের খেসারত হিসেবে হয়তো খসে যায় কণিকা ওরফে কুন্তকে কুমুদিনী ডাকার সুযোগ, ক্ষণিকা ওরফে খান্তকে ক্ষীণতনু ডাকার সন্তুষ্টবনাটি ক্ষীণতর হয়ে যায় সেই কুক্ষণের ভুলে।

তবে ভুলটি সম্পূর্ণ মোফার নিজের দোষে হয় না, খানিকটা দোষ চাপানো যেতে পারে বাংলা বর্ণবিন্যাস কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ক্ষন্তে। কে সাজিয়েছিলেন বাংলা বর্ণ, উইলিয়াম কেরি নাকি বিদ্যাসাগর? মোফা ভুলে গেছে, তাই আমরা আর সঠিক তথ্যটি জানার সুযোগ পাই না, কিন্তু সেক্ষেত্রে দুজনের ঘাড়েই বিশ পার্সেন্ট দরে শতকরা চল্লিশ ভাগ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বাংলা বর্ণবিন্যাসের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে বাকি ষাট ভাগ, বালাই ষাট, মোফার শুকনা নড়বড়ে ঘাড়েই চাপে।

ক, খ এর পর গ-ই তো আসে, তাই না? সেই নিয়মের ভরবেগে, নিউটন কর্তৃক কপচিত গতিজড়তার পাল্লায় পড়ে মোফা মুখ ফসকে বলে ফেলে, অনেকটা সুপারিশের সুরে, ‘গণিকা?’

৭.

আমরা আঁতকে উঠি। কাহিনী কোনদিকে যাচ্ছিলো আমরা ধরতে পারিনি, এখন সব জলের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মোফার বন্ধ হয়ে যাওয়া ডান চোখ, আব গজিয়ে যাওয়া ডান চোয়াল, সব কিছুর পেছনে একটা স্পষ্ট পোক অনপনেয় কারণ, যেটা ছাড়া কার্য হওয়া মুশ্কিল, খুঁজে পাই আমরা।

মোফা একটু থামে, হাঁক ছেড়ে জুম্মানকে বলে চা দিয়ে যেতে, তারপর আবার বলতে থাকে।

৮.

নাম শুনেই মনিকা খালুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ‘বাহ্! বেশ চালু মাথা তো তোমার ? — হবে না, কবিতাটিবিতা লিখলে বেশ মাথা খোলে, ছন্দগুলো পটাপট মিলিয়ে দেয়া যায়। কণিকা ক্ষণিকা গণিকা — একেবারে রেলের বগির মতো, অ্যাঁ, ক খ গ! আমার তো নিজেকে ইঞ্জিনের মতো মনে হচ্ছে হে, টেনে চলেছি সমানে! — ইশ্, আমার ছেলেটা যদি মাঝখানে ডাইনিং কারের মতো হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসতে পারতো, কি চমৎকার দেখাতো? অ্যঁ ? কণিকা, ক্ষণিকা, টনিক, তারপর গণিকা? — তোমার মনিকা খালা স্টেশন মাস্টারি করতে গিয়ে বেশি পোদারি করে ফেললো, নইলে এবারেই ডাইনিং বগিটাকে ঠিক জায়গায় ফিট করে ফেলতে পারতাম। দেখি, কী আর করা, সামনের বার —।’

উৎফুল্ল মনিকা খালু সমানে বকে যান, আর হতভস্ত মোফা বসে থাকে সোফায়, কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ! এ কি করলো সে? নিজের পায়ে এভাবে কুড়াল মারলো? নিজের কবর নিজে খুঁড়লো? — কিন্তু এই ব্যটা বাবুল হোসেন এই নাম শুনে এতো খুশি কেন?

তৎক্ষণাত্ম উত্তর পেয়ে যায় মোফা। মনিকা খালু বলেন, ‘মানে কী এই নামের, অ্যাঁ? — বাংলায় আমি একটু কাঁচা, বুঝলে, টেনেটুনে কোনমতে পাশ করে গেছি পরীক্ষায়। প্রত্যেকবার কানের পাশ দিয়ে গুল্লি গেছে, গুল্লি! কানের লতি গরম হয়ে আছে এখনো! গণিকা মানে কী?’

মোফা পালাবার পথ খোঁজে, কিন্তু পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করে ওর সাথে, তারা নড়তে চায় না।

নিরান্তর মোফাকে বসে থাকতে দেখে মনিকা খালু হোসেন। ‘হা হা হা, কোন চিন্তা নেই! মানে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না এতো, এই বাবুল হোসেন নাম নিয়ে জন্মেছি, নামের মানে নিয়ে লাফালাফি করা কি আমাকে মানায়, বলো? এই গণিকা নামটাই ইনশাল্ল্যা ফাইন্যাল করে ফেলবো, তুমি বাবা কোয়ালিফায়েড ছেলে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে আলতুফালতু একটা নাম সাজেস্ট করবে না? যাঁঁ?’

মোফা খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, আর মনে মনে প্রাণপণে নৃতন আরেকটা মিল খুঁজতে চায়, গণিকার পরিবর্তে আরেকটা নাম তো তাকে সামনে হাজির করতে হবে, নইলে মনিকা খালুর এই গণিকাপ্রীতি পরে তার জন্যে ঘোর বিপদ ডেকে আনতে পারে। এ নামের খবর পাঁচকান — শিক্ষিত কান — হলে মোফা কঠিন বাটে পড়বে। — কিন্তু আর কোন নাম তার মাথায় আসে না, বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখার ছেলে তো মোফা নয়। তার মাথা আরো গুলিয়ে যায়, কিছুই ভেবে পায় না সে।

ওদিকে মোফার রক্ত ঠান্ডা করে দিয়ে, মনিকা খালু বকে যান। ‘— তবে হয়েছে কি বাবা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা শুধু নামটাই দ্যাখে, নামের চটকটাই খোঁজে, নামের অর্থ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। একটা বিদ্যুতে আরবি কি ফারসি কি পশতু কি উজবেক কি উর্দু শব্দ কানে ঢুকলেই হলো, বাচ্চার বাবামা অমনি ছেলেমেয়ের নাম রাখে ফারদিন, কারিশমা, ইন্টিমেট, গিলগামেশ, সালদানহা — তুমই বলো, অর্থ না জেনে কারো নাম রাখা কি নিরাপদ? শেষে একদিন জানা যাবে, পশতু ভাষায় নামের অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় পেছাপায়খানা! উহু বাবা, আমি সেই রিস্কে যেতে চাই না। — আমার কথা হলো, নাম যখন একটা রাখা হবে, তার সাথে অর্থও জোটা চাই। অর্থই আমার কাছে আসল, তার জন্যে একটা অনর্থ ঘটিয়ে ফেলতেও আমি পিছপা নই! সেজন্যে, এই যে দ্যাখো, আজকেই বিকালে নিউমার্কেট থেকে নগদ অর্থ খরচ করে আমি বাংলা ভাষার ডিকশনারি কিনে এনেছি! এখানে অবশ্য বাচ্চাদের নামের বইও পাওয়া যায়, উল্টেপাল্টে দেখলামও একটু, কিন্তু নামগুলো বদসুরত আর খাপছাড়া। আর তুমি যখন আছো, তখন কি আর নামের বই লাগে নাকি?’

বলতে বলতে সোফার পাশের টিপয় থেকে প্রকান্ড একটা ডিকশনারি বের করে নিয়ে আসেন মনিকা খালু, আর মোফার হৃৎপিন্ড টনসিলের কাছে এসে কয়লার ইঞ্জিনের মতো ঝুকবুক করতে থাকে।

মনিকা খালু পাতা ওল্টান আর বলেন, ‘গণিকা, তাই না? বানান কীভাবে? আবার জএর পিঠে এও জ্ঞিকা না তো? এই জ্ঞ অক্ষরটা লিখতে, বুঝলে, আমার খুব সমস্যা হয়, উল্টাপাল্টা লেগে যায়। খান্তির সময় এমন হয়েছিলো। তোমার খালা সেবার তাঁর কোন এক অধ্যাপক মামুকে ধরে এনেছিলো নাম রাখার জন্যে। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম, মেয়ের নাম হচ্ছে খনিকা। তারপরে শুনি না, ক্ষণিকা! আবার মূর্ধ্য গ দিয়ে লিখতে হয়। খ লিখতে গেলেই জানকাবার, ক্ষ লেখা তো আরো টাফ! — তবে আমার মেয়ে দুটার মাথা ভালো, নিজেদের নাম কি পটাপট বাংলায় লেখা শিখে গেছে! — আর আমি তো বাচ্চা বয়সে বাবুল লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যেতাম। কণিকা আর ক্ষণিকা যদি লিখতে হতো — বাবারে! — দাঁড়াও, চট করে আগেই দেখে

নিই, জ্ঞানিকা বলে কোন মাল আছে কি না। থাকলে খুবই সমস্যা – উঁহ, জ্ঞ দিয়ে এমন কিছু নেই! বাঁচা গেলো!’

মোফা একটা কিছু বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই খালু শুনগুন করতে থাকেন, ‘তাহলে গ-তেই ফিরে আসি। হৃষি, গণ – গণৎ – গণিকা – গণিকা –।’

পড়তে পড়তে মনিকা খালুর কালোপানা মুখখানা লাল হয়ে যায়, তারপর সেটা আগের চেয়ে কালো হয়ে ওঠে, তারপর কখনো কালো, কখনো লাল, কোথাও কালো, কোথাও লাল, এমন হরেক ছোপ আর শেডের দুরঙ্গ মুখ তুলে মোফার দিকে তাকান তিনি। মোফা একটা অভয় দানের ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত একটা কাঁচুমাচু কৈফিয়তের হাসিতে রূপ নেয়।

মনিকা খালু সিংহগর্জনে বলেন, ‘গণিকা, না?’

মোফা বলতে চেষ্টা করে, ‘না খালু, ইয়ে –।’

‘আমার মেয়ের নাম নিয়ে ফাইজলামি করো তুমি?’ হৃক্ষার ছাড়েন মনিকা খালু। ‘এইজন্য তোমাকে আমরা এক্সপার্টের মতো খাতির করে ডেকে আনলাম? গণিকা?’ তিনি বিপজ্জনক ভঙ্গিতে তাঁর কুর্তার হাতা গোটাতে থাকেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, অবিলম্বে তিনি কর্তৃকারক ও কর্মকারককে আলোচনায় টেনে আনবেন।

জান বাঁচানো ফরজ, তাই চকিতে মোফার মন্তিক্ষে একটি মিল ঘাই মেরে যায়। সে ঠোঁটে হাসি টেনে বলে, ‘না না খালু, আমি তো বলেছি ঘনিকা – আপনি কি শুনতে কি শুনলেন? ঘনিকা, মানে কি না, খুব ঘন, নিবিড়, আপন –।’

কিন্তু মনিকা খালু ততক্ষণে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। বাঙালি একবার ক্ষেপলে কি বিনা রক্তপাতে কখনো শান্ত হয়? কখনো হয়েছে? দাঁত কিড়মিড় করে তিনি বলেন, ‘গণিকাঘনিকার খ্যাতা পুরি আমি, বদমায়েশ কোথাকার –।’ তিনি সোফা ছেড়ে তাঁর আড়াইমণি লাশ নিয়ে উঠে দাঁড়ান, তাঁর হাবভাব দেখে মোফার মনে হয়, শিগগীরই একটি যুৎসই করণকারক তাঁর হস্তগত হয়ে আলোচনায় অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে।

৯.

আমরা রূদ্ধশাসে শুনছিলাম, আমাদেরও কালো মুখ লাল হয়ে ওঠে উত্তেজনায়। মনিকা খালুর মতো আমরাও উঠে ঝুঁকে পড়ি মোফার দিকে। এবার তবে সেই পাদুকাপর্ব, দ্বারা-দিয়া-কর্তৃকের চূড়ান্ত?

‘তারপর, তোর চুল মুঠি করে ধরে দিলো চপ্পলের বাড়ি?’ বলে রেজা।

‘আরে যা ভাগ তুই!’ খেঁকিয়ে ওঠে শিবলি। ‘চপ্পল মেরে এই তক্ষরমারা হাল করা যায় কারো? তোকে স্যান্ডেল খুলে মেরেছে, না রে? মোটা সোলের মহিয়ের চামড়ার স্যান্ডেল?’

আমি ঘোর আপত্তি করি। ‘কিসের স্যান্ডেল? স্যান্ডেল দিয়ে এমন শুয়োরপেটা করতে গেলে সোল খুলে পড়ে যাবে। খালু শালা নিশ্চয়ই বুট পরে ছিলো!’

মোফা চরম নেতিবাচকতায় মাথা নাড়তে গিয়ে ককিয়ে ওঠে। তারপর নিজের ক্ষতিগ্রস্ত চোয়ালটাকে যতদূর সন্তুষ্ট কর নাড়িয়ে বলে, ‘আমাকে মেরেছে ডিকশনারি দিয়ে!’

আমরা স্তুর হয়ে যাই। ডিকশনারি দিয়ে যে কাউকে মারা সন্তুষ্ট, এ আমাদের কল্পনাতেও আসে না। মনিকা খালু লোকটা এতবড় সাহিত্যিক গুন্ডা!

মোফা ভাঙ্গা গলায় বলে, ‘বদমাইশ লোকটা বাংলা একাডেমির ডিকশনারি দিয়ে মেরেছে আমাকে। সংসদ ডিকশনারি হলে এতো জোরে লাগতো না, একবার মারলেই বাঁধাই খুলে বইটা নরম হয়ে যেতো। কেন যে বাংলা একাডেমির লোকজন এতো মজবুত বাঁধাইয়ের বই বার করে! তাছাড়া চেখা হার্ড কাভার, ওফ, বাবাগো –!’ চোয়ালে হাত বুলায় সে।

‘অনেকবার মেরেছে নাকি তোকে?’

মোফা মুখ বিকৃত করে মাথা ঝাঁকায়। ‘হ্যাঁ, মিনিট দশেক ধরে। মনিকা খালা আর আম্মা না আসলে আমাকে পঙ্কু করে ফেলতো।’

১০.

কাহিনী এভাবেই শেষ হয়। মোফা বেচারা রোগাভোগা মানুষ, জান বাঁচানোর ফরজ উদ্দেশ্যে খানিকটা ছুটোছুটি করার চেষ্টা করে সে, কিন্তু শিগগীরই ঘায়েল হয়ে পড়ে, মনিকা খালু ডিকশনারিটা দিয়ে চরমভাবে তাকে উত্তমমধ্যম দেন।

তবে দু'চার ঘা খেয়েই বুদ্ধিমানের মতো চেঁচাতে থাকে মোফা। অকারণে অন্যায় মার খেলে কখনো চুপ করে থাকতে নেই, কোন এক সংস্কৃত শ্লোকে নাকি মোফা পড়েছিলো, সেই শাস্ত্রীয় টেকনিক বেশ টেকসই, হাতেনাতে কাজ দেয়। সবাই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে – মনিকা খালা, মোফার মা, কাজের লোক, সর্বোপরি সাময়িকভাবে পর্দানশীন কণিকা ও ক্ষণিকা। সবাই তড়িঘড়ি করে এসে খালুর হাত থেকে মোফাকে উদ্বার করে। মোফার মা মোফার অবস্থা দেখে সোফায় ঢলে পড়ে যান, মনিকা খালা খালুর হাত থেকে ডিকশনারি কেড়ে নিয়ে চেঁচাতে থাকেন, ‘ছি? লজ্জা করে না তোমার? আবার এই ভর সন্ধ্যায় মদ খেয়ে মাতলামো করছো? রোগা ছেলেটা, এত কষ্ট করে এসেছে তোমার মেয়ের একটা ভালো নাম রাখতে, আর তুমি তাকে এভাবে মারপিট করছো?’

মনিকা খালু চটেমটে বলতে যান, ঠিক কোন কিসিমের ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি এমন একটা মাতালসুলভ গাজোয়ারিতে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু ক্ষিপ্ত মনিকা খালা তাঁকে ঐ ডিকশনারিটা দিয়েই দু'চার ঘা বসিয়ে দ্যান তৎক্ষণাত। ওদিকে কুন্ত ও খান্ত ভুলুঠিত মোফাকে তুলে সোফায় বসিয়ে পরম পরিচর্যা করছিলো, তৃপ্ত মোফা মনে মনে আকস্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছিলো মনিকা খালুকে, কারণ তিনি এমনটা না করলে হয়তো কুন্ত-খান্তকে শেষ দেখার সুযোগটাও তার মিলতো না। আর শুধু শেষ দেখাও নয়, একেবারে মাটি থেকে তুলে কোলে বসানো, ওড়না তুলে বাতাস করা, পানি খাওয়ানোর অপচেষ্টা – সঅব! ঘোল আনার ওপর আঠারো আনা হচ্ছে মনিকা খালার হাতে মনিকা খালুকে মার খেতে দেখা। মোফা তো আর একটু হলেই বলে ফেলছিলো, ‘মারো শালেকো!’

অচিরেই আবার সব স্বাভাবিক হয়ে আসে, মনিকা খালা সোফার আড়াল থেকে জিন আর টনিকের বোতল আর একটা বড় মগ খুঁজে পান, সেই সাথে ‘শিশুদের সুন্দর নাম’ শীর্ষক একটি পাতলা বই, সেগুলো সহ তিনি কাঁচপোকার মতো তেলাপোকাসদৃশ মনিকা খালুকে টেনেহিঁচড়ে ঘরের বাইরে নিয়ে যান। স্ত্রীর কাছে ভদ্রলোক পালোয়ানগিরির সাহস পান না, সুড়সুড় করে চলে যান। মোফার মা জ্ঞান ফিরে পান, মোফাকে কুন্ত আর খান্ত মিলে ঘন্টাখানেক ধরে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়, শরবত খাওয়ায়, ফিসফিস করে গল্পও করে। কুমুদিনী আর ক্ষীণতনু নাম দুটিও মোফা জানিয়ে দেয়, দুই বোন মুখে ওড়না চেপে খিলখিল করে হাসে। পরিশেষে আলগোছে নিজের মোবাইল নাস্বারটা গছিয়ে দিয়ে মোফা মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ওর নটে গাছটিও সাথে মুড়োয়।

১১.

গল্পের শেষটা আমার কাছে একেবারেই ভালো লাগে না। মোফা শালা ধোলাই খাচ্ছিলো, ততটুকু শুনতে বেশ ভালোই লাগছিলো, কিন্তু শেষমেষ কুন্ত আর খান্তর নখড়ামোর আখ্যান শুনে পিতি জ্বলে ওঠে। নাহয় খানিকটা ধোলাই খেয়েছে, অত খাতিরের দরকারটা কি রে বাবা?

পরশ্রীকাতরতায় আমি জ্বলতে থাকি, তারই আগুন জ্বলে ওঠে আমার প্রশ্নে, ‘তাই? আর সেই পিচ্ছিটার নাম রাখার কী হলো? – যে কাজে গিয়েছিলি, সেটাই না করে চলে এলি?’

মোফা গন্তীর হয়ে বলে, ‘মোটেও না। মনিকা খালাকে চলে আসার আগে আরেকটা নাম দিয়ে এসেছি।’

আমরা সবাই একটা নিষ্ঠা স্টার্জার্জের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি মোফার দিকে।

মোফা চায়ের কাপে চুমুক দেয় আর আপনমনে বকে যায়। ‘মনিকা খালার এই মেয়েটা পুরো তার বাপের মতো হয়েছে দেখতে। একেবারে কৃষ্ণকলি, ইয়া মুশকো চেহারা, এই ক’দিন বয়স, এখনই নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। মনিকা খালুর টনিকের স্বপ্ন তো পূরণ করবেই, ব্যবসা দেখার দায়িত্বও বোধহয় খালু এর হাতেই ছাড়বে। – তাই একটা যুৎসই, সামঞ্জস্যপূর্ণ নাম ভেবে বার করলাম, সাথে অন্তমিলের শ্যাম আর আধুনিকতার কুল দুটোই বজায় রাখলাম।’

‘কী সেটা? ধনিকা?’ জানতে চায় শিবলি। ‘মানে, যে মেয়ে খুব ধনী?’

‘উঁহ।’ মোফা মাথা নাড়ে। ‘সেটা সেকেলে শোনায়। আমার দেয়া নামটা মিষ্টি, বণিকা। – অর্থাৎ কি না, যে মেয়ে ব্যবসা করে। মনিকা খালু বন্ত বলে ডাকছেন এখন। আমি আবার মনিকা খালাকে একেবারে ডিকশনারি খুলে দেখিয়ে দিয়ে এসেছি, যে নামের একটা ভালো অর্থ আছে।’

আমরা মোফার ক্ষতবিক্ষত মুখে একটা তৃপ্ত হাসি ফুটে উঠতে দেখি।

আমি খাঁটি বাঙালি, অপর বাঙালির সুখী মুখ দেখলে আমার গা জ্বালা করাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু কেমন একটা অস্বাভাবিক মাত্রাছাড়া গাত্রদাহ হতে থাকে আমার। মনে মনে ভাবি, ‘ব্যাটা বেয়াকেল, শালির নাম রাখার আনন্দে বত্রিশ দাঁত বের করে হাসছে!’

## পেন-কিলার

### প্রমিতা বাগচী

মোবাইলের কর্কশ অ্যালার্মটা স্বপ্নের মাঝে বেখাঙ্গাভাবে ঠুকে দিয়ে দিন শুরুর জানান দিল। রাত জাগতে কোনো ক্লান্তি নেই মিতালীর, কিন্তু সকালের অলস আমেজ ওর বড় প্রিয়। বিছানা ছাড়ার আগে যতটুকু সন্দৰ উপভোগ করে নেয় এই শেষ তন্দ্রাচ্ছন্ম মুহূর্তটুকু। আসলে মিতালীর জীবনে জাড় একটু বেশী। এরপর অফিসে গিয়ে লাভ-লোকসান আর সাফল্য-ব্যর্থতার দৈনিক হিসেবনিকেশ যখন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ভাবনার আলস্যকে দূর করবে, তারপর আর সমস্যা নেই। হাল-ফ্যাশনে বলে ইঁদুর-দৌড়, কিন্তু মিতালীর কাছে এ জীবনের গতি মাত্র। কখনো হয়তো ব্যক্তিগত ব্যর্থতাকে ঢাকার তাগিদে সাফল্যের সন্ধানে দৌড়েছে ও, তবু এ তার এগোনোর আনন্দে চলাও বটে। আর পাঁচজন চরিশ বছরের মেয়ের চেয়ে ওর জীবনে অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য বেশী, মাধুর্য কম। তবু দুঃখবিলাসের মাদক নেশা কাটাতে পেরেছে বলেই ওর ভান্ডারে যে সাফল্য আর স্বীকৃতি তাও আর পাঁচজনের চেয়ে বেশী।

তবু আজকে সকালের মিটিং-এর অপ্রত্যাশিত দৈর্ঘ্য বড় চথল করছিল মিতালীকে। তিন ঘন্টা পিছনের সময়ে পড়ে থাকা সুগতর এটা সকালে উঠে কাজে বেরোনোর আগে ই-ডাকবাক্সে টু মারার সময়। কালকের মনোমালিন্যের ম্লানতাটুকু মুছে না যাওয়া অবধি মিতালীর শান্তি নেই।

বন্ধুদের মিতালী-সুগতর সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে শতেক কল্পনা। বন্ধুত্বের রঙে অল্প গোলাপের আভা মিতালী কখনো দেখেনি এমন নয়, তবু প্রিয় বন্ধুকে চেনে বলে ও জানে এ গোলাপের কাঁটায় রক্তাক্ত হবে শুধু ও নিজেই। পুরোনো সম্পর্কের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কারের কাজে এখনো সম্পূর্ণ সফল নয়, নতুন করে সেই আঘাতকে আমন্ত্রণ জানানোর সাহস নেই ওর। এতো শুধু নিজের দ্রুতির পরীক্ষা নয়, অন্যের জীবনছন্দে নিজেকে ভাঙ্গার খেলা। ভালোলাগা ভালোবাসায় নিজের হৃদয়ে আগল বসিয়ে লাভ নেই সত্যি, তবে এ ফাঁদে পা দেওয়ার ব্যাপারে ও সতর্ক।

তবু সুগত ওর বন্ধু, সবচেয়ে কাছের বন্ধু। দু'জনের সারাদিনের ব্যন্ততার ফাঁকে কখনো বিরতি নেওয়ার প্রয়োজনে, কখনো বা অপ্রয়োজনে আন্তর্জালবার্তার আদান-প্রদান ওদের প্রিয় অবসরযাপন। এ মিতালীর জীবনে খোলা হাওয়া। চিন্তিত অথচ কি বলতে হবে না জেনে বিচলিত বন্ধুর প্রতিক্রিয়া মিতালীর মনখারাপের দিনগুলোকেও সুন্দর করে, আবার সুন্দর দিনে একগুঁয়ে ছেলেটার মনখারাপের আভাস মিতালীর দিন করে বিবর্ণ। সুন্দরী মেয়ে দেখে উত্তলা সুগতর সাথে কথা বলে মনে ছোট ভুল বেঁধে না, তা নয়, তবু ঘুমোতে যাওয়ার সময় সুগতর জন্য ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। সুগতর সময় মিলিয়ে নামের পাশে সবুজ আলো জ্বালাতে ভুল হয় না ওর।

তবু খোলা হাওয়ায় বুঝি কখনো অক্সিজেন কম পড়ে। ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে থাকা হয়তো বা বিষয়ইন অসংখ্য কথায় আজকাল যেন কোথায় ছন্দ কাটে। সাধারণ রসিকতাও কখনো শূল হয়ে বেঁধে। কখনো বা অপ্রিয় সূত্রির ভাঁড়ার হাতড়ায় দুজনে।

-“রোজ রোজ আমি মজা করতে যাই, আর তোর মেজাজ খারাপ হয়, আমারও অল্প হয়; আমার ভালো লাগে না আর।” বলেছিল মিতালী।

- “তোর আবার মেজাজ কেন খারাপ হল?”

- “না, আমার হয়নি, তোর হল। আজকে থাক আর কথা বলে কাজ নেই।” মিতালীর অল্প নৈশ্বর্য এতো দূর থেকে পড়া সন্তুষ্ট হয় না সুগতর।

- “না, বল।” সুগতর জবাব, সাথে হাসিমুখের প্রতীকী ছবি। এ সহজ হওয়ার চেষ্টা না ভদ্রতা বুঝতে পারে না মিতালী।

আজ সারাদিনের চেনা জীবন কেমন অসহ্য ঠেকছে তারপর। “মাথা ঠান্ডা হলো?” বা “এখনো ওসব ভাবছিস নাকি?” জাতীয় বার্তার অপেক্ষাও বড় নিষ্ঠুর। এসব ঠেকাতে কাজে মন দেওয়ায় অবশ্য পারদর্শী মিতালী, তবু দিনশেষে কথা বলার জন্য উত্তলা হয়। সহজ হওয়ার উপায় খোঁজে সারাদিন।

অবশেষে কিছু সাধারণ রসিকতা।

- “কী করছিস?” জানতে চায় সুগত।

- “গান শুনছি।” হঠাতে পড়ে গেল “তোর অপেক্ষা” বলার খোলা মনটা ও কবে কোথায় না জানি হারিয়ে ফেলেছে। - “তুই কী করছিস?”

- “কিছুই না। ক্লান্ত।”

সত্যি মিতালীও আজ বড় ক্লান্ত। সারাদিনের আর বিগত রাতের না ঘুমোনোর ক্লান্তি ওর দেহজুড়ে। হয়তো কাল আবার কথা হবে, হয়তো হবে না, কিন্তু এর অঞ্জিজেনও বোধহয় ফুরিয়ে এলো। ভালোবাসা, ভালোলাগা, বন্ধুত্বের অনুভূতিগুলো বোধহয় আনেক আগে কোথাও ফেলে এসেছে মিতালী। এখন দৌড়ের মাঝে শুধু বেদনার উপশম খোঁজে সম্পর্কগুলো থেকে, সম্পর্ক বয়ে নিয়ে যাওয়ার জোর হারিয়ে ফেলেছে। না, আজ রাতে ঘুমোতে হবে, আজকে ছুটি চাই। কাল থেকে আবার নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করার দৌড়, আর নতুন একটা পেন-কিলারের খোঁজ।

## পরিবর্তন

### প্রতাপ সেন চৌধুরী

আমার এই গল্পের নামক নায়িকা পাত্রপাত্রী বা ঘটনা সবই কাল্পনিক, বাস্তবের সংগে এর কোন মিল নেই। বাস্তবের কোনকিছুর সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মিল হলে মার্জনা করবেন।

১

কোনো নেতা বা নেত্রী যখন দল পাল্টায় নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে – সে যত বড়ই নেতা বা নেত্রী হোক না কেন আমার মনে রেখাপাত করে না কারণ এটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিই – বিশেষত বর্তমানের এই অবক্ষয়ী রাজনৈতিক পটভূমিতে। কিন্তু আমার মনে এক বিরাট ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল সেইদিন যেদিন আমি দেখলাম আমারই পরিচিত একজন সাহিত্যিক, যিনি ইদানীং কালের এক প্রতিষ্ঠিত লেখক, যাকে আমি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতাম, তিনি এক রাজনৈতিক দলের হাতের পুতুল হয়ে গেলেন।

বছরখানেক আগের কথা, কলেজ স্ট্রীটে গেছি পুরোনো বইয়ের সন্ধানে, আমি যে দোকানের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা বহু পুরনো, কলেজজীবনে বহুবার এই দোকানে এসেছি। ফুটপাতের দোকান, এখানে শুধু সিলেবাসের বই নয় বড় বড় সাহিত্যিকদের লেখা বইও থাকত। বই দরদাম করছি এমনসময় একটা কোয়ালিস গাড়ী রাস্তার ওপাশে এসে দাঢ়াল।

গাড়ী থেকে নেমে এলেন দামী পাঞ্জাবী পাজামা পড়া, মাথায় ব্যাকব্রাশ কাঁচাপাকা চুল, চোখে সানগ্লাস পড়ে এক ভদ্রলোক, রাস্তা পেরিয়ে এপাশে আসতেই মনে হল যেন চেনা চেনা, কোথায় যেন দেখেছি –

- আরে মানবদা না!

তখন আমি কলেজে পড়ি। আমি পড়তাম কলকাতা থেকে বহুদূরে, রানীগঞ্জ কলেজে। একটু-আধটু লেখার অভ্যাস ছিল বরাবরের, সেই সূত্রে বিভিন্ন সাহিত্যসভায় নিমন্ত্রণ পেতাম। এইরকমই এক সাহিত্য আলোচনা সভা হয় আসানসোলে, এখানে সাংবাদিক সাহিত্যিক সবাই আসতেন। তখন প্রাণতোষদা মানে প্রাণতোষ ঘটক বেঁচে ছিলেন, এই সভার প্রধান অতিথি ছিলেন উনি।

আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল – আধুনিক সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখক নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সাহিত্যের ব্যাখ্যা করলেন। শুধু একজনের কথা বলব, যার আলোচনা আমার আজ ও কানে লেগে আছে।

এক ২৭/২৮ বছরের যুবক, খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, পরণে খাদির পাঞ্জাবী ও সাধারণ একটি পাজামা, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মতামত দিতে গিয়ে বললেন – ‘মানুষের সহিত যা কিছু সম্পর্কিত তাই সাহিত্য। মানুষের জীবনে প্রেম আছে, ভোগের আনন্দ আছে, তেমনি দুঃখও আছে – আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষই নানাবিধ অত্যাচার অনাচারের শিকার হয়ে দুঃখদুর্দশার মধ্যে দিন কাটায়। যেমন দারিদ্র, বেকারত্ব, পণপ্রথা, বধূনির্যাতন, ছোট ব্যবসায়ীদের উপর নিয়মিত তোলা আদায়ের জুলুম ইত্যাদি করতরকম কারণে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। আমরা এসমস্ত অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করতে পারব না ঠিকই কিন্তু লেখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদ তো করতে পারি, তাই আমার মনে হয় সাহিত্য যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করবে, প্রেমের মহিমা প্রকাশ করবে তেমনি সমাজের অন্যায় অবিচারকে তুলে ধরে মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারের পথনির্দেশ করবে। মানুষের জীবনের প্রকৃত প্রতিফলনেই সাহিত্যের বিকাশ।’

— একটানা এই কথাগুলো বলে উনি লাজুক ভঙ্গীতে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন - ‘আমার কথায় যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকে বা গুরুত্ব থাকে মার্জনা করবেন।’

২

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রাণতোষদা ওনাকে সমর্থন করে বললেন - ‘এরকম বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সাহিত্যকে অন্তরে গেঁথে নিতে হবে। শুধুমাত্র মানুষের জীবনের কথা নয়, জীবন ও সমাজের প্রতি সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের পথনির্দেশই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য।’

যাইহোক ওনার নাম জানলাম মানবেন্দ্রনাথ বসু।

এগিয়ে গিয়ে নিজেই আলাপ করলাম। বললাম - ‘এত সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যের ব্যাখ্যা সতিই আমাকে মুঞ্চ করেছে।’ উনি হেসে বললেন - ‘ধন্যবাদ’, এরপর সাবলীলভাবেই আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, পরিচয় দেবার পর উনি বললেন - ‘তুমি তো এখনও পড়ছ, সাহিত্য সম্পর্কে জানার অনেক কিছু তোমার বাকি আছে, একদিন আমার কাছে এসো আলোচনা করব।’ এই বলে উনি আমায় একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিলেন। আসানসোলে হটেল রোডে ওনার বাড়ি।

এক রবিবার সকালবেলায় গেলাম। হটেল রোডে একটা দোতালা পুরনো বাড়ি। দোতালায় দশ বাই আটের একটা ঘর আর সঙ্গে একফালি বারান্দা এই নিয়েই ওনার সংসার। মা আগেই গত হয়েছিলেন, এম এ পড়তে পড়তে বাবাও মারা গেলেন। পৈতৃক বাড়ির এইটুকু অংশই উনি পেয়েছিলেন।

এসব জেনেছি অনেক পরে আস্তে আস্তে। যাইহোক উনি সেদিন আমাকে খুব আদর করে ঘরে নিয়ে বসালেন। নিজে হাতে চা করে খাওয়ালেন। তারপর অনেক আলোচনা হল। উনি অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। বেশিরভাগ গল্প জুড়েই ছিল হতদরিদ্র পরিবারের বখনার কাহিনী, শুশ্রবাড়ীতে বধুনির্যাতনের ঘটনা ইত্যাদি। কিন্তু আমার যেটা সবথেকে ভাল লেগেছিল সেটা হল ঘটনার বর্ণনার সাথে সাথে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার রাস্তা পাঠকদের কাছে রাখতেন।

এইভাবেই ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল। আমিও আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছি উনিও তুমি থেকে তুইতে। ওনার তখন সবে নামডাক হয়েছে, কিছু প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে। একদিন উনি বললেন - পারলাম না ভাই, আমি বললাম - কি? উনি বললেন আশা ছিল ছোটগল্প সংকলনের একটা বই ছাপাব, অনেক প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরলাম, কেউ বলেন - আপনার লেখার বাঁধুনি খুব ভাল কিন্তু এসব বাজারে খাবে না, কেউ বলেন - অন্তত দশ হাজার টাকা জোগাড় করছেন ছেপে দেব; কোথায় পাব এত টাকা! নিজেই টিউশন করে পেট চালাই।

এরপর আমার পড়া শেষ হয়ে গেল। সংসারের প্রয়োজনে চাকরীতে ঢুকলাম। কিছু দিন কোন যোগাযোগ ছিল না। বছরখানেক পর একদিন গিয়ে দেখলাম উনি বাড়িতে তালা দিয়ে কোথায় চলে গেছেন, কেউ জানে না। সংসারের চাপে ইতিমধ্যে সাহিত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে পুরোপুরি সংসারে মন দিয়েছি। এরপর এই দীর্ঘ দশ বছরে এতো পরিবর্তন! সম্মিলিত ফিরল কাঁধে হাতের স্পর্শে। - কি রে কেমন আছিস?

ফিরে দেখি, মানবদা, বললাম, তুমি! মানবদা বলল - খুব অবাক হচ্ছিস, তাই না?

বললাম - অবাক হবারই তো কথা, হটেল রোডের সেই মানবদাকে মেলাতে পারছি না যে।

উনি বললেন, সে অনেক কথা, বলব। সামনের রোববার কি করছিস?

বললাম — তেমন কোন কাজ নেই। বললেন — তবে চলে আয়, বলে উনি আমাকে একটা কার্ড দিলেন, বললেন — আজ আমার একটু তাড়া আছে, আমি যাই, এই বলে উনি চলে গেলেন।

রবিবার সকাল সকাল বেড়িয়ে পড়লাম। ঠিকানাটা সল্ট লেকের। গিয়ে পৌছলাম এক বিশাল বাংলোর সামনে। গ্যারেজে গাড়ি দেখে বুঝলাম বাড়িতেই আছেন। গেটের সামনে দাঁড়াতেই দারোয়ান গেট খুলে দিল। বলাই ছিল বোধহয়। গিয়ে ঢুকতেই মানবদা বেরিয়ে এলেন। বললেন — আয়। ভেতরে ঢুকতেই বিশাল ড্রয়িংরুম, আধুনিক আসবাবে সুসজ্জিত। আমাকে একটা সোফা দেখিয়ে বললেন — বোস, বলে ভেতরে চলে গেলেন।

### ৩

বসে আকাশ পাতাল ভাবছি, কিছুক্ষণ পর উনি এলেন পেছনে একজন বয়স্ক লোক একটা ট্রে-তে কফি ও নানারকম স্ন্যাকস নিয়ে ঢুকলো। ট্রে সামনের টি-টেবিলে রেখে লোকটি চলে গেল। একটা কফি তুলে নিয়ে মানবদা বললেন — কি এতো ভাবছিস, নে কফি খা।

বললাম — তোমার কথাই ভাবছি। উনি বললেন — আর ভাবতে হবে না, শোন। তখনো আসানসোল থেকে কলকাতায় প্রকাশকের দরজায় ঘোরাঘুরি করছি, এরই মধ্যে দেব লাইব্রেরি আমার লেখার কপি জমা দিয়ে যেতে বলে আর পরে একদিন আসতে বলে। একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে আরেকদিন গেছি। দেখি এক সুন্দরী মহিলা বসে আছে। আমাকে দেখে আমার পরিচয় জানতে চায়। পরিচয় দেবার পর বলে — ও আছ্ছা, আপনি বসুন, এখনি মামা চলে আসবে। বললাম — মামা মানে! ও বলল — মানে গৌরীশঙ্কর দেব, এই প্রতিষ্ঠানের মালিক, আমার মামা। দেখলাম ওর হাতে আমারই লেখা কপি।

মন দিয়ে পড়ছেন। কিছুক্ষণ পর দেববাবু এলেন। মাথায় একরাশ পাকা চুল, বেশ ফর্সা, মুখ পরিষ্কার শেভ করা, ধূতি ও পাঞ্জাবি পরে এক পরিচ্ছন্ন প্রোটু ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বসলেন।

আমাকে দেখে বললেন — আপনি! পরিচয় দিতেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন — মিত্রা গল্পগুলি পড়েছিস?

মিত্রা বলল — হ্যাঁ, সবগুলি গল্পই আমার ভাল লেগেছে।

— ওর যখন পছন্দ হয়েছে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিতে পারি, ওঃ তোমাকে তুমি বলে ফেললাম কিছু মনে কর না।

আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমি বললাম — না না, আপনি আমার কাকার বয়সী।

উনি বললেন — তবে আমি আমার নিজের রিস্কে প্রথম এক হাজার কপি ছাপাব, ভাল সাড়া মিললে আর ভাবতে হবে না। মিত্রার কথা রেখে আমি এইটুকু রিস্ক নিছি।

এবার মেয়েটি আমার দিকে একটু লাজুক ভঙ্গীতে তাকাল। এতক্ষণে একটু ভাল করে দেখলাম ওকে। বয়স বাইশ তেইশ হবে, খুব ফর্সা না হলেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, টানা টানা দুটি চোখ, গড়ন মাঝারি।

দেববাবু আমাকে বললেন — আগামী সোমবার এসো, প্রুফ আর প্রচ্ছদ দেখে যাবে।

একদিন আমার বই ছাপা হল, আমার জীবনের আশা পূরণ হল। বই প্রকাশ হল। ছোটগল্প সংকলনের বই।

খুব ভালো রেসপন্স পেল বইটা। বইয়ের চাহিদা বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে মিত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও বেড়ে ওঠে। মনে আছে যেদিন আমার বই প্রথম প্রকাশ হয় সেদিন ওকে একটা দামী রেস্তোরাঁতে চায়ে নেমন্তন্ত্র

করেছিলাম। কেবিনে একান্তে ওর হাতদুটি ধরে বলেছিলাম – মিত্রা, আজ আপনার জন্যই আমার আশা পূর্ণ হল। ও বলল কিন্তু আমার তো আশা পূরণ হলো না। আমি অবাক হয়ে বললাম – মানে!

— মানে ভেবেছিলাম আজ আমাকে আপনি বন্ধুর মত গ্রহণ করবেন, এই আপনি-আজ্ঞে করলে তা তো সম্ভব নয়। ওর কথার ঢং এ আমি না হেসে পারলাম না, বললাম – আকাশের চাঁদ ধরতে গিয়ে যদি পিছলে পড়ি? আমার কথায় ও হেসে বলল – চাঁদ যদি নিজে এসে ধরা দেয় তবে কোনো আপত্তি নেই তো? আপত্তি! এ তো আমার কল্পনার বাইরে। তুমি যে আমার কাছে এইভাবে ধরা দেবে – ও একটু হেসে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল – বাজে কথা রাখ তো, কিছু খাবার অর্ডার দাও। সেই শুরু – মিত্রার সম্পর্কে জেনেছিলাম ওর মা বাবা খুব ছোটবেলায় মারা যান, মামা নিঃস্তান, তাই মামাই মিত্রাকে মানুষ করেছিলেন, নিজের স্তানের মতই মেহ করতেন। বর্তমানে মিত্রা এম এ পাশ করে বাংলায় এম ফিল করছে।

ইতিমধ্যে আমার খ্যাতি যশ অনেক বেড়ে গেছে। আমার আরো দুটি বই বেরিয়েছে। সব বইয়ের চাহিদাই বাজারে তুঙ্গে। রয়্যালটির পয়সাও ভালই আসছে। আসানসোলে থেকে দেব লাইব্রেরীতে যোগাযোগ রাখা অসুবিধা হচ্ছিল তাই কলকাতায় ঢাকুরিয়াতে একটা বাসাবাড়ি ভাড়া করলাম। আসানসোলের বাড়ি তালা দিয়ে ওখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে এখানে চলে এলাম। তারপর থেকে আমার সাফল্যের যাত্রা শুরু। সেইসঙ্গে আমার প্রেমও সমান তালে চলতে লাগল। মিত্রারা থাকত বালিগঞ্জে। প্রতি ছুটির দিনেই আমরা মিলিত হতাম আর সারাদিন শুধু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতাম।

এ পর্যন্ত বলে মানবদা একটু থেমে বললেন – প্রেমের গল্প আর কত শুনবে ভাই? প্রেমের সফল পরিণতি আমার হয়েছিল। একদিন আমরা বিয়ে করলাম। আমার এই ছোট ফ্ল্যাটে মিত্রার কষ্ট হবে ভেবে মামা এই বাড়ীটা যৌতুক দিলেন। আমি ও মিত্রা প্রথমে আপত্তি করেছিলাম। উনি বললেন – মানব এর মধ্যেই দেব লাইব্রেরীকে যে মুনাফা অর্জন করতে সাহায্য করেছে সেটাই আমি মিত্রাকে দিলাম, একদিকে এটা মানবেরই রোজগার। এরপর আমি মিত্রাকে নিয়ে এই বাড়ীতে চলে এলাম। ইতিমধ্যে মিত্রা এম ফিল কমপ্লিট করে সল্টলেকের একটা নামী ইস্কুলে চাকরী পেয়েছে।

## 8

আমার লেখা আর সংসার সমানতালে চলছিল। ইস্কুলে চাকরি করেও মিত্রা সমস্ত বাড়ীটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলল।

সবকিছু ভালই চলছিল। কিন্তু বিধাতা আমাদের সুখ বেশীদিন সহ্য করতে পারলেন না।

একদিন আমার নামে একটা চিঠি পেলাম। কোন পোস্টাল স্ট্যাম্প নেই, কেউ লেটার বক্সে ফেলে দিয়ে গেছে। মিত্রাই চিঠিটা এনে দিল, দেখ কে দিয়ে গেছে, বললাম – খোলো, মিত্রা খামটা খুলে পড়ল, পড়ে কিছু না বলে আমাকে চিঠিটা দিল। দেখলাম সংক্ষিপ্ত চিঠি, তাতে লেখা,

**শ্রদ্ধেয় মানববাবু,**

আগামী রোববার দয়া করে আমার সাথে দেখা করুন। জরুরী কথা আছে। আমার ছেলেরা সকাল সাড়ে নটায় গাড়ী নিয়ে আপনার বাড়ীর সামনে হাজির থাকবে, তৈরী থাকবেন।

**ইতি-**

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রঞ্জনবাবু একজন প্রভাবশালী বিরোধী দলনেতা। তিনি কেন আমাকে খোঁজ করছেন বুঝতে পারলাম না। অবাক হয়ে মিত্রার দিকে তাকালাম। মিত্রা বলল — তুমি যাবে? বললাম — যেতেই হবে, এরা বিরূপ হলে — তাছাড়া দেখাই যাক না কি বলে। মিত্রা কিছু না বলে চুপ করে রইল।

রবিবার যথাসময়ে দুটি ছেলে টাটা সুমো নিয়ে হাজির। বেরোবার সময় মিত্রা বলল — যাচ্ছ যাও, কিন্তু খুব সাবধান। আমি কিছু না বলে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। ওদের অফিসে ঢুকে দেখি রঞ্জনবাবু ওনার সাঙ্গেপাঙ্গদের নিয়ে বসে আছেন। আমি ঢুকতেই উনি সবাইকে চলে যেতে বললেন। সবাই চলে যেতে উনি সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। আমি বসতেই উনি কোন ভূমিকা না করেই বললেন — মানববাবু, আপনার অনেক গল্প উপন্যাস পড়েছি। আপনি তো সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লেখেন কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পথ দেখান না, এই যে বর্তমানে সরকার এত পুলিশী জুলুম করছে, গ্রামে গ্রামে এত লোক মারা যাচ্ছে, এর প্রতিবাদে লিখুন না। আমাদের একটা লেখক কলাকুশলী ফোরাম আছে আপনি তাদের সঙ্গে আসুন না। ভয় নেই তারা সবাই নিরপেক্ষ। তবে আমাদের নির্দিষ্ট কাগজে আপনাকে লিখতে হবে। আপনার মত প্রতিভাবান লেখক আমাদের দরকার। মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দিতে হবে। এ পর্যন্ত বলে উনি আমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন।

বললাম — মাফ করবেন, কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে তো আমি প্রচার করতে পারব না।

উনি বললেন — প্রচার কোথায় করছেন, আপনি তো শুধু সত্য ঘটনার উপর রেখাপাত করে প্রতিকারের কথা বলবেন, তবে আমাদের কিছু নিরপেক্ষ সংবাদপত্র আছে তাতে আপনাকে লিখতে হবে।

বললাম — কিন্তু আমি তো দেব লাইব্রেরির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। উনি বললেন — সেটা আমি দেখব।

দেখি চিন্তা করে, বলে বেরিয়ে এলাম। ওরাই পৌঁছে দিল। বাড়িতে এসে মিত্রাকে বলতেই ও বলল — তুমি কোনও ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছ না তো? দেখি মামার সাথে আলোচনা করে।

এর কিছুদিন পর মামা আমাকে ডাকলেন, বললেন — রঞ্জনবাবু তোমাকে কিছু বলেছিলেন?

বললাম — হ্যাঁ। উনি বললেন — জানি না কোন ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছ, আমার কাছে এসেছিল অনুমতি চাইতে। অনুমতি তো দিতেই হবে। এদের অনুরোধ মানেই আদেশ।

এ কথার অর্থ বুবেছিলাম অনেক পরে। যাই হোক ঐ কাগজে লিখতে আরস্ত করলাম। আমার সব লেখাই সম্পাদকের অঙ্গুলি হেলনে আস্তে আস্তে ঐ দলের বক্তব্য হয়ে উঠতে লাগল। একদিন মিত্রা আমাকে বলল — তোমার লেখার ধরণ পালটে যাচ্ছে, মানুষের ব্যথা বেদনার চেয়ে দলের মতামতই বেশী।

ইতিমধ্যে কাগজের অফিসে নিয়মিত যাতায়াতের জন্য এই গাড়ীটা আমাকে দেওয়া হয়েছে।

নতুন গাড়ীর চাবিটা যেদিন মিত্রাকে দেখালাম ও বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল, বলল — নিরপেক্ষ আদর্শবান লেখক থেকে আজ তুমি একটা দলের মুখ্যপাত্র, গাড়ী কেন অনেক কিছু পাবে।

আমার আত্মাভিমানে ঘা লাগল। বললাম — তুমি বোধহয় একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছ। আর শুধু আমি কেন অনেক নামীদামী লেখক ওদের সঙ্গে আছেন, আমি যে কাগজে লিখি সেটাও তো নিরপেক্ষ সংবাদপত্র। ও বলল — নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ বলে গলা ফাটালেই নিরপেক্ষ হওয়া যায় না, এর চেয়ে প্রেমের গল্প কবিতা লিখে পয়সা রোজগার করা ভালো।’ সেই শুরু, প্রায়ই খটামাটি লেগেই থাকত।

অনেক সময় ও আমাকে কাগজ দেখিয়ে বলত — দেখো, তোমরা শুধু রাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃত্যুর কথাই লেখ, তাও বিশেষ কোনো দলের লোক মারা গেলে তোমাদের সমবেদনা উথলে ওঠে।

কি করে বোঝাই ওকে যে সব কিছু আমার ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না। পশ্চিমবাংলার আংশিক পট পরিবর্তন হল, বিরোধীরা সংসদ নির্বাচনে বেশীরভাগ আসন জিতে নিল। রঞ্জনবাবু কেন্দ্রে মন্ত্রী হলেন। মিত্রার সঙ্গে চরম অশান্তি হলো সেদিন যেদিন আমি কেন্দ্রীয় সরকারের একটা দণ্ডরের আন্দারে একটি বিভাগে উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হলাম। মিত্রার হাতেই চিঠিটা পড়ল, ও চিঠিটা খুলে পড়ে আমাকে দিয়ে বলল — নাও, গরীব মানুষের রক্তের দাম পেয়ে গেছো। পঞ্চাশ হাজার টাকার মাসিক চুক্তিতে এই কাজটা সত্যিই আমার কাছে লোভনীয় ছিলো।

বললাম — ক্ষতি কি? একদিন দশ হাজার টাকার জন্য একটা বই ছাপাতে পারিনি।

মিত্রা আমার দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মুখ ফুটে বলতে পারল না যে আজ ও পেছনে না থাকলে এত খ্যাতিও হত না আর রঞ্জনবাবু ও ডাকতেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঢ়িয়ে থেকে গুম হয়ে আমার সামনে থেকে সরে গেল। ও, তোমাকে বলা হয়নি ও আমার এই গাড়ীতে কোনদিন চড়ে নি, বলেছিল — ওটা উপহার নয়, ওটা দুষ, ওই গাড়ীতে চাপতে আমার ঘেঁষা হয়।

যেদিন কাজে জয়েন করতে গেলাম দিল্লীতে সেদিন আমাকে ও সী-অফ করতেও যায় নি।

দিল্লী থেকে ফিরলাম যেদিন হরিদা, আমার কাজের লোক, আমার হাতে একটা চিঠি দিল, তাতে লেখা, আমি আমার মানবকে হারিয়ে ফেলেছি, আজকের মানবকে আমি চিনি না, তাই চললাম।

হরিদাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম।

—ইতি মিত্রা!

ইঙ্কুলে খোঁজ নিয়ে জানলাম চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। এরপর থেকে আমি একা, প্রতিমুহূর্তে মিত্রার অভাব বোধ করি, জানি ও মামাবাড়িতেই আছে কিন্তু সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না, কারণ সত্যিই আমি আদর্শ বিচ্যুত হয়েছি, আমি কোন এক দলের হাতের পুতুল হয়ে গেছি। ওরা যা চায় আমি তাই করি, ওরা যা বলে তাই আমি বলি। ওখান থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছেটা এখনো আমার লোভকে জয় করতে পারেনি। এই হল আমার গল্প। এবার তোমার কথা বল।

বললাম — আমার আর গল্প কি? আর পাঁচটা সাধারণ লোকের মত, কবেই সাহিত্যটাহিত্য জলাঞ্জলি দিয়ে মন দিয়ে চাকরী করছি আর সংসার করছি। অনেক বেলা হলো এবার উঠি। মানবদা বললেন — থেয়ে যাও। বললাম — না, আমিও আমার মানবদাকে যেদিন ফিরে পাব সেদিন খাব, মিত্রাবৌদির সঙ্গে আলাপ হয়নি, দেখি নি, দূর থেকেই ওনাকে আমার প্রণাম। — এই বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

৫

মানবদা আমার গমনপথের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আসতে আসতে ভাবছিলাম — একেই কি বলে পরিবর্তন?

## বৃষ্টি-বৃষ্টি

### রমা জোয়ারদার

ছুটির দিন। সকাল বেলা চোখ খুলে দেখি আকাশ অন্ধকার। বিরবিরির করে বৃষ্টি হচ্ছে। মনটা একেবারে খুশ হয়ে গেল! বৃষ্টি আমার বড় ভাল লাগে – সে যেমনই বৃষ্টি হোক না কেন! সাতদিন ধরে হয়ে চলা ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি, আকাশ ফুটো করা মুষলধারে বৃষ্টি, প্রচন্ড গরমের পর চড়বড়ে শিলা বৃষ্টি – আমার সব ভালো লাগে!

চায়ের কাপটা হাতে নিতেই অভীক বলল – ‘আজকের দিনটা খিচুড়ি খাওয়ার জন্য একেবারে আইডিয়াল। সঙ্গে ঝুরো ঝুরো আলুভাজা, বেগুনী আর ইলিশমাছ ভাজা!’

‘সারাঙ্কণ শুধু খাওয়ার চিন্তা। আর কিছু নেই নাকি?’

‘খাওয়াটাই তো আসল। খাওয়ার জন্যই তো সব কিছু।’

আমি উন্নত না দিয়ে একবার মিউজিক সিস্টেমটার দিকে তাকালাম। আজ দু-মাস হল ওটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। খুঁজে বার করলাম আমার ছোট পুরোনো ক্যাসেট প্লেয়ারটা, যেটা এক বন্ধু দিয়েছিল অনেক কাল আগে। আশ্চর্যের কথা, ওটা এখনও হারায় নি এবং এখনও চলে! নতুন ব্যাটারী ভরতেই ক্যাসেট বেজে উঠল, ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে ...’

দরজার ওপারে বৃষ্টির ঝালরের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, ঘন সবুজ কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো তার লাল টকটকে ফুলগুলোকে মাথায় নিয়ে অল্প অল্প দুলছে। গাছের আড়ালে ফাঁকা পার্কে দুটো গরু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বেকার ভিজে যাচ্ছে। কে জানে, ওদেরও হয়ত আমারই মত বৃষ্টিতে ভিজতে ভাল লাগে! হঠাৎ মনে হল, গরুদের কি বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি হয়? অথবা জ্বর, গলা ব্যথা? ঘোড়ার ডাক্তার বা গোয়ালারা কি এর জবাব দিতে পারবে? অনেক বছর আগে যখন আমি বা আমরা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতাম (ছাতা মাথায় দিয়ে অথবা না দিয়ে), তখন আমার সর্দি, জ্বর, গলা ব্যথা – কিছু হত না। আর হলেও কিছু এসে যেত না। সেই সময় বর্ষার দিনে আমি স্কুল-কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতাম বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, জলের মধ্য দিয়ে ছপাণ, ছপাণ করতে করতে। সেটা ছিল পশ্চিমবাংলার বৃষ্টি! একদিন কলেজ ছুটির পর বেরিয়ে দেখলাম রাস্তায় হাঁটু জল। বাস, ট্রাম বন্ধ; বিরবিরির বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। রাস্তার জল মনে হল আরও বাড়ছে। উপায় কিছু ছিলনা। তাই বন্ধুরা হাত ধরাধরি করে চেন বানিয়ে জলে নেমে পড়লাম। বেশীর ভাগই সাঁতার জানিনা, জলে ভয়, তবু মনে রোমাঞ্চ। ভিজে কাপড়, ভিজে চুল, জল ঠেলে ঠেলে গর্ত, ম্যান হোল সামলে, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি – ভাবখানা যেন কোন দুর্গম অভিযানে চলেছি!

মনটা কোথায় চলে গিয়েছিল, ফিরে এলাম অভীকের ডাকে – ‘এক কাপ চা দেবে নাকি?’ আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ব্যালকনিতে। ছাতিম পাতার আড়াল থেকে একটা ছোট পাথী উঁকি মেরে বলল – ‘তুমি বৃষ্টি দেখছ? আমিও বৃষ্টি দেখছি।’ বৃষ্টি কিন্তু কিছুই দেখছে না। ঝরঝর করে ঝরে চলেছে মাটির উপর। আমার মনে হল যেন বহুদিন পরে দূর বিদেশ থেকে ছেলে ফিরেছে মায়ের কাছে! মা বসুমতী বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরছে বুকে। সন্তানকে কাছে পেয়ে তার রুক্ষ উদাস চেহারা স্লিপ মনোরম হয়ে উঠেছে। কদিন আগের শুকনো মাঠে এখন জমা জলের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ আগাছা। হোক আগাছা, তবু তো সবুজ – শিশুর উষ্ণ মুঠির মতো এক টুকরো প্রাণের আশ্বাস – সেই তো জীবনের সম্পদ!

ছাতা মাথায় ঝুঁব চৌধুরী আসছিলেন ব্যাগ হাতে নিয়ে। কোন দরকার ছিলনা, তবুও জিজ্ঞাসা করলাম – ‘এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় গিয়েছিলেন?’

ঝুঁব চৌধুরী ছাতাটা পিছনে হেলিয়ে মাথা তুললেন। বাতাসে ছাতার একটু উড়ি উড়ি ভাব! সেটাকে শক্ত হাতে ধরে তিনি উত্তর দিলেন – ‘বাজার থেকে দুধ, ডিম এসব আনতে গিয়েছিলাম।’

কথাটা শুনেই এতক্ষণ খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকা ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি উঠে এলেন এবং সহাস্যে ডাক দিলেন – ‘আরে ঝুঁব, চলে এসো! বৃষ্টির সকালে গরম গরম চা হয়ে যাক।’ অগত্যা, বৃষ্টির শোভা দেখা বন্ধ রেখে রান্নাঘরে গেলাম। ঝুঁব চৌধুরী ঝাড়া হাত-পা একলা মানুষ - নিজে নিজেই রাঁধেন, বাড়েন, খান-দান আর মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান। ওনাকে আমার খুব হিংসে হয়! কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না? তাই হাসি মুখে ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে দিয়ে বলি – ‘আজকে খিচুড়ি রান্না করব। দুপুরের খাওয়াটা আজকে আপনি আমাদের সাথে খাবেন, হ্যাঁ?’

গরম চায়ে আরাম করে একটা চুমুক দিয়ে তিনি বললেন – ‘প্রস্তাবটা খুবই লোভনীয়। কিন্তু অলরেডি অন্য একটা কমিটমেন্ট আছে – চিন্তারঞ্জন পার্কে যেতে হবে।’

আলুভাজা, পেঁয়াজি ইত্যাদি সহযোগে দুপুরের খিচুড়িটা ভালই জমেছিল। খেয়ে উঠেই অভীক বলল – ‘খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গেল।’

‘বেশী খেলে কেন? আমি তো তোমায় জোর করি নি।’

‘কি করব? কতদিন বাদে এতো ভাল ভাল খাবার! ভাজা-ভুজি বানানো তো তুমি বন্ধই করে দিয়েছ! দাও দেখি দুটো ডাইজিন! ’

বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলেও ভেজা ভাবটা রয়েই গেছে। গাছ ভেজা, মাটি ভেজা, বাড়িগুলো ভেজা, বারান্দায় মেলে দেওয়া কাপড়গুলোও ভেজা! জলের ফেঁটা মাখা গাড়ির দরজা খুলে পাশের ফ্লাটের রীনা আর শুভ ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছিল। গাড়িতে উঠতে গিয়ে পায়ের সামনে একটা কেঁচো দেখে ওদের বার-তের বছরের মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠে তিড়িং করে একটা লাফ দিল। জানলায় দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্যটা দেখে আমার ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে খুব হাসি পেল। অভীক বিছানায় শুয়েই মাথা ঘুড়িয়ে আমার দিকে তাকাল – ‘একা একা হাসছ কেন?’

‘পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল! ’

অনেক বছর আগেকার কথা। তখন আমরা আসানসোলে থাকতাম। শহরটা তখন অনেক খোলামেলা ছিল। আমাদের বাড়িটা ছিলো বেশ খানিকটা জমির উপরে ছড়ানো, ছিটানো। একান্নবর্তী পরিবারে এমনিতেই অনেক লোক। তা ছাড়াও আত্মীয়স্বজনের আসা যাওয়া লেগেই থাকত। সেবার ভরা বর্ষায় আমাদের বাড়ির উঠানে পায়ের পাতা ডোবা জল জমে গিয়েছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যে কি ভাবে কে জানে একটা সাপ বারান্দায় উঠে এসেছিল। আর পড়বি তো পর আমার মামাতো বোন টিনার একেবারে পায়ের সামনে! বেশ সুন্দর দেখতে একটা লিকলিকে সাপ – দেখে টিনা একটা পরিত্রাহি চিংকার করে বিশাল এক লংজাম্প দিয়ে একেবারে আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। টিনা বালিগঞ্জের মেয়ে, ডায়োসেসন-এ ক্লাস নাইনের ছাত্রী – ববছাঁট চুল, সব সময় টিপ্টেপ স্কট-ব্লাউজ পরে থাকে! সে আগে বোধ হয় এত কাছ থেকে সাপ দেখেনি। আমার জ্যাঠতুতো ভাই সন্ত তখন সবে কলেজে ঢুকেছে। যদিও বিশেষ কথা-বার্তা বলেনা, তবুও প্রায়ই টিনার আশে-পাশে ওকে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। চিংকার শুনে সন্ত দৌড়ে এল। সবজেটে হলুদ রঙের হাত দেড়েক লম্বা সাপটা তখন এঁকেবেঁকে বারান্দা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। দেয়ালের কোণে দাঁড়ি করিয়ে রাখা ঝুলঝাড়াটা বাগিয়ে নিয়ে সন্ত দুই-পা এগিয়ে, এক-পা পিছিয়ে সাপটাকে তাড়া করতে লাগল। হরিদা সাপ মারতে খুব ওস্তাদ; কিন্তু পালকি পড়ুন ও পড়ুন [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

হরিদা তখন কোথায়, কে জানে! ডেকে ডেকেও তার সাড়া পাওয়া গেল না। বোধহয় জ্যোঠামশাই-এর জন্য সিগারেট আনতে গেছে!

বারান্দার শেষ প্রান্তে দিদিমণির পূজোর ঘর। সাপটা বারান্দা পেরিয়ে পূজোর ঘরে ঢুকে গেল। পিছন পিছন ঝুলঝাড়া হাতে সন্ত। আমরা সবাই উত্তেজিত! সাপ ঘরে ঢুকেছে – পূজোর ঘরে সাপ – দিদিমণি রয়েছেন সেখানে! আমরা উদ্বেগে নানা রকম শব্দ, চেঁচামেচি করছি! দিদিমণি সাপটাকে দেখলেন, তার পর শান্তভাবে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন – ‘ঝুলঝাড়া দিয়ে সাপ মারা যায় না, ওটা রেখে দে। একটা হেলে সাপ দেখে কী কান্দ করছিস তোরা!’

ইতিমধ্যে হরিদাও এসে গেছে, হাতে একটা শক্ত লাঠি। দিদিমণি এবার উল্টোদিকের দরজাটা দেখিয়ে হরিদাকে বললেন – ‘সাপটা ওইখানে গিয়ে লুকিয়েছে। মারবার দরকার নেই – ওটা একটা হেলে সাপ, আমি দেখে নিয়েছি। তুই উঠোনের দিকের ওই দরজাটা খুলে সাপটাকে বার করে দে।’

বৃষ্টি শেষের শেষ বেলাকার আলো গায়ে মেখে সাপটা উঠানের কোণে হারিয়ে গেল। সাপটা বেরিয়ে গেল; কিন্তু আমাদের সবারই তখন মাটিতে হাঁটাহাঁটি করতে ভয় হচ্ছিল। খালি মনে হচ্ছিল, এই বুঝি একটা সাপ এল। চিনা তো সেই বিকাল থেকে পুরো রাত্রিটা একটানা খাটের উপরেই বসে রাইল। পূজোর শেষে দিদিমণি এসে তাঁর বড় খাটটায় বসলেন – আর তাঁকে ঘিরে আমরা সবাই! তখন আবার বৃষ্টি নেমেছে। কলার পাতায় জলের আওয়াজ। ব্যাঙ ডাকছিল গ্যাঙের গ্যাঙ। জানালা দিয়ে জলো হাওয়া ঢুকছিল, আর দেখা যাচ্ছিল বিদ্যুতের চমক।

সেই রোগা-পাতলা চিনা এখন মোটা-সোটা গৃহিণী, দুই ছেলের মা। সন্ত জার্মানীতে মেমসাহেব বউ নিয়ে সুখে ঘর সংসার করছে। অনেক বছর হল দিদিমণি উপরে চলে গেছেন, হরিদাও আর নেই। আমাদের সেই বাড়িটাও আর নেই – ওখানে এখন এক মন্ত্র বড় ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে। এমন কি শহরটাও আর আগের মতো নেই। দিনগুলো পালটে গেছে, আমিও পালটে গেছি। কিন্তু আকাশটা ঠিক তেমনই আছে, মেঘগুলো সব তেমনি আছে। সেদিনের মত আজও মেঘ ডাকে গুড়গুড়, গুড়গুড়, বৃষ্টি নামে ঝরবার, ঝিরবির। গাছের পাতা থেকে আজও জল পড়ে টিপটিপ, টুপটাপ। আর সূতির পাতায় ছবিগুলো ফিরে ফিরে আসে বার বার।

## স্কুলিং

### সঞ্চিতা চৌধুরী

বর্ষায় জাটিঙ্গা নদীতে দুই কুল ছাপিয়ে বন্যা আসে। শীতকালে থাকে হাঁটুজল। হেঁটেই নদী পারাপার করা যায়। জাটিঙ্গা নদীর উৎস উত্তর কাছাড়ের পাহাড়। খরচ্ছোত্তা পাহাড়ি নদী জাটিঙ্গার জল স্বচ্ছ, শীতকালে যখন জল কম থাকে মাছের চলাচল চোখে পড়ে। বর্ষায় এই ছেট নদীর যে কি ভয়ানক রূপ হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না, দুর্দান্ত গর্জন সহ নদীর স্রোত প্রবাহিত হয়, পাড় ভাঙিয়ে দিয়ে। বন্যার পরে জল সরে গেলে চাষ হয় সজির। নদীর অন্য পাড়ে ঘন জঙ্গল আর এই পাড়ে সবুজ, ছবির মতো ছেট যে গ্রাম, সেখানে থাকে ধৃতিসুন্দর, মা, বাবা, দাদা সবাইকে নিয়ে। দাদা আর ধৃতিসুন্দর দুজনে গ্রামের স্কুলে পড়ে। ধৃতি পড়ে ক্লাস এইটে আর দাদা ক্লাস টেনে। গ্রামের স্কুল তো আর বাড়ির খুব কাছে হয় না, অনেক হেঁটে স্কুলে যেতে হয় ওদের। স্কুল থেকে ফিরে জাটিঙ্গার তীরের মাঠে ফুটবল খেলে, খেলা শেষে পড়স্ত বিকেলে মাঠে চরতে থাকা নিজেদের গোরু গুলোকে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ছুটির দিনে গ্রামের বন্ধুরা সবাই মিলে জাটিঙ্গার জলে গা ভাসায়, নদী পারাপার করে সাঁতার কেটে। বিকেলে কখনও বা ঘুড়ি ওড়ায়, কখনও চাষের কাজে বাবাকে সাহায্য করে। সন্ধ্যবেলায় হারিকেনের আলোতে পড়তে বসে, সারাদিনের ক্লাস্তিতে খুব বেশি পড়ার আগেই ঘুমে চুলতে শুরু করে দুই ভাই। ধৃতির যেন একটু বেশি ঘুম পায়। ঘুমে চুলতে চুলতে দুই ভাই অপেক্ষা করে কখন খাবার ডাক আসবে, মা'য়ের উন্ননের পোড়া কাঠের গন্ধে এবং খাবারের মিশ্র গন্ধে ওদের খিদে চাগাড় দেয়।

সভ্যতার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা ধৃতিদের গ্রামে আসে নি, কিন্তু তাও ওদের জীবন নির্বিঘ্নে, শাস্ত গতিতে চলে। ধৃতিদের ঘরে কোনদিন খাবারের অভাব হয় নি, কারণ ধৃতিদের যত জমি আছে তাতে যা চাষ হয় তা দিয়ে ওদের সারা বছর ভাল করে চলে যায়। কারোর কোন অনুগ্রহের দরকার পড়ে নি কখনও।

ধৃতির বাবার খুব স্বপ্ন যে ধৃতিরা দুই ভাই শহরে গিয়ে বড় চাকরি করে, নিজে যা করতে পারেন নি তার স্বপ্ন দেখেন দুই ভাইয়ের মাধ্যমে, তাই উনি দুই ভাইকে যথাসন্তোষ প্রেরণা দিয়ে চলেন। অবশ্য ধৃতির পড়াশোনা করতে একদম ভাল লাগে না, ভাল লাগে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে, নদীতে সাঁতার কাটতে, জাটিঙ্গাতে জেলেবন্ধুদের সঙ্গে জাল ফেলে মাছ ধরতে, গরু চরাতে, মাঠে চাষের কাজ করতে, নদীর তীরে ঘুড়ি ওড়াতে, ‘ভোকাট্টা’ করে চিংকার করে ঘুড়ির পেছনে দৌড়তে। তবে, দাদা কিন্তু পড়াশোনায় বেশ ভাল, মনোযোগও আছে। ধৃতির স্কুলে যেতে একদম ভাল লাগে না, শুধু দাদাকে সঙ্গ দিতে ধৃতি স্কুলে যায়, দাদাকে খুব ভালবাসে ধৃতি।

দাদা এবার খুব ভাবে পড়ছে, এবার দাদার মাধ্যমিক পরীক্ষা। অনেক রাত জেগে হারিকেন জালিয়ে দাদা পড়ছে। ধৃতি জানে দাদা খুব ভাল রেজাল্ট করবে। বাবার স্বপ্নপূরণ দাদাই করবে – ধৃতির বিশ্বাস। ধৃতি তার জেলেবন্ধুদের বলে দিয়েছে প্রতিদিন যাতে ওরা ধৃতিদের বাড়িতে মাছ দিয়ে যায়, ধৃতি শুনেছে মাছ খেলে বুদ্ধি বাড়ে, সূতিশক্তি দৃঢ় হয়।

সেদিন ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিন, বিকেলে দাদা ফিরল হাসিমুখে। বাবা খুব খুশি, ছেলে বড় হয়ে গেল – ভেবেই বাবার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

রাতের খাবারের পর দাওয়ায় বসে বাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন – “বাবা, এবার তুম কি করবে, কি পড়বে?” দাদা হাসিমুখে উত্তর দিল – “শহরে গিয়ে সায়েন্স নিয়ে পড়ব।” বাবা জানেন না সায়েন্স কি, বাবা পালকি পড়ুন ও পড়ান [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

তো কোনদিন স্কুলের চৌকাঠ মাড়ান নি, তবে ছেলের উত্তর শুনে গর্ব সহকারে ‘হ্র’ বলে মাথা নাড়লেন। আর পরম তৃষ্ণি ভরে বিড়িতে জোরে টান দিলেন। অঙ্ককারে বিড়ির আগুন জ্বলে উঠল লাল হয়ে, আবার মিহয়ে গেল। ধূতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওই হঠাতে জ্বলে ওঠা বিড়ির লাল আগুনটা।

এখানে রাত নিকষ কালো, ধূতিরা এবং গ্রামের সবাই খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ বিঁঁচি পোকার একটীনা ডাক শুনতে পুরো গ্রামটি গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়, শুধু আকাশের নক্ষত্রে আর জোনাকিরা জেগে পাহারা দিতে থাকে গ্রামটিকে। গভীর রাতে কখনও বা জাটিঙ্গা নদীর ও পাড়ের জঙ্গল থেকে কিছু শেয়াল-পরিবারের দাম্পত্য কোলাহল ধূতিরা শুনতে পায় ঘুমের ঘোরে।

এক গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে ধূতিরা গ্রামের সীমান্ত থেকে অনেক মানুষের চীৎকার শুনতে পেল, মনে হল যেন অনেকে এক সঙ্গে মিলে কাঁদছে, কিছু মহিলার কান্নার তীক্ষ্ণ আওয়াজে ধূতিরা জেগে উঠল। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না কি কারণে এই আওয়াজ। মা তাড়াতাড়ি উঠে কমিয়ে রাখা হারিকেনটা উক্ষে দিলেন আর বাবাকে বললেন – “কি তুমি শুনতে পেলে কান্নার শব্দ?”

“হ্যাঁ” – বাবা জেগে গেছেন। মশারির ভেতর থেকে উত্তর দিলেন।

ধূতি আর দাদাও জেগে গেছে ওই চীৎকারে, কারণ এত গভীর রাতে এমন অস্বাভাবিক চীৎকার আগে কখনো হয় নি ওদের গ্রামে। দুই ভাই চোখাচোখি করে, দুজনের চোখেই প্রশ্ন, অবাক ভাব।

বাবা মশারি থেকে বেরিয়ে এলেন, বললেন – “কি হতে পারে দেখতে হচ্ছে।” বাবা বাইরে গিয়ে ওই আওয়াজের উৎস জানার জন্য গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিলেন এবং দরজার ছিটকিনিতে হাত রাখলেন, ঠিক তক্ষণি দরজাতে কড়া নাড়ার জোরে জোরে শব্দ হল, মনে হল যেন দরজাটা ভেঙ্গে ফেলবে। বাবা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। দরজা খোলামাত্র চারজন লোক হৃড়মুড় করে দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। ওদের সবার মুখগুলো কালো কাপড়ে ঢাকা, শুধু চোখগুলো দেখা যাচ্ছিল, পরনে জলপাই রঙের পোষাক, হাতে বন্দুক। ধূতি ভাল করে দেখল, হ্যাঁ বন্দুকই তো, ও ছবিতে দেখেছে।

ওরা ঢুকেই বলল – “ঘরে কে কে আছে বেরিয়ে এসো।”

ধূতিরা চারজন সামনেই ছিল। বাবা বললেন – “আর কেউ নেই, আমরা চারজন।”

লোকগুলো ধূতিদের কে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল, আর দাদাকে বন্দুকের নল দিয়ে খোঁচা মেরে বলল – “এই তুই এইদিকে সরে আয়।” দাদা একটু সরে গেল ওদের দিকে। লোকগুলো পরম্পরার দিকে চোখাচোখি করে ইশারায় কি যেন উঙ্গিত করল কে জানে, ধূতিরা বুঝতে পারল না।

ওদের মধ্যে একজন, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দাদার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। দাদা প্রাণপণে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু ওদের পাশবিক শক্তির কাছে হার মানল, দাদা চীৎকার করে উঠল – “ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো। মা, বাবা আমাকে বাঁচাও।” ওদের মধ্যে একজন দাদাকে জোরে ধমক দিল – “চুপ, আর একবার চেঁচালে মারব।”

মা চীৎকার করে উঠলেন – “কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমার ছেলেকে? ও কি করেছে? কে আছ, বাঁচাও।” বাবা ওদের পিছনে ছুটলেন দাদাকে ছাড়ানোর বৃথা চেষ্টায়। ওদের মধ্যে একজন বাবার দিকে বন্দুক তাক করে বলল – “আর এক পা এগোলে আমি গুলি ছুড়তে বাধ্য হবো।” বাবা দাঁড়িয়ে গেলেন। ঐ লোকগুলি একবারও পিছন ফিরে দেখল না, দাদাকে টানতে টানতে নিয়ে, অঙ্ককারে মিলিয়ে যেতে যেতে শূন্যে গুলি ছুঁড়ল, যেন জানিয়ে দিল ওরা কতখানি ভয়ানক, বা ওরা সত্যিকারের বন্দুক চালাতে পারে। ধূতি কাঁদতে লাগল, মা-ও চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন, বাবা হতবাক হয়ে বাড়ীর দাওয়াতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন – কেউই

কিছুই বুঝতে পারছিল না। কোথায় নিয়ে গেল দাদাকে? ধৃতি বুঝতে পারল গ্রামের সীমান্ত থেকে যে কান্নার আওয়াজ ওরা শুনতে পেয়েছিল তার কারণ, এখন ওদের হাহাকারের সঙ্গে মায়ের কান্নার আওয়াজ মিলে গেছে। এই শান্ত গ্রামীণ জীবনে এ কি অশান্তি! এমন ঘটনা আগে কখনও ধৃতিদের গ্রামে হয় নি। কেউ তার কোন ব্যাখ্যা জানে না।

সকাল হল। এক বিষন্ন, শোকগ্রস্ত, নিষ্ঠুর সকাল, বাড়ীতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, দৈনন্দিন জীবন যেন থমকে গেছে, গোরু গোয়াল থেকে এখনও ছাড়া হয় নি, বাবা মাঠে গেলেন না। ধৃতি যেন একরাতেই অনেক বড় হয়ে গেছে। ও গোরঞ্জলোকে জাবনা দিয়ে মাঠে ছেড়ে এল। ভাবল কোথায় গিয়ে দাদাকে খুঁজবে? ওরা কারা? কেন বন্দুক নিয়ে এসেছিল? শত সহস্র প্রশ্ন ধৃতিকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। গোরু মাঠে ছেড়ে যখন ফিরে আসছিল, গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল। ওদের কাছে জানতে পারল ওরা যারা এসেছিল-উগ্রবাদী। সন্ত্রাস তৈরী করাই ওদের কাজ। গ্রামের মানুষেরা বলাবলি করছে এবার নিশ্চয় সবার কাছ থেকে মুক্তিপণ চাইবে, কিন্তু এই গ্রামের মানুষের কাছে তো তেমন টাকাপয়সা নেই, ওরা কিই বা দিতে পারবে।

ঘরে ফিরে ধৃতি দেখল বাবা বাইরে বেরোনোর জন্য তৈরী হচ্ছেন, ও জিজ্ঞাসা করল — “কোথায় যাচ্ছ বাবা?”

বাবা ধরা গলায় উত্তর দিলেন — “যাই থানাতে খবর দিয়ে আসি, দেখি ওরা কি বলে।”

ধৃতিও বাবার সঙ্গে যেতে চাইল। থানায় আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হল যাদের বাড়ি থেকেও ওদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গেছে রাতের সন্ত্রাসবাদীরা।

থানার বড়বাবু বললেন — “দেখা যাক কতটুকু কি করা যায়। তবে কি জানেন, ওদের খোঁজা আমাদের ধরাছেঁয়ার বাইরে, এটা মিলিটারিদের কাজ, আমাদের নয়। তবে আমরা যাব গ্রামে তদন্ত করতে।”

গ্রামে পুলিশ এলো। যথারীতি সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করল এবং চলে গেল।

দিন যায়, মাস যায়, দাদার কোন খোঁজ নেই। ইতিমধ্যে দাদার রেজাল্ট বেরিয়েছে — ফার্স্ট ডিভিশন। মা প্রতিদিন কাঁদেন, যেদিন ধৃতি স্কুল থেকে ফিরে দাদার রেজাল্ট জানাল, মা হাউ হাউ করে কেঁদেছেন। বাবা দাওয়ায় বসে মুখ নিচু করে নীরবে চোখের জল ফেলেন। কোথায় হাওয়া হয়ে গেল ছেলেটা।

একদিন গ্রামের চোরাকাঠের ব্যবসায়ী কামাল খবর আনল — যে ছেলেরা সেই রাতে নিখোঁজ হয়েছিল সবাই উগ্রবাদীতে পরিণত হয়েছে। গভীর জঙ্গলে রাইফেল চালানো শিখেছে। কামাল গভীর জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিল, কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছে। বাড়ীতে এসে বলে গেল — ধৃতির দাদার ফিরে আসার আশা যেন সবাই ছেড়ে দেয়। ওরা আর কেউ ফিরবে না।

বছর শেষ হতে চলল। ধীরে ধীরে গ্রামের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, সেই রাতের ঘটনার ছাপ মানুষের মন থেকে মুছে গেছে। শূন্যতা শূন্যতা ওদের ঘরে যাদের ছেলেরা নিরংদেশ। মা বাবা দাদার পথ চেয়ে বসে আছেন।

কুয়াশা ঘেরা শীতের সকালে ধৃতির দাদার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল — জাটিসার তীরে জঙ্গলের সীমানায়, বুকের বাঁদিকে বুলেটের চিহ্ন।

গ্রামের শান্ত জীবনে আবার কিছুদিনের জন্য আলোড়ন, কানাকাটি, কানাঘুসো, ফিসফাস- আবার সব কিছু কিছুদিনের মধ্যে চুপচাপ।

ধৃতির বুকে তুষের আগুন জ্বলে ধিকিধিকি, তাবে যদি দাদার হত্যার বদলা নিতে পারত, ওদের সঙ্গে মিলে গিয়ে — কিন্তু দাদার হত্যাকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করতেও ঘৃণা হয় ধৃতির। মাঝে মাঝে কান্না

পায়, কখনও বা রাগ হয় অনেক কিছুর উপরে, নিজের উপরে, ভাবে কেন সেদিন ও দাদাকে বাঁচানোর জন্যে ওদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে নি, কেন ওর এই অক্ষমতা, নাকি বন্দুক দেখে ত্য পেয়েছিল, বন্দুকের বুবি এত ক্ষমতা? যার হাতে বন্দুক থাকবে তার কাছে বুবি সর্বশক্তি? তাহলে জঙ্গলের যত বাঁদর আছে তাদের হাতে যদি বন্দুক দেয়া হয় তাহলে সমস্ত মানুষ ওই বাঁদরদের অধীনে হবে? কিন্তু বাঁদরদের কি ওই বুদ্ধিটুকু আছে যে সঠিক ভাবে ব্যাবহার না করলে ওই বন্দুকই ওদের বিনাশ ঢেকে আনবে? যে শক্তি লাগতে পারত সংগঠনের কাজে, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে আজ তা কোন বৃথা কাজে ব্যয় হচ্ছে। শক্তির কি করণ, মলিন অপচয়। জাটিঙ্গার পাড়ে বসে ভাবতে ভাবতে সঙ্গে হয়ে আসে, নদীর বুক ছুঁয়ে ঠান্ডা হাওয়া ধূতির মুখে লাগে, ধূতির কাছে তা অনেকটা দীর্ঘশ্বাসের মতো লাগে, মনে হয় দাদা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ধূতির চোখ ভরে জল আসে।

ধূতির দাদার সঙ্গে সেই রাতে যে কয়জনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে দু'জন ফিরে এসেছে। ওরা এখন ওই উগ্রবাদী দলের সক্রিয় সদস্য, ওরা নাকি ছুটি কাটাতে এসেছে, পুলিশ এদের কিছুই করতে পারবে না, পুলিশের কাছে খবর পৌঁছোতে পৌঁছোতে ওরা পালিয়ে যাবে, তাছাড়া গ্রামের ছেলে ফিরেছে, গ্রামবাসীরা খুশি। ওদের উপরওয়ালারা বলে পাঠিয়েছে, গ্রামে গিয়ে যদি আরও কিছু নতুন ছেলেমেয়েদের নিজেদের দলে আনতে পারে, ওদের দলে আরও সদস্য চাই, অনেকে গভীর জঙ্গলে অসুস্থ হয়ে মারা যায়, তাছাড়া পুলিশ বা মিলিটারিদের সঙ্গে এনকাউন্টার তো আছেই।

ওদের মুখে শোনা গেল ধূতির দাদার কথা – ও নাকি পালানোর চেষ্টা করেছিল, তাছাড়া, ও জঙ্গলে গিয়ে অসুস্থ হয়ে যায়। অসুস্থতা এবং পালানোর চেষ্টা দুইয়ে মিলে উগ্রবাদীরা দাদাকে গুলি করতে বাধ্য হয়। আর্চর্য, ঐ দুই নব্য উগ্রবাদী সদস্য ধূতির দাদার মৃত্যু নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় বরং ধূতির দাদার বন্দুক ধরার অকৃতকার্যতাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, উপহাস করছে, বলছে, ‘ভিতু ছেলে, বন্দুক ধরতে হাত কাঁপে’ ইত্যাদি। বোৰা গেল ঐ দুই নব্য সদস্যের কেমন মগজ ধোলাই হয়েছে, নিজেদের ওরা কেমন মহাশক্তিমান বলে ভাবছে। সব শুনে ধূতির শরীর রাগে গুলিয়ে উঠল, কাঁপতে লাগল রাগে, কান্না পেল – দু'চোখ দিয়ে গরম অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, মনে হচ্ছিল যেন অশ্রু নয় আগ্রেঞ্জিলির উত্তপ্ত লাভা, শত সহস্র বছরের আগুন যেন ধূতির বুকে।

ধূতি নতুন ক্লাসে উঠেছে, কোনো রকমে মাধ্যমিক পাশ করে ধূতি এখন ইলেভেনে। ধূতি এখন পাশের গ্রামে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে যায়, ওদের গ্রামে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল নেই। ধূতির ক্লাসে বসে সর্বদাই দাদার কথা মনে হয়।

ইতিহাস ক্লাসে ধূতির ঘুমটাই বেশি পছন্দ, সবচেয়ে পেছনের বেঞ্চে মাথা নিচু করে বসে ঘুম না হলে ধূতির যেন ইতিহাস পড়াই হয় না। তাছাড়া, ইতিহাসের টিচার নতুন এসেছেন – শতাব্দী ম্যাডাম। খুব ভালমানুষ, ওনার ক্লাসে কেউই পড়ায় মন দেয় না। সবাই নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে শতাব্দী ম্যাডামের ক্লাসে। শতাব্দী ম্যাডাম মুখে হাসি নিয়ে সাধ্যমত পড়িয়ে যান, কখনই যেন উনি রাগতে জানেন না, ক্লাসে এত গন্ডগোল হয়, ছেলেরা এত অমান্য করে অথচ উনি কাউকেই শাস্তি দেন না।

সেদিন ইতিহাস ক্লাস চলছে, চরম গন্ডগোলের মধ্যে হঠাৎ শতাব্দী ম্যাডামের একটা কথা ঘুমন্ত ধূতির কানে এসে আঘাত করল, ধূতি জেগে উঠে নড়েচড়ে বসল, ধমনীতে দ্রুত রক্ত চলাচল হতে শুরু হল, কথাটা ধূতির শাস্তি মনোজগত তোলপাড় করে দিল ‘যদি আগুন হতে না পার স্ফুলিঙ্গ হও, একটা স্ফুলিঙ্গ ঠিকঠাক জায়গাতে পড়লে দাবানল লাগাতে পারে।’

ধৃতি মনে করে উঠতে পারল না কোন চ্যাপ্টার পড়াতে গিয়ে শতাদী ম্যাডাম এই কথাটা বললেন কারণ ধৃতি আগের কথাও শোনে নি পরের কথাও শোনে নি। ধৃতির মনে এখন সর্বদাই এই কথাটা ঘুরছে। ইচ্ছে করছে স্ফুলিঙ্গ হয়ে গিয়ে দাদার হত্যাকারীদের ডেরায় গিয়ে দাবানল লাগিয়ে দেয়। কিন্তু কি ভাবে? ও অন্ত চালাতে পারে না, এমন কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি নেই, তাহলে কি ভাবে? ধৃতি মনে অস্তিত্ব বোধ করে, নিজেকে পাগল পাগল লাগে।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় স্কুলের অফিস ঘরের কাছে একটা বিজ্ঞাপনে ধৃতির চোখ আটকে গেল।

মিলিটারিতে চাকরির বিজ্ঞাপন – তিন কিলোমিটার দৌড়ের মাধ্যমে এবং একটা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে। যোগ্যতা – মাধ্যমিক। স্থান – পাশের গ্রামের মিলিটারি ক্যাম্প। দিন – সামনের মাসের রবিবার। সময় – সকাল আটটা। এছাড়াও আরও লম্বা ছিল লিস্ট, উচ্চতা, বুকের মাপ, চোখের দৃষ্টি আরো কত কি।

বিজ্ঞাপনটা ধৃতির বুকের স্তম্ভিত আগুনকে যেন উক্ষে দিল, স্ফুলিঙ্গ হওয়ার বাসনাতে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিল।

বিকেলে ধৃতি সাইকেলটা নিয়ে পাশের গ্রামের মিলিটারি ক্যাম্প দেখতে গেল, এই মিলিটারি ক্যাম্প কিছুদিন হল এখানে এসেছে, ধৃতি জানত না যে এ গ্রামে মিলিটারিদের এত বড় ক্যাম্প আছে। দূর থেকে ওদের কসরত দেখতে লাগল, মনে শহরণ খেলে গেল, ছন্দে ছন্দে মিলিটারিদের দৌড় ধৃতির মনে মাদল বাজাল, নিজেকে ওদের একজন কল্পনা করে রোমাঞ্চ হল। সেদিন ধৃতি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হল – যেমন করে হোক ওকে মিলিটারিদের একজন হতেই হবে, ওইখানেই হবে ধৃতির ক্ষমতার সঠিক প্রকাশ।

শুরু হয় ধৃতির অনুশীলন, প্রতিদিন ধৃতি ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগেই পোঁছে যায় জাতিসংঘের তীরের মাঠে, দৌড়ে চলে – দ্রুত, দ্রুততর, দ্রুততম গতিতে। ভোরের রক্তিম সূর্যের প্রথম আলো ধৃতির মুখে পড়ে। জেলেবন্ধুরা মাঝ নদী বরাবর ডিঙ্গি বেয়ে, জাল ফেলে মাছ ধরতে ধরতে ধৃতিকে দেখতে পেয়ে হাঁক পাড়ে, “হেঁইও, আরও জোরে।” ধৃতি দৌড়তে দৌড়তে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ে, দৌড়ের গতি বাড়িয়ে চলে, চোয়াল দৃঢ় হয় জেদে, প্রতিজ্ঞায়।

যে ধৃতি পড়াশোনা থেকে শতহস্ত দূরে থাকত আজ সেই ধৃতি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। শতাদী ম্যাডামের কাছে গিয়েছিল জানতে, মিলিটারিদের পরীক্ষাতে কি ধরণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, শতাদী ম্যাডাম সাধ্যমত বলে দিয়েছেন, কিছু বইও দিয়েছেন ধৃতিকে, বলেছেন, ‘এই বইগুলো পড়, কাজে দেবে।’ ধৃতি পড়ে, খুব মন দিয়ে পড়ে, ধৃতির পড়ায় মনোযোগ দেখে মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ধৃতি আশ্বস্ত হয়, ভাবে, আমাকে পারতেই হবে, এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেওয়া চলবে না। স্ফুলিঙ্গ হওয়ার তীব্র বাসনা ধৃতিকে গভীর রাতের স্বপ্নের ভেতরেও তাড়া করে, প্রতিজ্ঞাবন্ধ ধৃতি আরও কঠিন সাধনায় মগ্ন হয়।

দৌড়ের দিন ধৃতি পোঁছে যায় মিলিটারি ক্যাম্পে, সকাল আটটা, দৌড় হবে সূর্যকে সামনে রেখে – পশ্চিম থেকে পূর্বে। সকালের নরম সূর্যের মৃদু তেজে ধৃতি নিজের মধ্যে স্ফুলিঙ্গের উত্তাপ অনুভব করে, নিজেকে বলে, ‘স্ফুলিঙ্গ হতে হবে, স্ফুলিঙ্গ হতে হবে।’ নিজেকে দৌড়ের জন্যে প্রস্তুত করে।

অনেক প্রার্থী আশেপাশের দশ বারোটা গ্রাম থেকে জমায়েত হয়েছে, বেশ ভিড়, প্রার্থী নেবে মাত্র সেরা তিনি জনকে।

ধৃতি দৌড়ের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে দৌড়ের জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ায়। রিভলবারের গুলির আওয়াজে দৌড় শুরু হয়। ধৃতি দৌড়ে চলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে, পায়ে যেন হরিণের ক্ষিপ্তা, মনে প্রতিজ্ঞা, রাগ, আক্রেশ,

সব মিলিয়ে ধৃতি দৌড়ে চলে এক ঘোরের বশে। ধৃতির এই দৌড় যেন প্রথিবীর শেষ সীমানায় শেষ হবে। দৌড় শেষের ফিতে ধৃতি প্রথম স্পর্শ করল। কোন আনন্দ নয়, শুধু উত্তাপ অনুভব করল ধৃতি।

এবার দ্বিতীয় ধাপ, এবার পড়াশুনার বিষয় নিয়ে দুই ঘণ্টার পরীক্ষা প্রথম তিনজনের, বাকিদের ছুটি। এই পরীক্ষাতেও ধৃতি যথারীতি প্রথম।

ধৃতির জীবন এখন অন্য খাতে, অন্য ছন্দে বইবে। পেছনে পরে থাকবে জাটিঙ্গা, সবুজ গ্রাম, দুঃখী মা, ক্লান্ত বাবা।

ধৃতি এখন স্ফুলিঙ্গ, যেকোনো সময় দাবানল লাগাতে পারে শক্র ঘরে।

## তলাতল পাতাল খুঁজলে

### শাশ্বতী ভট্টাচার্য

কলকাতা শহরের বাস লরী ট্যাক্সির যান্ত্রিক আওয়াজ, আকাশ দেকে দেওয়া দূষণ-সহ অন্য সমস্ত বিলাস বৈভব যেইখানে আন্তে আন্তে ক্ষীণ হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সাম্রাজ্যে প্রবেশ করছে সেইখানে, শহর আর গ্রাম্য-জীবনের এক সন্ধিক্ষণে বান্তলায় মধুসূদনের পান-সিগারেটের একচালা দোকান, ‘মধুসূদনের পাত্রশালা’।

বড়ো হাইওয়ের আসপাশের ছোটখাটো অলিতে গলিতে রাতারাতি একটার পর একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স যেখানে গড়ে উঠছে, সেই কংক্রীটের মরুভূমিতে একটুকরো মরুদ্যান। কাজ করা কুলি-কামিনদের একটুখানি জিরোনোর জায়গা, একটুখানি সাদামাটা ঘরে রান্না করা খাবারের স্বাদ দেওয়ার জন্য মধুসূদনের পাত্রশালা।

যখন ওর বয়সী একদল কলেজযাত্রী ছেলে চায়ের অর্ডার দিয়ে কেন এক নতুন শিক্ষকের নামে আলোচনা করে, কিংবা কোনরকমে কাঁধের ব্যাগটা পাশের চেয়ারে রেখে তাড়াতাড়ি করে একটা ডিমভাজার ফরমাশ দিয়ে ব্যাগ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে, সেঁদা গন্ধ ভরা বইয়ের পাতায় ডুবে যায়, বছর পঁচিশের মধুসূদনের দীর্ঘ-নিশ্চাস পড়ে, নিঃশব্দে চা-ডিমভাজা বানাতে বানাতে ও ছোটবেলার কথা ভাবে।

কবে সেই কোন ছোটবেলায় একটা স্কুলে পড়ত তা এখন পূর্বজন্মের ঘটনা বলে মনে হয় ওর। ছোটবেলা বলতে সূতিতে বাবার সাথে দোকানের ফাইফরমাস, পাশের টিউবকল থেকে জল আনা। বাবা মারা যেতে দোকান তার বিধবা মায়ের হাতে, মনে পড়ে একটা ছোট পিঁড়িতে বসে একটা একটা করে পয়সা গোনা। আলু-কুমড়ো-পেঁয়াজ কাটায় মাকে সাহায্য করা। চেষ্ট করেও আর কিছুই মনে করতে পারে না মধুসূদন।

কবে যে হঠাত করে দোকানের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে উনিশ বছর বয়সে দোকানের মালিক হয়ে বসল মধুসূদন, তাও আর মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে বেশ কয়েক বছর হল দোকান বাড়িয়ে ও চাল, ডাল, আনাজপত্র, মনিহারি সরঞ্জাম রাখতে শুরু করেছে।

ততদিনে সদ্য গড়ে ওঠা কলকাতা মেট্রোপলিটান বাইপাসের পাশে ফুটপাতের ধারে একচালার ছোট দোকানের মালিকানার জীবনে অভ্যেস হয়ে গেছে মধুসূদনের।

কিন্তু তবু খেদটা রয়েই গিয়েছিল, অন্তত যত দিন না রফিক আহমেদ সাথে আলাপ হলো। মায়ের কাছ থেকে দোকানের দায়িত্ব নিয়ে তখন সবে রাঁধুনীর আসনে সামনের পিঁড়িতে বসা শুরু করেছে ও।

গত রাত্রের ভয়ানক বৃষ্টিতে ওর দোকানেও আধহাঁটু জল জমেছিল, তা সত্ত্বেও ঠিক সময়ে দোকান খুলেছিল। এই সকালবেলাটায় লোকজন চা পিপাসু হয়, দোকান খোলা না থাকলে খরিদ্দার হতাশ হবে, ওর একটা দায়িত্ব আছে।

একটু একটু করে সকাল হচ্ছে, একটা দুটো করে রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে, দূরে মন্দির থেকে সকালের আরতির গান ভেসে আসছে, টিংটিং করে ঘন্টা বাজিয়ে মানিক সবে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাগজ দিতে শুরু করেছে, উন্নে দুধের কড়াই বসিয়ে তার ওপর কড়া লক্ষ্য রেখে বসেছিল মধুসূদন। উপচে গিয়ে দুধ বাইরে পড়লে মিছিমিছি কতগুলো পয়সা নষ্ট।

ছোটখাটো দোহারা গঠন, ছোট একটা মুখের ওপর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝকঝকে চোখ, সরু কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালে বড়ো বড়ো চোখ, খুতনিতে অল্প সাদা দাঢ়ি, মাথায় একটা টুপি। রফিক আহমেদ

জুতো খুলে দোকানে ঢুকেছিলেন, ‘বাবাঃ, কাল রাত্রে যা বৃষ্টি গেল, ভাগিয়স তোর দোকানটা ছিল, হ্যাঁরে একটু চা বানা, তবে অমন করে দুধের কড়াই এর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকিস না, ওই দুধ কোনকালে ফুটবে না।’

‘হ্বঁ? তাই আবার হয় নাকি? বললেই হল?’ একটানা অনেকক্ষণ তাকিয়ে তখন ওর ঘাড় ব্যথা করছিল, না তাকিয়ে উভর দিয়েছিল মধুসূদন। উচ্চেস্বরে প্রতিবাদ করেছিল ‘না মাষ্টারমশাই, আপনি বললেই হবে?’

তেবেছিল, এই ধুলো কাদা ময়লা আৰুত শহরে, ধৰ্বধৰে সাদা পরিষ্কার ধূতি পায়জামা পরিহিত কলকাতার বাবু কি করে জানবে যে এক লহমার জন্য নজর অন্য দিকে ফেরালে, ব্যাস! আৱ দেখতে হবে না। খলবল করে ফুটে উঠে বুকের রঞ্জ জল করা পয়সায় কেনা দুধ ফুটে উঠবে, উনুনের গা বেয়ে উপচে পড়ে দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে!

কাজ হয়েছিল, রফিক আহমেদ বুঝিয়েছিলেন, ‘হ্যাঁরে, তবে কিনা আমি এই রকম একটা পরিস্থিতিৰ ওপৰে ইংৰাজীতে একটা প্ৰবাদ-বাক্যৰ কথা ভাৰছিলাম, প্ৰবাদটা হলো, তাকিয়ে থাকলে ডিম কোনদিন ফোটে না।’

ক্লাস ফাইভ শেষ না করা মধুসূদন কেন সেদিন রফিক আহমেদকে আচমকা মাষ্টারমশাই বলে ডেকেছিল মধুসূদন তা আজও বুঝে উঠতে পাৰেনি! বহু খৱিদৰ দেখেছে মধুসূদন, ওৱা আসে ওৱা যায়। পয়সা ফেলে খাবাৰ খায়। ছোট বাটিতে রাখা মৌরি মুখে ফেলে চেকুৰ তোলে। কিন্তু সেই সকালে রফিক আহমেদ সাহেবকে ওৱ দোকানে দেখে কেন হঠাৎ ওৱ বাবাৰ কথা, ছোটবেলার কথা মনে পড়েছিল, মধুসূদন জানে না। আজও নিৰ্ধাৰণ করে উঠতে পাৱে নি মধুসূদন।

অনেক কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছিলে সেদিন, মধুসূদনেৰ জ্ঞানেৰ পৰিধি আৱ শেখাৰ ইচ্ছা আহমেদ সাহেবকে বিস্মিত কৱেছিল। প্ৰথাগত বিদ্যা যে বিনয়ী হতে শেখায় না এ সত্যেৰ বহু প্ৰমাণ পেয়েছেন নিজেৰ জীবনে, শিক্ষা ব্যতিৱেকেও যে বিনয়ী বিনৰ্ম হওয়া যায় তাৱ উদাহৱণ দেখেছিলেন মধুসূদনেৰ ব্যবহাৱে।

‘স্যার, সারাজীবন কিছুই তো জানতে পাৱলাম না, আপনি আমাকে পড়াবেন স্যার?’

‘প্ৰথম কথা, স্যার বলে ডাকিস না, মাষ্টার-মশাইটা ঠিক আছে, দ্বিতীয়তঃ সত্যি সত্যি যদি পড়তে চাস অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টারে যাস না কেন, কত তো হয়েছে শুনি।’

‘পেট চালাতে হবে না? না স্যার! মানে মাষ্টার-মশাই। বাদ দিন, ছেড়ে দিন। ও হবে না... সময় নেই।’

‘না না, তা কেন? আমাৱ কাছে ছোটদেৱ রামাযণ মহাভাৱত আছে, তুই একটু একটু কৱে পড়া শুৱ কৱ, যেখানে আটকাবে আমি বুঝিয়ে দেব।’

‘মাষ্টারমশাই!’ মধুসূদন অবাক হয়েছিল ‘কিন্তু আপনি তো...!’

‘মুসলমান, হ্যাঁ, তাতে কি বাংলা পড়া আটকায়?’ হেসে ছিলেন রফিক আহমেদ, ‘শোন তাহলে, শুধু বাংলা কেন, আমি উৰ্দু আৱ সংস্কৃত ভাষাও জানি।’

সেই শুধু, এই দোকানটাকে কেন্দ্ৰ কৱে যেন দুই বিপৰীতেৰ সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই একটি অসম সখ্যতা গড়ে উঠেছিল প্ৰেসিডেন্সি কলেজেৰ অবসৱপ্ৰাপ্ত বাংলা প্ৰফেসৱ রফিক আহমেদেৱ সাথে একচালার দোকানেৰ মালিক মধুসূদনেৰ। প্ৰতিদিন সকালে দোকানে বসে একটি কাপ সহযোগে দুটি অ্যারারট বিস্কুট খেয়ে একটা বয়ঙ্ক শিশুকে পাটিগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, কাৰ্য পড়াতে না পাৱলে দিনেৰ আৱন্ত অনুভব কৱতে পাৱেন না আহমেদ সাহেব, মধুসূদনও জানে না সারাদিনে একশোৱাৱেৱ বেশি চা বানানো সত্ত্বেও ভোৱ ছটা বাজাৱ

আগেই তাড়াতাড়ি উঠে, চায়ের কাপ মেজে, উনুন ধরিয়ে বাবার বয়সী এই প্রৌঢ় প্রফেসরের জন্য চা বানানো এবং আলোচনার মধ্যে ও কি আনন্দ পায়।

সেইদিন সকালের রোদে আর নতুন দোকানে বসার অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু একটা ছিল, ছোটখাটো কথাবার্তার সূত্র ধরে যে পরিচিতি শুরু, গত এক বছরে সেখানে এখন গড়ে উঠেছে পরম্পর নির্ভরতার এক নির্মল সম্পর্ক। বাংলা অক্ষরজ্ঞান ছিল। সকাল ছটা থেকে সাতটা অবধি একটু পড়াশোনার করার সুযোগ পেয়েছে মধুসূদন।

বানতলায় ভোর হয়েছে, একটা দুটো কাক ডাকছে।

এই ছেট জায়গার আশে পাশে দেখতে দেখতে অনেক কিছু গড়ে উঠেছে, মন্দির, মসজিদ, চার্চ কিছুরই অভাব নেই! বৃন্দা মা ছেলেকে ডেকে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, মধুসূদন মাটির উনুনে আঁচ দিয়ে অপেক্ষা করে। সকালের আরতি প্রায় শেষ, এর পরে ভক্তিগীতি বাজতে থাকবে, তার কিছু পরে শুরু হবে আজান। ভীড় হবে, দোকানে লোকজনের আসা বাড়বে।

অথচ উনুনটা ভালো করে ধরে নি এখনও! আগুনটা আরো একটু বড়ে করার দরকার! একটুখানি বাতাস পেলেই কয়লা আর ঘুঁটের জ্বাল দিয়ে ধরানো উনুনটা হই-হই করে জ্বলে উঠবে, দু একটা স্ফুলিঙ্গ এদিক ওদিক ছড়াবে, অসংখ্য ঘন নীল রঙের ফণা, লালচে আগুনের গহ্বর থেকে থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে।

হোক না! জ্বলুক না কিছুক্ষণ নিজের মতো!

উনুনটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মধুসূদন অন্যমনস্ক হয়। এতখানি আলো, এতখানি তাপ, এতখানি আগুন সব কালো রঙের লোহার কড়াইয়ের নিচেই রয়ে যাবে।

শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য গাড় বেগুনি রঙের ফলা বেরোয়, সেই আগুনের তীরগুলোর কথা ভাবে, হলই বা কয়েক মুহূর্তের জন্য, একটু অন্যরকম তো!

এদিকে সময় তো চলে যাচ্ছে, ততক্ষণে দোকানটাকে সাজিয়ে ফেলা যাক। মধুসূদন উঠে পড়ে।

ধোঁয়ার আচ্ছাদনে আস্তে আস্তে ছেয়ে যাচ্ছে ছেট রান্না ঘরটা, একটু বাতাস দিতেই হবে। সকাল ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত জ্বলবে উনুন, একের পর এক খাবার রান্না হবে। দুধের কড়াই নামলে চাপবে ভাতের কড়াই, তারপর মাছের ঝোল, তিনটে সজি। দেওয়ালের গায়ে সিমেন্ট দিয়ে জমানো তিনটে কাঠের তাক, রান্না করার নানা সরঞ্জাম সাজানো। একটা হালকা তালপাতার পাখা ওর পিছনে রাখা থেকে, বাবার আমল থেকেই আছে।

সামনের জল চৌকিতে শয়ারত গণেশ প্রতিমার সামনে দুটি কৃত্রিম বেলফুলের ছেট ছেট মালা। একটু কাঠকয়লা পুড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে একটু ধূমো ফেলে দেয়। মশা মাছি মারার সাথে সাথে একটা বেশ আধ্যাত্মিক ভাব আসে, ও লক্ষ্য করেছে এতে একটা বেশ ভক্তি-ভক্তি ভাব আসে। দোকান চালানোর জন্য এক উপযোগী উপকরণ। বাইরে দুই কোনায় শুকনো লেবু-লক্ষ্মার গাঁথা মালা রোজ রাত্রে তুলে রেখে আবার সকাল হতেই ঝোলাতে হয়।

বাইরে বেরিয়েই একটা বড়োসড়ো হোঁচট খায় মধুসূদন। একটা চালের বস্তা ঠিক দোকানের বাইরে। কোনরকমে নিজে সামলায় পড়ে যাওয়া থেকে।

‘এ কি? এটা এখানে, কোথা থেকে?’ বস্তাটাকে তুলে আবার চালের জায়গায় রাখতে গিয়ে মধুসূদন থেমে যায়, মনে পড়েছে, এটার জন্য দাম নেওয়া হয়ে গেছে, কাল রাত্রে বেলা আটটা নাগাদ দোকানে এসেছিলেন যতীনবাবু, দাম দিয়ে কিনে, ভুলে আবার তার দোকানেই ফেলে গেছেন। তার দোকানের বহুদিনের খরিদ্দার যতীন মুখার্জি। এই নিয়ে চার বার হলো এক সপ্তাহে! ভুলে ফেলে যাওয়া।

খন্দের মাল ফেলে গেছে, তার জন্য তো দোকানদার দায়ী নয়, জিনিষটাকে আবার দোকানে তুলে ফেলতে পারা যায়, একবস্তা চালের জন্য কড়কড়ে দুশোটা টাকা চলে আসে দোকানের ভাঁড়ারে, কিন্তু মধুসূদনের ইচ্ছা হয় না।

যাতায়াতের জায়গায় চালের বস্তাটা দৃষ্টিকুণ্ড লাগে, তারচেয়েও খারাপ লাগে একটা অন্য চিন্তা। একটা অন্য উদ্দেশ। গত দশ বছর ধরে যতীন মুখার্জির সঙ্গে আদানপ্রদান, এই গত একবছরে এই মানুষটার পরিবর্তনটা বড় বেশি নজরে পড়ার মতো! যার হাত দিয়ে একটা পয়সা গলত না, সেই মানুষটাই দুশো টাকা দামের চালের বস্তা কিনে রেখে দিব্য ফেলে দিয়ে চলে গেল!

বাইরে একটা পরিচিত জুতোর আওয়াজে মধুসূদন আবার সামনে ফেরে। এই সারা তল্লাটে একটিই মাত্র লোক আছে যে ওর দোকানে ঢোকার আগে জুতো খুলে ঢোকে। দরজার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে ‘মাষ্টারমশাই, আসুন আসুন, এলাচ না আদা?’ চায়ের জল বসায়।

যত্ন করে সময় নিয়ে জুতো, মোজা দোকানের বাইরে রেখে রফিক আহমেদ ঘরে ঢোকেন, ‘তোর যা ইচ্ছা, তোর এত সুন্দর পরিষ্কার দোকানে এবারে একটা চিমনী বানিয়ে নিবি! এই এতো ধুঁয়ো রোজ খাচ্ছিস, এতো একসাথে কুড়িটা সিগারেটের মতো! ’

লজ্জায় মধুসূদন দৃষ্টি নামায়, জিভ ঠোঁটের ওপর রাখে, ‘সত্যি বলেছেন মাষ্টারমশাই, বড় আলিস্য, সারা দিন কাজ করার পর আর ভালো লাগে না।’

ধূমায়িত চায়ের কাপ পরিষ্কার করে মাজা স্টিলের বাটির ওপর বসিয়ে পাশে দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট রাখে।

‘কি ব্যাপার? গত কাল-পরশু আসেন নি যে? কি অন্য দোকানে ব্রেকফাস্ট করলেন নাকি?’ বুঝতে পারে লুকোনোর চেষ্টা বিফল হয়েছে, প্রশ্নটার মধ্যে অভিমানের রেশটা রয়ে গেছে।

রফিক আহমেদ মুখ তুলে তাকান, ‘না রে, তোর দোকান ছাড়া আর কোথাও প্রাতঃরাশ, মানে, সোজা বাংলার ব্রেকফাস্ট খাই না। দেখ, আমরা বাংলায় চা আর খাবার দুটোকেই খাই, অথচ বলা উচিত চা পান করি, ওটা তরল পদার্থ, আর ভাত খাই, ওটা তরল না।’ হাসেন, ‘শরীরটা ভালো ছিল না, এই তোর চা জলখাবার খেয়ে তো বাজারে যাব!’

রফিক আহমেদ একাই থাকেন, একার হাতেই রান্নাবান্না বাজার দোকান, হঠাৎ মধুসূদনের বাবার কথা মনে পড়ে একদিন দুম করে বুকে ব্যথা হয় শুয়ে পড়ল, পরের দিনই মরে কাঠ হয়ে গেল। অন্যমনক্ষ হয়, বলে ‘শরীরের আর দোষ কি? অ্যত্ন করলে...’ ‘ওরে, আমি ভালো আছি রে,’ রফিক আহমেদ হাসেন, মধুসূদনের বাস্পায়িত গলার স্বর ওনার কানে এসেছে। ছেলেটাকে গত একবছর ধরে দেখছেন। মৃদু হেসে যোগ করেন, ‘কি করি বল, আমার তো তোর মতো মা নেই, রেঁধে খাওয়াবে, শাসন করবে, আমাকে নিজেকেই সবকিছু করতে হয়।’

মধুসূদন সাহসী হয়, ‘কেন? আপনি আর এক বার শাদি করলেন না কেন?’

আহমেদ সাহেব হেসে ওঠেন, ‘তুই বিয়ে থা কর, তারপরে আমার বাড়ি বেচে তোর এখানেই বাসা বাঁধব।’

‘ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন মাষ্টারমশাই! ’ জিভ বার করে মধুসূদন হইহই করে ওঠে, ‘আমরা ছোটলোক মানুষ, আপনি বড় কলেজের প্রফেসর মানুষ, নেহাঁ আমার দোকানে চা খান, কি যে বলেন স্যার...’

সন্তান প্রসব করতে গিয়ে রাবেয়া মারা যায়, দ্বিতীয়বার আর দার-পরিগ্রহণ করতে মন চায় নি রফিক আহমেদের, এই তো দিব্যি চলে গেল জীবনটা, একা একা।

পাঞ্জাবীর হাতায় চোখের জল মুছে উদ্বিঘ্ন মুখ্টার দিকে তাকান, বাকবাকে হাসেন, ‘জনিস তো, মধুসূদন কার নাম? যার কেউ নেই, তার আছে মধুসূদন। তুই আছিস। যাঃ, যা এবার। অঙ্ক আর ইংরাজি খাতা নিয়ে আয়, আর সময় নষ্ট করিস না, কাল বাড়িতে ছিলাম, তোর ফর্ম ফিলাপ করে দিয়েছি, পরের বছর স্কুল ফাইনাল তোকে দিতেই হবে! দুদিন ধরে বড় ফাঁকি দিয়েছিস? কালকে কি লিখেছিস, যা নিয়ে আয়।’

‘মাষ্টারমশাই, আজ থাক না?’ মধুসূদন লজ্জিত হাসে, গতকাল দোকানের ঝাঁপ ফেলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল ও। ‘কাল বেশি করে পড়ে নেব, আজ আপনার জন্য অন্য কাজ আছে।’

‘সে কি রে?’ রফিক আহমেদ হাসেন, ‘এই বুড়ো মানুষটাকে খাটাবি?’

‘বেশি কিছু নয়, মাষ্টারমশাই, আপনিও তো বাজারে যাবেন। যতীনবাবু গতকাল একটা জিনিস, দাম দিয়ে কিনে, দোকানের বাইরে রেখে চলে গেছেন। মনে হয়, এক হাত থেকে অন্য হাতে নেবেন ভেবেছিলেন; আপনি বরং এখনই বেরিয়ে পড়ে ওনাকে ধরুন, কিছুক্ষণ আগেই ওনাকে বাজারের দিকে যেতে দেখেছি।’

‘মোবাইলে কল এসেছিল নিশ্চই, আজকাল সবাই কানে ফোন নিয়ে রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করে।’

‘হতে পারে, একদিন বলছিলেন, বটে, ছেলেমেয়েরা কেউ সঙ্গে থাকে না, ওনার স্ত্রী বাতের ব্যথায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, রান্না-বান্না বাজার দোকান টেলিফোন ইলেক্ট্রিসিটি বিল সব ওনার একার ঘাড়ে, ওনার নিজেরও বয়স হয়েছে তো।

যতীন মুখার্জির বাড়িটা ‘পাঞ্চালা’র পাশের গলিতেই। বাড়ি তৈরী করতে প্রায় পাঁচ বছর লেগেছিল। লম্বাটে মুখের সাথে মানাসই দোহারা চেহারা পঞ্চাশোর্ধ্ব ভদ্রলোক, ছোটখাটো গোলগাল চেহারার স্ত্রীকে নিয়ে দু-চার মাস ছাড়া ছাড়া আসতেন সরেজমিনে বাড়ি তৈরী হওয়া দেখতে। একদিনই মধুসূদনের দোকানে এসে ঠান্ডা পানীয়ের সম্বানে এসেছিলেন মহিলা, আগ বাড়িয়ে আলাপ করেছিলেন।

‘পাঞ্চালা’য় কোকাকোলা, স্প্রাইট, থাম্বস আপ নেই শুনে স্বামী-ভদ্রলোকের খুশি হওয়া দেখে মধুসূদন অবাক হয়েছিল। তার পরের মাসেই মহিলা আবার এসেছিলেন, এবং স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়েই গরমের দিনে এই রকমের দোকানে জলের বোতল থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছিলেন।

বাড়ি তৈরী শেষ করে ওরা আবার সপরিবারে মধুসূদনের পাঞ্চালায় মাসকাবারির হিসেব খুলেছিলেন।

‘ভদ্রলোক নিজে ডায়াবিটিসের রুগ্নী,’ আহমেদ সাহেব বলে ওঠেন, উনি জানেন। বানতলায় যে কয়টা পরিবারের সাথে ওনার আলাপচারিতা আছে, যতীনবাবু তাদের একজন।

বয়সে ওনার থেকে ছোট, একসময় ফাইন্যান্সে কাজ করতেন। ভীষণ হিসাবী। পাড়ার ছেলেরা পারতপক্ষে ওনার ধারে কাছে যায় না। উনি জানেন পাড়ার অনেকেই আড়ালে আবডালে ওনাকে কিপটে-শুরু বলে ডেকে থাকে।

‘বেশ তো তাই হোক,’ একহাতে চালের বস্তা ঝুলিয়ে, পায়ে জুতো গলিয়ে বাজারের পথ ধরেন আহমেদ সাহেব। পানালাল বন্ধ্যোপাধায়ের গান বাজছে ওয়াকম্যানে, কতগুলো গান শুনে শুনেও যেন পুরনো

হয় না, রফিক সাহেব গুনগুন করেন, ‘আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল’... বড় কঠিন। বাজারের কাছাকাছি আসতে সেই শব্দ ঢাকা পড়ে যায় আজানের শব্দে, বাজারের কলরোলে।

বেশি খুঁজতে হয় না, বাজারের শুরুর রাস্তাতেই যতীনবাবুকে দেখতে পেয়ে যান আহমেদ সাহেব। ওজন করে ব্যাগে তোলা উচ্চে আবার দোকানীর ঝুঁড়িতে ফেরত দিচ্ছেন। দরাদরিতে ভয়ানক অসন্তুষ্ট। মুখ চোখ লাল।

দরদর করে ঘামছেন।

এই অবস্থায় ওনাকে দেখতে পেলে অপ্রস্তুত হতে পারেন, এই চিন্তায় যতীনবাবুকে প্রকৃতিশুভ হতে কিছুক্ষণ সময় দেন আহমেদ সাহেব, ওনার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন।

কান থেকে খুলে ওয়াকম্যানটা পাঞ্জাবীর পকেটে রাখেন, লক্ষ্য করেন দোকানীর কাছ থেকে পয়সা ফেরত করে গুনে পকেটে রেখে ঘাম মুছে যতীনবাবু পটলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

‘এই, তাড়াতাড়ি কর!’ যত বেলা বাড়বে, চড়চড় করে রোদুর বাড়তেই থাকবে, এর মধ্যে ছাতাটা ও পুরনো হয়ে গেছে, বেশি রোদ আড়াল করতে পারে না।

আস্তে করে এগিয়ে গিয়ে যতীনবাবুর কাঁধে হাত রাখেন রফিক আহমেদ।

‘আরে গেল যা!’ তাড়াতাড়ি করে বাজার শেষ করে বাড়ি ফিরতে হবে, এরমধ্যে কে আবার এই ভরা বাজারে ওনার কাঁধে হাত রাখল! ‘নিজের যেমন কাজ নেই...’ কথাটা পুরো শেষ না করে যতীন মুখার্জি ঘুরে তাকান। একরাশ বিরক্তি চোখে ফুটিয়ে বলে ওঠেন, ‘আরে রফিক বাবু যে! কি ব্যাপার? এখানে তো গরুর মাংস পাওয়া যায় না! এই এতো সকালে মাছের বাজারে আপনি করছেন কি?’

ভাবেন এখনি আবার বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হবে! গরু খাওয়াটাকে সহ্য করা যায় না।

‘কেন গরু কেনা ছাড়া কি বাজারে আসা যায় না?’ আহমেদ সাহেব শান্ত কর্তৃপক্ষের প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন। কবে সেই শৈশব কালেই গরুর মাংস খাওয়া ছেড়েছেন রফিক আহমেদ।

বাতাসে এখনও ভোরের মিঞ্চিতা, পাশ্ববর্তী মন্দির থেকে সকালের আরতির আওয়াজ ভেসে আসে।

হাত বাড়িয়ে পাঁচ কেজি চালের খলেটা যতীনবাবুকে দেখান রফিক সাহেব, ‘আপনার বাড়ি হয়ে যাব না কি এখানেই দিয়ে দেবো?’

‘ওটা কি বলুন তো? এতো হেঁয়ালী করছেন কেন?’ চশমার নীচ দিয়ে যতীনবাবু তাকান, ঠোঁটের কোনা মোড়ানো, কপালে দীর্ঘ দিনের ভ্রঙ্গনীর ভাঁজ। সময় বেশ অনেকটা ছাপ ফেলে দিয়েছে মুখটার ওপর। গত কয়েক বছরেই বড় পাল্টে গেছে মানুষটা! মধুসূদন ঠিকই লক্ষ্য করেছে তাহলে!

এনাকে বেশি না ঘাঁটানোই ভালো এমন একটা সাবধান-বাণী আহমেদ সাহেবের মনে বাজে, একটু হেসে বলেন, ‘আরে ভাই, কাকে যে কোথায় দেখা যাবে এর হিসেব কে রাখে? আপনার এই জিনিষটা কি এইখানেই নেবেন, নাকি বাজার ফেরতা আপনার বাড়ীতে যাব?’

‘আপনি কি আমাকে কিছু বিক্রী করতে চাইছেন? না না! এই বাজারে এই সব কথা হবে না, বাড়িতেই আসুন,’ যতীনবাবু মুখ এবং শরীর ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যাগ দেখান।

‘না না, এটার জন্য দাম আপনার দেওয়া হয়ে গেছে,’ আহমেদ সাহেব এবার বড় করে হাসেন, ‘আপনাকে কিছু গচ্ছাচ্ছি না, আসার পথে ওই পাঞ্চালার মধুসূদন এই চালের বস্তাটা আমাকে দিল, গত রাত্রে কিনেছিলেন, ওর দোকানে ভুলে ফেলে এসেছিলেন, মিছিমিছি আপনার অশান্তি হবে, চিন্তা করবেন, এতগুলো

টাকা, তাই আমাকে দিল আপনাকে দেওয়ার জন্য। এইদিকেই আসছিলাম কি না!’ রফিক সাহেব যতীনবাবুর মনে কোন প্রশ্ন রাখতে চান না।

রোদ বাড়ছে, চুলহীন কপাল চড়চড় করে, যতীনবাবুর মুখে আর গলার স্বরেও এবার বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে, ‘তার জন্য আপনাকে বলার কি দরকার ছিল, আমাকেই তো দিতে পারত! আর আমি মোটেও ভুলে যাইনি, আপনি যেমন বলছেন! ওই ব্যাটাই তো আমায় চালটা দিতে দেরি করেছে, একশোটা জিনিষ কিনছি ওর দোকানে! এতো লিট্রিপিটির দেরি করে! সকালেই নিয়ে নিতাম, কিন্তু বেলা বেড়ে গেলে পচা মাছ ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকবে না, যত রাজ্যের কাজের সময়!’

আহমেদ সাহেব আর কথা বাঢ়ান না, যতীনবাবু থামলে বলেন, ‘সেটা আপনাদের মধ্যে বুঝে নেবেন, আমি বরং ওর দোকানেই চালটা রেখে যাই। কি বলেন? আপনার আপত্তি নেই তো?’

‘ছিঃ ছিঃ, কি যে বলছেন, আপনি এত দূর নিয়ে এলেন, দিয়ে দিন, আমাকেই দিন, আপনার কাজ শেষ করে দিন,’ যতীনবাবু মলিন হাসেন, ‘কাল রাত থেকেই মনে হচ্ছিল, কি যেন একটা ফেলে এসেছি! সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে গিন্নীকে চা জলখাবার দিয়ে, তাকে ওষুধ খাইয়ে, আমার নিজের প্রেশারের ওষুধ সব মনে করে খেয়ে তার পরে বাজারে আসা! বলুন তো, আর পারা যায়, বয়স হচ্ছে না?’ বড় করে নিশাস ফেলেন, ‘এখনই আবার বাড়িতে গিয়ে পাস্প চালিয়ে ট্যাঙ্কে জল ভরব, তার পরে গিন্নীর স্নান আমার স্নান সব সেরে আবার সব গোছগাছ করে একটু বসতে পাব। তা যাই হোক, সব ভালো তো আপনার?’

‘হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে,’ আহমেদ সাহেব কানে ওয়াকম্যান লাগাতে লাগাতে বলেন। ওনার চাইতে জন্য অন্তত দশ বছরের ছোট প্রতিবেশীটির জন্য মায়া লাগে, কিন্তু কি আর করা যায়?

একহাতে চালের বস্তা অন্য হাতে বাজার, তার মধ্যে ছাতাটাকে জুত করে রাখার চেষ্টা করতে করতে যতীনবাবু হাঁটেন, পায়ে একটা ব্যথা কদিন ধরেই ভোগাচ্ছে, কিন্তু একটা ডাক্তার যে দেখাবেন, সেই সময়টুকুও পাচ্ছেন না। দিনকাল পাল্টে গেছে, আগে অল্পস্বল্প পয়সায় কাজের লোক পাওয়া যেত, আজকাল সেই দিন নেই।

মাথার উপর চড়চড় করে রোদ্দুর বাড়ছে, পিঠে ঘামাচিণ্ণো চিড়বিড় করে ওঠে। একটা অশালীন গালাগালি গলার কাছ থেকে ঠোঁটে উঠে আসার জন্য আঁকুপাঁকু করে...

দুই ছেলে বিয়ে হয়ে কবেই আলাদা, শুধুমাত্র শীতের ছুটিতে আসে একবার দেখা করতে, বুড়ি ছোঁওয়ার মতো। বাড়ির উইল, জমিজমার উইল নিয়ে কথাবার্তা বলে, দুজন বউমা একবার করে নামকে ওয়াস্তে পায়ে প্রণাম করে বাকি সময়টা গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। যতীনবাবু চা-জলখাবার করে দেন, নির্লজ্জের মতো নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে টেলিভিশনের দিকে চোখ রেখে সেই চা জলখাবার খেয়ে ‘যাই বাপী....টাটা’ বলে আবার একসাথে বেরিয়ে যায়।

ওরা এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যায় জানতে বাকি নেই যতীনবাবুর। কপালে ঘাম মুছে আবার একটা অন্য একটা গালাগালি জিভের মধ্যে নাড়াচাড়া করেন। মদ, মাংসে কোনদিন রঞ্চি ছিল না, আজও নেই। অবকাশও নেই।

এখন তো সবই শেষ হতে চলল, এইভাবেই একটা একটা করে জীবনের অবশিষ্ট প্রতিটা মুহূর্ত রোগগ্রস্ত, বিছানায় শুয়ে থাকা স্ত্রীর জন্য চলে যাবে। তারপরে দুম করে একদিন পড়ে যাবেন, ব্যস, সব শেষ।

বড় একটা নিশাস নেন যতীনবাবু, ‘নাঃ, পড়লে চলবে না, প্রতিমাকে কে দেখবে তাহলে? প্রতিমার জন্যই ভালো থাকতেই হবে।’ একহাত থেকে অন্য হাতে চালের বস্তাটা নিয়ে যতীনবাবু আস্তে আস্তে হাঁটেন, পালকি পড়ুন ও পড়ান [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

মাথার মধ্যে ফর্দটা ঝালিয়ে নেন, প্রতিমার বাত, অম্বল আর ওনার নিজের ডায়াবিটিস, তিনটে করে ওষুধ দুই বেলা করে রোজ।

প্রতিমা বেশি চলাফেরা করতে পারে না, ঘরের মধ্যেও লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে, অথচ একদিন কি দৌড়বাঁপটাই না করতো। এই সব বাজার দোকান, ছেলেদের স্কুল, পড়াশোনা সব কিছুর ওরই ঘাড়ে ছিল, ভাবতেও হয় নি যতীনবাবুকে, অথচ এখন সব কিছু ওনার ডায়াবিটিক ঘাড়ে এসে পরেছে।

যতীনবাবুর চোখটা করকর করে, এই কি জীবন? কে জানত, এই বুড়ো বয়সে এই সব একা হাতে করতে হবে, কোথায় ছেলে আর ছেলে-বউয়ের হাতে সব কিছু ফেলে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করবেন, তা না, এই বুড়ো বয়সে শুধু খাটনি আর খাটনি।

জিভটা তিক্ত হয়ে আসে যতীনবাবুর, এই মোড়টা পেরোলেই বাড়ি, এই বাড়ীর ছাদ, জলের ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে, ছাদে টাঙ্গানো জামা কাপড়গুলো ম্মদু হাওয়ায় দুলছে, জামা কাপড়গুলোর পাশে সারি দিয়ে কাক বসে আছে, ‘তোদের মিটিং করার বেশ ভালো জায়গা হয়েছে না?’ ওদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন যতীনবাবু, নিজের মনে মাথা নাড়েন, হবেই না বা কেন, রোজ পাস্প চালিয়ে প্রথম কাজ ভাঙা অব্যবহৃত গামলায় জল ভরা, এই রোদের মধ্যে তবু একটু জল পায় পাখিগুলো। পাঁচ ছয়টা চড়াই পাখি প্রতিদিন স্নান করতে আসে ওই জলে, সাধে কি সকাল বেলায় ওনার এতো তাড়া পড়ে যায়। ছাদের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে হোঁচ্ট খেতে খেতে সামলে নেন। ভাগিয়স দেখেছেন ঠিক সময়।

এমন সময় পিছনের জামায় টান পড়তে ঘুরে তাকান যতীনবাবু।

‘নেড়ো! কি রে? খিদে পেয়েছে তো? দাঁড়া, বাড়ি যাই আগে, তারপর তোর ভাত বসাব’, সন্নেহে কুকুরটার দিকে তাকান যতীনবাবু, একটা ঘেয়ো চামড়ার নীচে কতগুলো হাড়, লেজের নাড়ায় সারা শরীরটাই কাঁপছে, দুদিন আগেই কতগুলো বাচ্চা দিয়েছে কুকুরটা, ‘আজ তোর জন্য একটু বেশী চাল নেব! তোকে বলি ওই বদমায়েস কুকুরগুলোর সাথে মিশিস না, দেখ তো, নিজেরই খাবার জোটে না, কতগুলো জ্বালা...’ কুকুরটা ওনার মুখের দিকে সটান তাকিয়ে আছে, ও সব বোঝে, গত দুবছর বড় নেওটা হয়েছে, ঠিক যবে থেকে প্রতিমা শয্যাশায়ী হয়েছে, কোথায় কাজ কমবে, তা না! কাজ বেড়েই চলেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন যতীনবাবু।

আজানের শব্দ ঢাকা পড়ে গেছে মাইকের আওয়াজে, তবে ভালো গান বাজাচ্ছে, তেমন খারাপ লাগে না আহমেদ সাহেবের। আকাশের দিকে তাকান, ‘আসসালাম আলায়কুম... মাশা আল্লাহ’ এখন পাড়ার ছেলেরা বারোয়ারী মতে বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করে, আগে ওরা শুধু দুর্গাপুজো করতো।

রফিক আহমেদ গুণগুণ করেন, ‘বল রে জবা বল।’

পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান বরাবর ভালো লাগে, গানটা পুরনো, আজকাল এই সব গান দুর্লভ হয়ে গেছে, ‘ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন!’ বড় সুন্দর কথাগুলো, সত্যিই কি তলাতল পাতাল খুঁজে প্রেমরত্ন পাওয়া যায়! রাবেয়া একটা সন্তান চেয়েছিল...

ঝঁটো ধুতে এসে বাইরে এসে মধুসূদন দাঁড়িয়ে পড়ে। দূরে যতীনবাবুকে দেখতে পেয়েছে।

অর্নগল কথা বলতে বলতে দুটো কুকুর আর চারটে বিড়ালের জন্য রাস্তার ওপর আলাদা জায়গায় খাবার রাখছেন। এতটা দূর থেকেও ও দেখতে পেয়েছে যেন কতগুলো শিশুর কথা সাথে কথা বলছেন যতীনবাবু। নরম-স্নেহ-বিগলিত কন্ঠস্বর, জানোয়ারগুলোও যেন জানে, সম্মিলিত কুঁইকুঁই করছে, ধৈর্য সহকারে দাঁড়িয়ে আছে, কে বলবে রাস্তার কুকুর বেড়াল! ওরা বোঝে, ভালবাসা বুঝতে পায়!

মধুসূদনের মনে হয় এইরকমটা যেন কোথায় আগে শুনেছে, মাষ্টারমশাই পড়িয়েছিলেন, কে যেন স্বর্গের দরজা থেকে ফেরত আসতে চেয়েছিল একটা নেড়ি কুকুরের জন্য, ভাবতে ভাবতে আবার দোকানে ঢুকে পড়ে মধুসূদন। খন্দের এসে যাবে, খাবারগুলো গরম করতে হবে।

সকালের বাকবাকে সূর্য অঙ্গুত এই পাড়াটার আজব সব কাঙ্কারখানা দেখে প্রশান্তির হাসি হাসতে থাকে।

বেলা বাড়ে।

## পারঞ্জ সদন

### শ্রাবণী দাশগুপ্ত

- হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন (সাত সকালেই ফোনটা না করলে চলছিলো না ঘোষদার? সবে টাওয়েলটা জড়িয়েছি...) বলুন। কি খবর... হাওড়া? হাওড়া থেকে? কোথায়, মানে কত ভেতরে? দাঁড়ান একটু ইয়ে সেরে আসি...।

হাওড়া! জমিটার খবর ছিল, তবে খুব একটা আগ্রহ হচ্ছে না। কি নাম বলল জায়গাটার ভদ্রলোক – পঙ্কজ নেট করছিল। অন্যমনক্ষভাবে শুনলাম বোধ হয়। চেনা লাগল নামটা। ঘোষদা ঘুরে আসতেই পারে। একটু হড়বড়ে লোক। কোন ভোরে ওঠে। টাট্টি/ফাট্টি করে কখন?

- শিমুল, এককাপ চা পাঠাও তো বুচুকে দিয়ে। (আমি বললে বুচু দেরি করবে। যত্সব, শিমুলের চামচি।)

শিমুলও বেরোবে এখন, অতএব ঝাঁঝালো কিছু শুনতে হবে। একটু খোশামোদে যদি... (হঁহ) শিমুল জাস্ট হাফ কাপ হলেই...

- ওয়েট করো কাকাবাবু।

(বাঃ বেশ ট্রেনিং। বুচুও ইংলিশ বলছে।)

- ওকে।

- দেখে এসছি জায়গাটা, বুঝলে দেবতোষ। মিনিট দশেক রিক্রায় লাগল অবশ্য, তবে জায়গা ভালো। বেশ ফাঁকা এখনও। ওর পাশে একটা উঠছে বুঝলে – ওটা অনেক বড় করে হচ্ছে মনে হলো...। খোঁড়াখুঁড়ি চলছে দেখলাম।

- ঈস, আগে ওটার খবরটা পেলাম না।

- না, না এটাও মন্দ লাগলো না বুঝলে।

- কত চাইছে কত ?

- ওরা কেউ থাকে না ওখানে। ইচ্ছেও নেই বোধ হয়। একজন তো এন-আর-আই, বুঝলে। পঙ্কজের সঙ্গে কথা হয়েছে। ডিটেলে না অবশ্য। একবার যাও না। তারপর ফোন করব তখন।

- দেখেই আসব নেক্সট উইকে।

শিমুলকে বলে দেখবো একবার। ওর অবশ্য ছুটি না-ই থাকতে পারে। নেবেওনা। তবু ওর দায়িত্ব আছে। আমাদের তিনজনের গ্রন্তির অন্যতম অংশীদার।

- কি পঙ্কজ – কোথায় নিয়ে চলেছ? ঠিক রাস্তা ধরেছ তো? এতো বেশ পাড়া-গাঁ হে এখনো। রিক্রা – সামলে চল ভাই। কোথায় চলেছো বলো তো? পঙ্কজ!!

- ঠিক যাচ্ছি স্যার। ভাবেন না। সামনের ডানদিক নিলেই মাঠটা তার এন্ড-এ। কি যেন বেশ নাম বাড়িটার... ভুলে যাচ্ছি। ঘোষ-স্যার বলেছেন তো আপনাকে। না বলেন নি?

ঘোষদা এবারেও আসতে পারতেন। শিমুল তো এলোই না। ছুটি পায় নি। জানতাম এটাই বলবে। ছেলের কাছে বেঙ্গালুরু যাবার জন্য ছুটি জমাচ্ছে। সব জানা আছে।

- এসে পড়েছি স্যার এসে পড়েছি। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন বাড়িটা রাস্তার ওধারে? নামটা খোদাই করা... কাছে গেলে পড়তে পারবেন।

লকড়...। এই জায়গায় আমি এসেছি আগে। বেশ কয়েকবার। স্কুল ছাড়ার পরে আর আসা হয়নি। মা'র কাকা সোনাদাদু ছেট্টাদুরা খুব ভালোবাসতেন আমাকে। তার পর আর খবর রাখা হয়নি। রিঞ্জা থেকে নেমে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি মাঠের সামনে।

এই তো! এই তো, এই তো পাঁচিলটা – আধভাঙ্গা গেটটা নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। একটা কাক দেখছি বসে আছে। চিত্রগুপ্তের পুত্র না কি? ছঁ, বেশ অনেকখানি জমি। পাশে উদয় সঙ্গের মাঠ নির্বার্পিত! এক চিলতে হোর্ডিং কাত হয়ে আছে। বেশ ঘিঞ্জি করে খানকয় ছাঁছন্দহীন বাড়ি উঠেছে। পাশের কমপ্লেক্সটা অনেক এগিয়ে গেছে দেখছি। স্যুইমিং পুলও রাখছে না কি ওরা? খবরটা জোগাড় করতে বলব পক্ষজকে। আমাদের স্যুইমিং পুল থাকবেনা। লো বাজেটে যাবো। মনে হচ্ছে জায়গাও হবে না। লাইব্রেরি করা যাবে। (একটা ভিডিও পার্লার...) ঘোষদার সঙ্গে ডিক্ষাস করে দেখি। শিমুলের মতটাও নিতে হবে।

- যা জঙ্গল গজিয়ে গেছে! পক্ষজ দ্যাখো ঢুকতে পারবে ভেতরে ? হাঃ হাঃ।
- না স্যার, না স্যার। সাপ খোপ থাকবে...
- তা হলে জায়গার মেজারমেন্ট হবে কি করে? আর এখন তো শীতকাল।
- হয়ে যাবে স্যার। রাফ আইডিয়া আছে তো। মালিকেরা একটা এস্টিমেট দিয়ে গেছে।

পক্ষজটা ফাঁকিবাজ! দোতলা বাড়িটাকে খুব কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি না। আগাছা ডিঞ্জিয়ে যেতে সাহস হচ্ছেন। “পার্কল সদন” – সিমেন্টের ওপরে খোদাই করে লেখাটা এখনো দেখা যাচ্ছে। বাড়িটা বাঁচানো যাবে না। কিছু নেই ওটার। লোহা লক্করগুলোও মরেছে। আমি শ্রীমান দেবতোষ বিশ্বাস – সিভিল ইঞ্জিনিয়ার – রিটায়ারমেন্টের তিন বছর আগে ভলান্টারি নিয়েছি – প্রমোটারি – পার্টনারশিপে... কি দরকার ছিলো? হ্যাহ।

বাচ্চাগুলো দৌড়ে চলেছে শ্যামামাসির পেছনে। “পাগলি পাগলি... ইইইই...”

“এই এই কে পাগলি রে? কে পাগলি? তো তোরা পাগলি তোদের মাবাপ পাগলি... হেগে জল ঢালিস? ঢালিস না? তা হলে? থুতু দিই থুতু...থু থু থু...”

শ্যামামাসির পরনের ভিজে ন্যাতাটা মাথার ওপরে দলা করা। উলঙ্গ শরীরের আগাপাশতলা থেকে টুপটাপ জল। এই শীতের শেষ বেলায় দৌড়ে ঢুকে যাচ্ছে পার্কল ভবনের নীচের তলার দরজা খুলে। আমি আর মান্ত্রদা উল্টোদিকে মামাবাড়ির বারান্দায়।

“শালা, ফিগার দেখলি? চাবুক! এমনিই তো আর...” মান্ত্রদা কানের কাছে ঘড়ঘড় করে এদিক ওদিক তাকালো। ফুলমামি মা'র কানের মধ্যে ফিসফিস করলো, “সনাতন হাজরাটা একটা হারামজাদা, জানো ঠাকুরবি!”

“এই ছেলেটা! বিয়ে করবি আমায়? করবি? তুই তো আমার চেয়ে লম্বা। বর তো লম্বাই হয়। বিয়ে করলে কি হয় আমি সঅতব বলে দোবো। আমার পেট্টি দেখছিস? উঁচু না? আমার বাচ্চা হবে জানিস?”

সেজেছে শ্যামামাসি। বিশ্রি দেখাচ্ছে। কাজল-টাজল কি সব লাগিয়েছে। ঠোঁটে গালে মাথায় লাল লাল। সিঁদুর নাকি? পেট্টা ঢাক হয়ে আছে। জটপাকানো চুল গুলো এবড়ো খেবড়ো উড়ছে।

“হিহি... একটা বাক্স আছে আমার কাছে... নিবি? নিবি? সোনা আছে তার মধ্যে... বিয়ে করলেই দেবো...”

“দেবুউ, ঘরে চলে আয় বাবা, বাইরে মোশা কামড়াবে। এখানকার মোশা জানিস তো।” ফুলমামি ডাকল না?

- পাশের নরূর দোকানটা ভেঙ্গে দিতে হবে ছার। রিকুয়েস্ট ছার।

- আপনারা কে?

- আমরা ছার উদয় সঙ্গের সদস্য। মানে পরিচালক বলতেও পারেন।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। দুজন আমারই বয়সি আধাৰুড়ো লোক। টাকমাথা একজন, অন্যজন টুপির মত কালো রঙ করে রেখেছে চুলে। সঙ্গে দুটো চ্যাঙড়া ছোকরা। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে মনে হলো।

- আমাকে বলছেন কেন? আমি কি কাজে এসেছি... জানেন নাকি?

- ও সব খবর আমাদের কাছে রেডি থাকে ছার। কে আসে, কারা কেন আসে এইসব খবর না রাখলে কি আর পাড়ায় শান্তি রাখা যায় ছার? ডিসিপ্লিন বলে একটা বস্তু তো আছে।

- বুঝলাম তো। তা ওই লোকটা করেছে কি? ওই যে নরূ না কি নাম বললেন? তাকে তো চোখেও দেখি নি কস্মিনকালে। থাকে কোথায় এই ভাঙা বাড়িটায়? ওখানে মানুষ থাকতে পারে? ভূত? হাহা।

- না না ছার। ব্যাপারটা অন্য।

লোকদুটো মুখের কাছে এগিয়ে এসে কথা বলছে। কি দুর্গন্ধ। পায়োরিয়া না কি? কি গোপন ব্যাপার? ঘোষদার সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রজেক্টটা ফক্সে না যায় আবার।

- শুনুন ছার। ওই যে পাঁচিলের গায়ে চালাটা ওইটা নরূর।

- ওকে। তা কি ব্যাপার বলুন?

আমি প্রফেশন্যাল হয়ে যাই এবার। ওই কুঁড়ে তো এমনিও ভাঙতে হবে। তা আর ওদের বলি না। দেখা যাক না কি বলতে চায়।

- ছার, লোকটা হারামির বাচ্চা। আমরা অনেকবার ছার ওকে ভালোভাবে উঠে যেতে বলেছি। হাত মুখ কিছু লাগাই নি ছার প্রথমে।

- তা বলে কি লোকটা?

- এসব কথা কাউকে বলা যায় না ছার, উচিত না। পাড়ার সম্মানের ব্যাপার কি না... পাঁচকান করবেন না যেন।

আমি অপেক্ষা করতে থাকি কখন এরা ভ্যানতারা বন্ধ করে আসল কথায় আসবে।

-শুনুন দাদা (স্যার থেকে দাদা হয়েছে – বেশ।) দুই এক বার হাতের সুখও করিনি যে তা না। পাড়ার কোন জমের বাসিন্দা আমরা। এই ছেলেপিলেরাও তো সভ্যতা ভদ্রতা আমাদের থেকেই শিখছে, তা এমন ব্যাপারকে প্রশ্ন দিতে তো পারিনা। (অসহ্য!! পক্ষজটা আবার গেছে কোনদিকে?)

- লোকটা বলে যে ওর এই জমিটুকুর ওপরে দাবী হয়, এবাড়ির কতারা উইলে সে কথা লিখেছে। ভাবতে পারেন?

না ভাবার কি আছে তাও বুঝি না। হতেই পারে। ধৈয় ধরে রাখতে হচ্ছে। মাথায় রঙ লোকটা ফিসফিস করে,

- অনেক কিস্যা দাদা – একটা পাগলি ছিলো শ্যামীপাগলি – এই পারুল সদনের মেয়ে – তার পেট হয়েছিল – সেই ছেলেটা হচ্ছে গ্যে নরু – আমরা সব তখন ছেটই – বাপজ্যাঠারা বলাবলি করতেন... বুঝলেন তো দাদা তাই বলছিলাম আর কি একটা ইলিগ্যাল নোংরা ব্যাপার বাড়িটা ভাঙতেই হবে...পাগলিটা নেকেড থাকত... বুঝলেন... দেখেছিও...

লোকটা বকবক করেই চলে। সড়াত করে লালা টানে।

চোখে পড়ে নরুর বন্ধ ছিটে বেড়ার দোকানঘর। এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। ঝাঁপবন্ধ দোকানের পেছন থেকে জটপাকানো সাদা-কালো-খয়েরি এবড়ো খেবড়ো চুল সশব্দে উড়তে থাকে আমার চোখের সামনে। কাকটা আবার এসে বসেছে পাঁচিলে। ডাকছে খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা। দুটো মোবাইলই একসঙ্গে বাজতে শুরু করেছে। একটা শিমুলের নম্বর, একটা ঘোষদার।

## মগরা থেকে আগ্রা

### তাপস কিরণ রায়

রানাঘাট গোবিন্দের ঘর। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, লেখাপড়া বেশী করেনি, তবে মেট্রিক পাসটা করতে পেরেছিল। যদিও বহু টানাটানির পর পাস মার্কস্টা এসেছিল। ভয় ছিল সংস্কৃত বিষয়টা নিয়ে, কোন বছর ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশের বেশী নম্বর পায় নি, মেট্রিক পরীক্ষায় রেকর্ড ব্রেক করেছে, একেবারে একশ'তে পঁয়তাল্লিশ!

গোবিন্দ থাকে ভাড়া ঘরে; একটা মাত্র থাকার ঘর, সঙ্গে ছোট্ট একটা রান্না ঘর, তা পাঁচ বাই পাঁচ ফুটের বেশি হবে না – কোন মতে ওর বৌ দাঁড়িয়ে রান্না করতে পারে। তাতে ওর বড় একটা বিরক্তি নেই, সে কারণটা অবশ্য ছিল এই যে তাদের নিজের বাড়ি ঘরের ক্ষেত্রফল ও প্রায় এ ঘরের মতই ছিল। থাকার ব্যাপারে অভ্যাসের হেফের বিশেষ একটা ছিল না। ঘরের সামনের দিকে এক চিলতে বাগান – ওতে দুচারটে গাঁদা, বারমাসী আর টিংটিঙ্গে একটা তুলসী গাছ – লম্বা গাছটা দাঁড়িয়ে আছে বড় কষ্টে – যেন মরে যেতে পারছে না বলে বেঁচে আছে, ঠিক তাদের সংসারের মত তো নয়!

স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো পদ্ম পরনে বড় একটা তোয়ালে, পাতলা গামছাটা বুকে ভাঁজ করে রাখা। এটাই তার স্বত্ব। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেছে বিয়ে হয়েছে, কোনো সন্তান নেই, এ জন্য অবশ্য তেমন মাথাব্যথা কারোরই নেই – নির্বাঞ্ছাট সংসার চলছে এখনো, কোনো কাঁইকুঁই নেই, কান্নাকাটি নেই, হইহল্লার বালাই নেই।

- কি অফিসে যাবার সময় হলো? মনে আছে তো সেই কথাটা? – এক সঙ্গে দুটো প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল পদ্ম।

- কোনো কথাই এখন মনে নেই, তাড়াতাড়ি খেতে দাও তো। আমি তো রেডি হয়ে বসে আছি তোমার জন্য, বলল গোবিন্দ।

- আমার জন্য অপেক্ষা কেন? ভাতটা তো তুমই বেড়ে নিতে পারতে! কাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে পদ্ম বলল, কালকের কথাটাও মাথায় রেখ যেন।

- ও দেখার সময় আছে, বারঝুপুর অনেক দিন যাওয়া হয় না, ভাবছি ওখানে মামাবাড়ী যাওয়াই ফাইনাল করব।

- আবার সেই কথা? রেগে ওঠে পদ্ম, দেখ নিজের ভাত নিজে বেড়ে নাও, আমায় যেন ফের রাগিও না, বুঝালে! বেড়ে নাও বলেও সে ভাত বাড়তে থাকে।

গোবিন্দ থেকে বসতে বসতে বলে, এত কিছু জানি না, আমার ইচ্ছে এবার মামাবাড়ীতেই যাব। বংকার দিয়ে ওঠে পদ্ম, কি বললে? আবার এক কথা! ক'দিন থেকে এত যে তোমায় বলছি, এবার পুজোয় কোথাও নয়, বাপের বাড়ী যাব?

- হতেই পারে না – বারঝুপুর মামাবাড়ী যাব, গোবিন্দ বলল।

- হতেই পারে না, বাপের বাড়ী মগরা যাব, জোর দিয়ে বলে ওঠে পদ্ম।

আপাতত ক্ষান্ত দিল গোবিন্দ তার অফিস যাবার তাড়া আছে, কথার তো আর শেষ নেই, আর যেখানে জেদি বৌ!

– সে অফিস থেকে এসে ভাববো খন, অফিসে বেরোবার প্রস্তুতি নিয়ে পা বাড়ালো গোবিন্দ।

— ও সব ভাবার কিছু নেই, আমি বললাম মগরা যাব তো মগরা যাব, বলে পদ্ম।

— অফিস যাবার সময় ঝামেলা কর না ত, সব সময় একই কথা নিয়ে পড়ে থাকবে — যেটা একবার মুখ থেকে বের হবে সেটাতেই খুঁটি গেড়ে বসে থাকবে, চললাম আমি অফিস, বলে রাস্তার দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল গোবিন্দ। যেতে যেতে শুনতে পেল তার বৌ যেন কিছু বলে চলেছে — তার মধ্যে ‘মগরা’ শব্দটা স্পষ্টই শুনতে পেল। মনে মনে সে বলল, নিকুচি করেছে তোর মগরা। থেকে থেকে এমন বায়না করে বসবে যে গোবিন্দকে শেষ পর্যন্ত তা করতেই হয়। এবারও পুজোয় সে বাপের বাড়ী যাবে, অন্য কোথাও যাবে না, যেন পণ ধরেছে। দিন দিন তার বৌটা যেন মহা জেদি হয়ে উঠছে। বিয়ের পর পর খুব কথা শুনত। তাকে মানতো বেশ, বললে ভুল হবে না, আদুর যত্নও খুব করত। মাথাটা ধরেছে, কথাটা বলা শেষ হবার আগেই যেন হাত দুটো তার মাথা আর কপালে এসে টেকত। সে সব দিন, দিনকে দিন উবে যাচ্ছে, স্টেশনের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে গোবিন্দ কথাগুলি নিজের মনেই আওড়ে নিল।

হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছায় সে। ঘর থেকে এক মাইল পথ হবে না, মিনিট দশের বেশী লাগে না; কজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে নিল, ন'টা পনের। রানাঘাট-শিয়ালদা লোকালটা ছাড়ার সময় হয়ে এলো। আর পাঁচ মিনিট হাতে আছে, প্লাটফর্ম ধরে দ্রুত পা চালিয়ে ট্রেনের দিকে এগোতে লাগল। এই ক বছরের মধ্যে ট্রেনের সংখ্যা অনেক বেড়েছে — এখন থেকেই এখন চার-চারটে ট্রেন শিয়ালদার জন্য ছাড়ে। তবু ভিড়ের অভাব নেই। মানুষ চলেছে ত চলেছেই — আসছে যাচ্ছে যাওয়া আসার কোনো শেষ নেই যেন। ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এমনিই হয় ট্রেন ছেড়ে দেয়— দু পা ছুটে দুচার জনকে এপাশ ওপাশ ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ে গোবিন্দ। তারপর শরীরটাকে আস্তে আস্তে দেয় ভিতরের দিকে গলিয়ে। এসব ধাক্কা দেওয়া আর ঝুলে পড়া এখানকার দস্তর হয়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে মধুদা ডেকে ওঠে — আরে গোবিন্দ, আজ এ কামরায় উঠেছিস!

— এ কামরা, ও কামরা সব কামরাই ত আমাদের— বলে প্রতি দিনের মত ঠোঁটচেরা একটা হাসি দেয় গোবিন্দ। ভিড়ের আর কমতি নেই রে ভাই — শুরুর স্টেশন থেকেই যদি এত ভিড় হয় আগে গিয়ে কি হবে!

— রোজ একই কথা বলে আর কি হবে বল ত মধুদা, যা হবার তা হবে, আমাদের সব কিছুই সয়ে যাবে। আমরা যে কৌরবের বংশধর মধুদা, শুধু জন্মাচ্ছি আর জন্মাচ্ছি, বলতে থাকে গোবিন্দ।

কথাটা বলল বটে গোবিন্দ, পরক্ষণই তার মনে এসে গেল পৃথিবীতে লোক সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন — এই পাঁচ বছরে তার ঘরে কোনো সংখ্যাই বাড়েনি। কে জানে, পদ্ম কোনো দিন কোনও সন্তান তাকে দিতে পারবে কি না! মাঝে মাঝে তার মনে হয়, বৌ তার বাঁজা নয় তো? তবে তো হয়েছে — এ বৎস এখানেই শেষ হবে। বলে না, বৎসে প্রদীপ দেবার কেউ নেই — সেই অবস্থা ঘটবে আর কি!

ইতিমধ্যে কল্যাণী পার হয়ে গেছে ট্রেনটা। ভিড় কাকে বলে, একেবারে দু পা সাপটে আছে— বিন্দুমাত্র নাড়াচাড়ার জো নেই। গোবিন্দের এক হাত মাথার উপরকার হাতল ধরা, আর এক হাত বেঁকেবুঁকে পেছনের দিকের লোহার জালটা ধরা। অদ্ভুত এক নাচের ভঙ্গিতে রোজকার এই যাওয়া আসা।

অফিস থেকে ফিরল গোবিন্দ। দরজাটা ধাক্কা দিল, না বন্ধই আছে ভিতর থেকে, মাঝে মধ্যে দরজাটা না দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে পদ্ম। অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছে ও, কিন্তু না আজ কিছু বলার নেই।

দরজায় আস্তে আস্তে আওয়াজ করলো। নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল পদ্ম। মুখে তার জড়িয়ে আছে একটা সুন্দর আলতো হাসির রেখা। মনে হচ্ছে কিছু সাজসজ্জা করেছে। কি জানি এখন আবার কোথায় বের হবে!

এই ত এলো অফিস থেকে গোবিন্দ, আর এখনি যদি কোথাও যাওয়ার আবদার করে, কার ভালো লাগে! শরীরের ওপর দিয়ে সারা দিনের যাওয়া আসা, অফিসেও নগর নিগমের ফিল্ড ডিউটি করা, কত আর পালকি পড়ুন ও পড়ান [calcuttans.com/palki](http://calcuttans.com/palki)

শোষায় — ভাবতে ভাবতে সে পদ্মকে পাশ কাটিয়ে দু পা এগিয়েছে কি আসল উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হলো বৌয়ের মন্দু মধুর কস্তুরে — বুঝলে গো, চল না একবার স্টেশন বাজারে।

দু একটা টুকটাক জিনিস কিনে ফিরে আসবো তাড়াতাড়ি, আবার হাসির রেখা জেগে উঠলো পদ্মুর সমস্ত মুখ জুড়ে।

— এই তো পা দিলাম ঘরে, সারা দিন পরে, রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। এখন কি কারো বেরোবার সময়! দোকান পাট বন্ধ হলো বলে... ততটা চড়া সুর ভাঁজল না গোবিন্দ — কারণ বৌ হয় ত মগরা যাওয়ার মতটা পাল্টাতে পারে এই ভেবে।

তুমি তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নেও, আমি তোমার চা এনে দিচ্ছি — মধুর বচন বের হল পদ্মুর মুখ থেকে।

কেন জানিনা গোবিন্দও আর কিছু মুখে বলল না। ও বোধয় কিছুটা আস্তন্ত হচ্ছে মনে মনে এই ভেবে যে এবারকার মত মগরা যাবার প্রোগ্রামটা হয়ত কাটানো যেতে পারে।

বৌয়ের বাপের বাড়ী মগরা যাওয়াটা তার কাছে বড় অস্বস্তির ব্যাপার হয়ে ওঠে। অচেনা অজানা জায়গার মতই লাগে। না আছে চেনাজানা কেউ — না দুটো লোকের সাথে মন খুলে কথা বলা যাবে, না ইচ্ছে মত কিছু করা যাবে — শুধু শাশুড়ির ‘বাবা, বাবা’ ডাক শুনে যাও। শুশুর তো বিছানায় ককিয়ে মরছে — তার কোমরে ব্যথা, বুকে ব্যথা — ব্যথার আর অন্ত নেই।

শাশুড়ি কথা শুনিয়ে যাচ্ছে শুশুরকে — আর ত পারলাম না, খেটেখুটে মলাম গো। গোবিন্দের দিকে ফিরে হয়ত বলতে থাকলো, জানো বাবা, তোমার শুশুর ত চার পাঁচ বছর ধরে প্রায় বিছানাতেই লেগে আছে, কুটোটা নাড়ার শক্তিটাও নেই।

মারো মারো শুশুরকেও বেশ নড়েচড়ে উঠতে দেখেছে গোবিন্দ। শুশুরও শাশুড়ির কথার জবাব দেয়, বলে, এত কেন বল! এই দু মাস আগেও তো তোমায় আমি বাজার করে এনে দিয়েছি গো!

তুমি চুপ করো, আবার ব্যথা বাড়বে কিন্তু বলে দিচ্ছি — তখন আমি কিছু করতে পারব না, তারপর গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলে, বুঝলে বাবা, তোমার বাবাকে না দু বেলা মালিশ করে দিতে হয় — তবে গিয়ে বিছানায় একটু উঠে বসতে পারে।

গোবিন্দের ওসব আর ভালো লাগত না, মনে মনে ভাবত — কে জানে মালিশে এমন কি জাদু আছে যে তাতেই শুশুর চাঙ্গা হয়ে উঠত! ও নিয়ে ওর আর ভাবনার ইচ্ছে হত না, তবে মনে মনে তার হাসি পেত — কে জানে শরীরের কোন কোন স্থানে মালিশের ছেঁয়ায় তার শুশুর-বাবা এমন সতেজ হয়ে উঠতো!

ইতিমধ্যে স্টেশন বাজারে পদ্মকে নিয়ে পৌছে গেছে গোবিন্দ। স্টেশনের পাশেই লাগাও বেশ কিছু জায়গা নিয়ে অনেক রকম দোকান মিলেই স্টেশন বাজার তৈরী হয়েছে।

পদ্ম একটা পার্সের দোকানে ঢুকলো, গোবিন্দকেও দোকানের ভিতর আসতে বলল। রংবেরংয়ের পার্স দেখতে লাগলো পদ্ম। একটা কটকটে লাল পার্স দেখিয়ে বলল, দেখো তো এটা কেমন লাগছে?

মন্দ নয়, ব্যাস এটুকু ছেট্ট কথা বলেই চুপ করে গেল গোবিন্দ, সে জানে তার পছন্দ খাটবে না এখানে। পদ্ম যা পছন্দ করবে তাই ফাইনাল বলে মেনে নিতে হবে। কাজেই বেশী কথা খরচ করার দরকার কি বাবা। দরদাম করে ঐ লাল পার্সটাই নিয়ে বেরিয়ে আসতে হলো দোকান থেকে।

এবার গয়না কেনার পালা — না, সোনা দানা না, হিরে মুঙ্গো মানিকের দোকানে নয়, ওরা ঢুকলো গিয়ে বেনটেক্স গয়নার দোকানে। ঘকঘকে সোনার মতই দেখতে এই বেনটেক্সের গয়নাওগুলি, তবে মূল্য বলতে গেলে

গয়ীব ঘরের জন্য একেবারে কম নয়। গোবিন্দ পাঁচ সাত হাজার বা মাইনে পায় তাতে জোড়াতালি দিয়ে টুকটাক পদ্দের বায়না আবদার মিটিয়ে চালিয়ে নিতে পারছে, এটাই তো অনেক।

পদ্দের কাছে গোবিন্দ লোকটা খারাপ নয়, বেশী একটা কথা বলে না, বলার আবেশ আসলে বা একটু খুশ মেজাজ থাকলে অবশ্য অন্যর্গল কথা বলে যায়। বিয়ের আগে একটু আধটু প্রেম প্রেম খেলা যে করে নি তা নয়। ও তো সবার জীবনেই আসে।

জানতে অজানতে ছোঁয়াছুঁয়ি, কাছে ঘেঁষাঘেঁষি, চোখাচোখি এ সব কার জীবনে না ঘটে! পদ্দের জীবনেও এমনি ছোটখাট ঘটনা ঘটেছে বৈ কি। তবে হ্যাঁ, স্পর্শ করো, ছোঁয়াছুঁয়ি খেলো কিন্তু তার বেশী ভিতরে কাউকে প্রবেশ হতে দেয় নি। একবারের কথা মনে পড়ে তার – তাদের পাড়ার সমীরণের কথা। সমীরদা, বয়স তার চেয়ে দশ-বার বছর বড়ই ছিলো, কাকু সঙ্গে করাই ভালো ছিল তবু কেন যেন সমীরদা বলেই ডাকত পদ্ম। তখন ও ক্লাস নাইনে পড়ে – ক্লাস অনুযায়ী বলতে গেলে তার বয়সটা একটু বেশিই ছিল। উনিশ বছরের খিঙ্গী মেয়ে ছিল তখন আর সমীরণ ছিলো উনত্রিশ-ত্রিশ বছরের লোক। সঙ্গে ঐ অবিবাহিত শব্দটা জোড়া থাকার জন্যই বোধ হয় একটু গা ছোঁয়া টোয়ার পারমিশনটা নিজের অজান্তেই কবে দিয়ে ফেলেছিল। এক দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, আর থাকবেই না বা কেন, ছোঁয়ার থেকেও একটু বেশী স্পর্শ পেয়ে ছিলো সে সে দিন। ঘরের ছাদের উপর কি জন্য জানি সন্ধ্যার দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পদ্ম, সে জানতে পারে নি পা টিপেটিপে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সমীরদা। হঠাত তার অস্তিত্বের কথা যখন জানতে পারল তখন পদ্ম তার দু বাহুর বেড়িতে চেপে আছে। আবছা অন্ধকার চারিদিক, দুই ছায়ার আলিঙ্গনকে কে জানে কেউ দেখতে পেয়েছিল কি না! মুহূর্তে ঝাপটা মেরে সরে গেল পদ্ম। সে জানে আর এগোনো এক অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে অনুচিত। তবু তাকে কাছে টেনে নেবার জন্যে সমীরণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল – কাছে এস না, একটু, পিজ – অস্পষ্ট ভাবে বলেছিল সমীরণ।

পদ্ম নিচে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে এগোল। সমীরণ শরীরটাকে একটু স্থির করেই দু লাফে পৌঁছাল পদ্মের কাছে আর কিছু বলা কওয়ার অপেক্ষা না রেখেই পদ্মকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে এক মোক্ষম চুম্বন দিয়ে বসলো, সে চুম্বন সমস্ত গাল ভরা হাওয়া নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকে পদ্মের গালে। প্রায় বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড পরে সশব্দে শেষ হয় চুম্বনের সময় কাল। ব্যাস, ঐ পর্যন্ত, আর এগোয়নি প্রেম। সামান্য বচসার পর ও নিজেকে সামলে নিয়েছিল আর কাছে এগোতে দেয়নি সমীরণকে কোনোদিন।

একটা বেন্টেক্স এর পাতলা হার, দু গাছ চুড়ি নিয়ে ক্ষান্ত হলো পদ্ম। তারপর পথ হেঁটে ঘর ফিরল দুজনে। রাত্রে শুতে যাবার আগেই সব কিছু পরিষ্কার হলো গোবিন্দের কাছে। এসব কেনাকাটি বাপের বাড়ি মগরা যাবারই প্রস্তুতি ছিল।

– আমার আর কিছু চাই না, দুটো সাড়ি আর আজকের কেনাকাটাই পুজোর বাজার শেষ, মগরা গেলে মা-বাবা তো আমাদের দেবেই, পদ্ম বলে ওঠে। এবার গোবিন্দের মেজাজ বিগড়ে গেল, তার ভাবনা ছিল বুঝি এবার এত কিছু কিনে দেবার পর বৌয়ের মগরা যাবার মতটা পালটানো যাবে। কিন্তু ভুলটা ভাঙলো পদ্মের কথায়।

– তুমি গেলে যাও, আমি ঐ মগরাতে এবার যেতে পারব না, বৌয়ের সামনে গোবিন্দ কথাগুলো ছুঁড়ে মারে, যদি যাই ত বারুইপুরই যাব।

– আমি মগরা যাব আর তুমিও মগরাই যাবে, পদ্ম ছাড়বার পাত্র নয়। এক বছরে একবার বাপের বাড়ি যাবে এটা ওর বড় আবদার ছিল না। গোবিন্দও মামা হাজার বার বলার পরও এ চার বছরে একবার মামার

কাছে যেতে পারেনি— এ কথা ফেলবার নয়। কাজেই কেউ কারো কথা মানতে চায় না। এ বলে মগরা, ও বলে বারঙ্গিপুর।

- আমি মগরা যাব, প্রায় চিৎকার করে উঠল পদ্ম।
- না, আমি বারঙ্গিপুর যাব, সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার করে উঠলো গোবিন্দ।

এভাবে চলতে লাগলো তাদের কোন্দল— যে যার জেদ ধরে বসে থাকল, নিজের দাবী থেকে কেউ এক পা নড়তে চাইল না। বিছানার পাশাপাশি লাগোয়া বালিশ সরে গেল মাঝ বিছানা খালি করে, যার যার শিয়র ঘুরে গেল পরস্পরের বিপরীতে। চুপচাপ, শাস্ত হয়ে গেল ঘর। শুধু অন্ধকার ঘরে শরীরের এপাশ ওপাশ নড়ার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না।

গোবিন্দের ঘূম আসে না। পদ্মের কথা চিন্তা করে সে। এমনি ও খুব ভালো, গেরস্থালি কি করে করতে হয় খুব ভালো করে জানে। সংসারটা কে মোটামুটি সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। যে কটা পয়সা পায় গোবিন্দ আজকালের দিনে তাদের দুজনের জীবের সংসার চালানো খুবই কষ্টের ব্যাপার।

তবু দিব্য চালিয়ে নিচ্ছে। গোবিন্দ খুব একটা টের পাচ্ছে না। তবে মগরা সে যাবে না। একদম ভালো লাগে না। সময় একেবারে কাটতে চায় না। সময়ে অসময়ে শাশুড়ি মায়ের বাবা বাবা ডাক কেন যেন একদম সহ্য করতে পারে না। শশুরটা ত সারাক্ষণ খাটের উপর শুয়ে শুয়ে কোঁকাতেই থাকে, শাশুড়ির মালিশ পেলে অমনি বুড়ো চাঙ্গা!

আরো একটা জিনিস ওর গায়ে কাঁটা বেঁধাতে থাকে — পদ্মের চেনা জানা সেই লোকটা, কি যেন নাম তার, হ্যাঁ, সমীরদা বলে ডাকে। লক্ষ্য করেছে পদ্মের আশেপাশে কেবল ঘুরঘুর করতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ, এটাও ঠিক, পদ্ম লোকটাকে বিশেষ পাত্তা দিতে চায় না। লোকটার দাঁত বের করাটা তার অসহ্য। হঠাৎ ভাবনার তাল কাটে, শোনে পাশে শোয়া পদ্ম ঘুমের ঘোরে চেঁচাচ্ছে—

মগরা, মগরা, মগরা...

গোবিন্দও রাগে চিৎকার করে ওঠে, না, বারঙ্গিপুর, বারঙ্গিপুর, বারঙ্গিপুর...

ততক্ষণে পদ্ম চুপ হয়ে যায়, বোধ হয় আবার ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে।

আরো সময় কেটে গেল। সময় মত যদি ঘুমোতে না পারা যায় তবে ঘূম আর আসতে চায় না। সমস্ত আধ ছেঁড়া ভাবনাগুলি মনের সামনে ভাসতে থাকে। বাবা-মা গত হয়েছেন অনেক দিন। সেও তাদের একমাত্র সন্তান ছিল। আর্থিক অবস্থা এখনকার মত এমনি ধরনেরই ছিল। গড়িয়ে গড়িয়ে সংসারটা কোনো মত চলে যেত— যেন ঠেলা দেওয়া সংসার নামক গোল বস্তু ঢালের দিকে জাগতিক নিয়মে গড়িয়ে চলেছে। এ জন্য আফসোস নেই গোবিন্দের। খেয়ে’পরে বেঁচে থাকতে পারলেই চলবে। বেশী আশা কোনো দিন করে নি।

পদ্মের মনটা তার মতই সীমাবদ্ধ। অতিরিক্ত চাওয়া নেই, অতিরিক্ত পাওয়ার ইচ্ছাও ও করে না। তবে হ্যা, জেদি খুব। খুব। ভেবে দেখলে জেদ তারও খুব একটা কম নেই। এক সপ্তাহ ধরে বারঙ্গিপুর, বারঙ্গিপুর বলে পুনরাবৃত্তি করছে এটা এক ধরনের এঁড়েমিরই লক্ষণ।

পাশ ফিরল গোবিন্দ। অন্ধকারে ছেয়ে গেছে ঘর। পদ্ম ঘুমাচ্ছে না জেগে আছে বোৰা যাচ্ছে না। শাসের শব্দের টানাপোড়েনও শোনা যাচ্ছে না — যাতে বোৰা যেতে পারে ও ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে! জেগে শুয়ে থাকলে মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ করতে হত — উসখুস করে সে চিন্তার সুতোটা যখন ক্ষণে ক্ষণে কেটে যায়, অন্য চিন্তা জোড়ার আবেশে সে বোধ হয় উসখুস করে, নড়েচড়ে, না হয় পাশ ফিরে শোয়। তেমন কোনো লক্ষণ পদ্মের দিক থেকে টের পাওয়া যাচ্ছিল না।

গোবিন্দর ঘুম আসছে না। এবার বাথরুমে যেতে হবে তাকে। লাইটটা জ্বালল। ওদের বাথরুমটা ও বড় ছোটো, বোধহয় তিন বাই তিনের বেশী হবে না। দাঁড়িয়েই কোনো কাজ করতে অসুবিধা হয়ে যায়। কে জানে পদ্ম ওখানে বসে কি করে কাজ করে!

মগটা টানো – বালতিটা ঠেলো, ঢালো – এত অকুলান জায়গা নিয়ে কাজ করতে হয় তাকে। যে কাজ করে তার কোনো চিন্তা ভাবনা নেই এ ব্যপারে। ব্যাস ল্যাঠা চুকে গেল!

তার কাছে দিনকাল মোটামুটি ভাবে চলে যাচ্ছে এটাই বেশী। লাইট নিভিয়ে আবার বিছানাকে সঙ্গী বানাতে হবে। হঠাৎ পদ্মুর দিকে তার চোখ পড়ল। বে-ঘোরে ঘুমোচ্ছে, দেখলে যে কেউ বলে দেবে, না, ঘুমোবার ভান বা লক্ষণ কোথাও তার নাকে মুখে শরীরে নেই। শান্ত, বিছানায় লেপটে থাকা শরীরটায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া আর কোনো ভাবের আভাস পেল না গোবিন্দ। বেশ লাগছে ঘুমন্ত পদ্মকে এখন।

আজ পাঁচ পাঁচটা বছর ঘুরে গেল তাদের কোনো সন্তান এলো না। এ নিয়ে তত ভাবেনি উভয়ের কেউ। কথার ছলে পদ্ম কথাটা ওঠালেও – তার মধ্যে এত গভীরতা সে খুঁজে পায় নি। সময়ের ফাঁকে একেবারে যে মনে আসে না তা নয়। এমন নয় তো, পদ্ম বাঁজা! নাকি নিজের শরীরেই আছে কোনো দোষ। ব্যাস, এ পর্যন্ত, এর আগে ভাবনা আর এগোয়নি, এজন্য বেশী মাথা কেউ ঘামায় নি। নির্বঞ্চিত চলুক না আরো কটা দিন। তারপর এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া যাবে'খন। ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা টরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার সময় চলে যায়নি এখনো।

লাইট নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ বোজে গোবিন্দ। এবার হয়ত ঘুম এসে যাবে। কাল ছুটির দিন আছে, রবিবার, নিদাদেবীও বুঝতে পেরেছেন যে এত তাড়াতাড়ি ঘুম না দিলেই বা ক্ষতি কি! মন-শরীর এক সামঞ্জস্য গতিতে চলতে থাকে— শরীরের কথা মন জেনে নেয়, আর মনের কথা স্তুল শরীর কেমন করে যেন জেনে নেয়! না, আবার হাবিজাবি ভাবতে লেগেছে গোবিন্দ। পাশ ফিরতেই পদ্মুর গায়ে হাত ছুঁয়ে গেল— একটু কি চন করে উঠলো শরীরটা! নাঃ, পরক্ষণই ভাবল, ও ঘুমোক। না হলে এখন উঠেই বলবে, মগরা যাব, বারহিপুর যাব না। তার চেয়ে বরং এক টানা একটা ঘুম দিয়ে উঠুক, মনটা একটু শান্ত হবে।

আর শান্ত মন হলে দেখেছে গোবিন্দ অনেক কিছু সরল সিধা করে চিন্তা করার শক্তি আসে। বিবেচনাবুদ্ধিটা গোড়া থেকে খুলে যায়। এমন হতে পারে সকালে উঠে পদ্ম বলবে, হ্যাঁ গো, তোমার কথাই থাক তাহলে, এবার তাহলে তোমার মামার বাড়িতেই যাওয়া যাক। দেওয়াল ঘড়িটা টিক করে একটা শব্দ করলো – তবে একটা বেজে গেল নাকি! দেওয়ালে সাঁটা ঘড়িটার দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সব অস্পষ্ট অন্ধকার লাগলো, জানলার পাল্লার পাশ দিয়ে আসা আলোর রেখাগুলি ঘরটাকে একটু সামান্য আলোকিত করেছে বটে, তবে তা অনায়াসে দেখার পক্ষে সহজ নয়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রাইল ঘড়ির দিকে – এবার একটু একটু করে চোখের সামনে স্পষ্ট হতে লাগলো ঘড়িটা, না, একটা এখনো বাজেনি, একটা বাজতে প্রায় আঠাশ মিনিট বাকী আছে। তার মানে, ঘন্টাটা সাড়ে বারোটা বাজার সংকেত ছিল।

একটা ঘটনার কথা মানে পড়ে গোবিন্দর। তখন বয়স ঘোল সতের হবে, বাবা মা দুজনেই বেঁচে ছিলেন। বাবাকেও তার মত কলকাতায় চাকরির জন্য যাতায়াত করতে হত। এমনি পদ্মুর মত করে মাকে সারা দিন যাপন করতে হত কিছু না কিছু কাজটাজ করে। এখন যেমন ঘরে ঝি-টি নেই, কাজকর্ম দুজনের যা থাকে ঘরে পদ্ম নিজেই একা সামলে নেয়, মাও তেমনি সংসারের কাজটাজ সামলাতেন। তবে ঐ সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ, গোবিন্দর ঘোলো-সতের বছর বয়স পর্যন্ত একটা মেয়ে তাদের বাড়ী কাজ করত। বেশী কিছু করত না সে – সকাল বিকাল বাসন মাজা আর ঘর পোছা, বাকী সব কাজ মা নিজেই করতেন।

কাজের মেয়েটার নাম আজও মনে আছে তার— মলী, হ্যা, মলী ছিল তার নাম। রোজ খুব সকালে আসতো। বাসনটাসন মেজে চলে যেত। সন্ধ্যার আগে আগেও একবার তাকে আসতে হত — ঐ সময় দুপুরের খাওয়া এঁটো থালাবাসনগুলি মেজে দিয়ে চলে যেত। গোবিন্দর বয়সটা তখন ছিল যৌবন ছুই ছুই। মেট্রিক পরীক্ষার বছর ছিলো সেটা। পড়াশুনোয় খুব একটা ভালো ছিল না, তবু পাস করতে হলে কিছু না কিছু সময় নিয়ে পড়তে তো হতই। ওর পড়াশুনোর ধরণ ছিল অন্য রকম। যখন পরীক্ষা দোর গোড়ায় তখন পড়তে পড়তে রাত দিন প্রায় একাকার করে দিত।

এমনি একটা দিনের কথা। ভোরের ছায়া নেমে এসেছে চারিদিকে। এ ছায়া কেটেই তো ভোরের আলো ফুটে ওঠে। এমনই সময়েই কাজের মেয়েটা, মলীর আসার সময় হয়। ক' দিন ধরে মা'র বদলে ও-ই উঠে ঘরের দরজা খুলে দিচ্ছে মলীর ভিতরে আসার জন্য। আর কেন জানে না পড়তে পড়তে মন্টা বড় এদিক ওদিক করতে থাকছিল। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আড় চোখে দেখে নিচিল মলীকে। মলী বালতি আর ন্যাতা নিয়ে আপন মনে নিজের মত করে পুঁছে যাচ্ছে ঘর, আর গোবিন্দ একটু একটু করে দেখে যাচ্ছে— মেয়েটা টের পাচ্ছিল না। মেয়েটা চোদ্দ পনের বছরের — একটা লাল ফ্রক পরে ছিল — চিলা ঢালা ফ্রক। তার গলার নিচে অনাচে কানাচে সবই প্রায় দেখা যাচ্ছিল। দু দিন ধরে এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে গোবিন্দর শরীরে জন্মাচ্ছিল একটা বয়সের ধর্মের প্রতিক্রিয়ার চেউ। হঠাৎ একদিন গোবিন্দ তার অজান্তেই কেমন করে ঘটনাটা ঘটিয়ে দিল। মলী যথারীতি তার ঘর মুছতে এলো, গোবিন্দ যথারীতি তাকে দেখতে লাগল। আচমকা সে খাট থেকে নামল, তাকে দেখলে মনে হচ্ছিল বাথরুম যাবে — এমনি একটা ভাব। সে এগোলো মলীর কাছে, আচমকা একটা হাত মলীর গলার নীচ ধরে বুকের নিষিদ্ধ জায়গায় নেমে গেল। ব্যাস, কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তেমনি আচমকাই হাতটা সরিয়ে নিয়েছিল গোবিন্দ। একটা আশ্র্য আনন্দর মুহূর্ত আসতে না আসতেই মিলিয়ে গেল। সে যেন নিজের মধ্যে তখন ছিল না, এ কি করেছিল সে!

মলী শিকারীর আচমকা আক্রমণের কথা ধারণা করতে পারেনি। তিড়িং করে উঠে দাড়ালো। ঘর মোছা শিকেয় উঠলো, নিজেকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিয়ে দু চার বড় দম নিয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল। পর দিন থেকে ও আর আসেনি। একটা অপরাধবোধ গোবিন্দর মধ্যে পোষা ছিল অনেক দিন ধরে।

জানলা দিয়ে এক ঝলক রোদ চোখে এসে পড়ল, ঘুম ভাঙল গোবিন্দর। দেওয়াল ঘড়ি দেখল, বেলা নটা বেজে গেছে। আর সেই সময়েই চোখে পড়ল পদ্ম চায়ের কাপ হাতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। মুখে তার টানা মিষ্ঠি হাসি, প্রসন্নতার পুরোপুরি লক্ষণ ফুটে উঠেছে চোখে মুখে, সমস্ত শরীরে।

— এই যে সাহেব, ঘুম ভাঙলো? এবার বেড টি টা খেয়ে নিন, বলতে বলতে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো পদ্ম। সদ্যস্নাতা পদ্মৰ শরীরটা ঝরঝরে মনে হচ্ছিল।

গোবিন্দ হাত বাড়িয়ে টেনে নিল পদ্মকে, কাপ ছলকে বিছানার এক কোনে পড়ল কিছুটা চা।

— আরে, আরে, কি করছ, চা টা ফেললে তো, হাসির ঈশৎ চেউ জাগিয়ে গোবিন্দর পাশে এসে বসল পদ্ম। বিছানায় চা পড়ার কথা তারা ভুলেই গেল।

— কি? রাত ভর ঘুম হয়নি বাবুর! আবার হাসিতে শরীর কাঁপাল পদ্ম। ঘুমটা একদম ভেঙ্গে গেল গোবিন্দর। শরীরটাকে ঘুরিয়ে মাথাটা নিয়ে রাখল পদ্মৰ কোলের কাছে।

নাও, চা টা ঠান্ডা হয়ে যাবে যে, বলে গোবিন্দর মাথায় হাত রাখল পদ্ম, তোমার শরীরটা দিন কে দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে গো। গোবিন্দ তেমনি পদ্মৰ সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে, শরীর ঠিক থাকবে কি করে — ঘরের বৌ আমার কথা না শুনলে।

বাক্য শেষ হবার আগেই পদ্ম বলে উঠল, এবার থেকে শুনব গো, তোমার সব কথা শুনব। সারা দিন তোমার শরীরের উপর অনেক ধক্কা যায় জানি – সেই সকালে বের হও – আর রাত সাতটা আটটাৰ আগে তো ফিরতেই পার না।

গোবিন্দৰ রাতের ভাবনার কথাটা এমন ভাবে মিলে যাবে চিন্তাই করতে পারেন। একটা নিশ্চিত ঘূম দিয়ে পদ্মা নদী আজ শান্ত হয়েছে! ওকে দেখলে মনে হচ্ছে শান্ত ধীর স্থির এক প্রতিমার মত— শুধু একটা হালকা তিরতির শ্রোত তার সমস্ত শরীরে খেলা করছিল।

– জান, আমি ঠিক করেছি মগরা আর যাব না, চল বারংইপুরই ঘুরে আসি, মামা-মামীদের বহুদিন দেখি না, শান্ত হয়ে বলল পদ্ম।

গোবিন্দৰ আন্দাজ কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে, ঘূম নামক ওষুধ মানুষকে শান্ত করে দেয় — মনের বুদ্ধি খুলে দেয় — মানুষ স্বচ্ছন্দ জীবনে নেমে আসতে পারে। মাথাটা তার একটু টন্টন করে ওঠে — ঘূমটা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। তবে এটুকু বুঝতে পারে যে ভালোবাসা নামক বস্তুটাও কিছুটা ওষুধের কাজ করে — মানুষকে চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গে শান্তও করে। সে বুঝতে পেরেছে, সে নিজেও খুব জেদি, না হলে, পদ্মৰ কথাটা রাখলে, ওকে এবার মগরা নিয়ে গেলে কি এমন মহাভারত অশুল্ক হয়ে যেত!

— মগরা যাবে তো চলো মগরাই ঘুরে আসি, মৃদু ভাবে শান্ত গোবিন্দ কথাটা বলল।

— না, না, এবার তোমার মামা বাড়িই চল, গোবিন্দৰ মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে ওঠে পদ্ম।

— চল এক কাজ করি, পদ্ম, চল এবার পুজোয় অন্য কোথাও যাই, যেন আবদারের সুরেই গোবিন্দ বলে ওঠে — চল আমরা আগ্রা ঘুরে আসি, তোমার তো অনেক দিনের ইচ্ছা — প্রেমের প্রতীক তাজমহল দেখার!

— যাবে, উচ্ছলিত হয়ে উঠল পদ্ম, কিন্তু কতগুলি টাকার খরচ বল!

— চিন্তা করো না, অফিস থেকেও কিছু টাকা পেয়ে যাবো, বলে গোবিন্দ। ঠিক হলো মগরা নয়, বারংইপুর নয়, ওরা দুটি মিলে যাবে আগ্রায়।

দু'জনের মত মিলে একটা জটিলতার গিঁট ছাড়ল।

গোবিন্দ এবার পদ্মকে টেনে নিল কাছে। ওদের খন্দযুদ্ধ সমাপ্ত হলো। সন্ধির পর নতুন করে যেন শান্তি ফিরে এলো ঘরে।

## His Final Mission

Aniruddha Sen

*(This is purely a work of fiction. Any resemblance with any real person or incident is a mere coincidence.)*

Cabinet minister Sharma's cavalcade was moving through a hilly terrain above a picturesque valley. The entourage had the usual protective coverage of a group of combat-trained commandos, a posse of policemen and an ambulance. The VIP was on his way to an important election rally in the nearby tribal area. Of late, Sharma's reputation had taken a beating due to his alleged involvement in a scam of illegal usurpation of tribal lands. It took considerable efforts before he could finally get off the hook. The trip was a follow-up, for political damage control.

As the minister's bullet-proof car was negotiating a sharp bend, there were a couple of barely audible sounds, like the pops from the opening of soda water bottles. The experienced driver of Sharma immediately knew he had flats. But before he could regain control, the car traveled straight to take a five hundred feet plunge into the ravine, as the guards and the medics watched helplessly.

On a cliff a few hundred feet away and from under the cover of thickets, a man spat derisively and packed his rifle and kits with a smug smile. "Indian Cabinet minister died of unfortunate road accident", he could imagine the immediate news flash. If they would ever find those two small bullet holes in the tires, by then he would be hundreds of miles away.

Mohan Kumar, a super hit film director of Mumbai was on a clandestine rendezvous with Sultan Khan, a film financier. It was an open secret that Sultan was a Dubai-based mafia leader, while Mohan was recently in a jam in a 'casting couch' scandal. An aspiring actress had sued him for forcing her regularly to bed, with the false promise of giving her a role. Mohan's lawyers, however, had convincingly established that she was just a cheap tart. Thus disgraced, she had taken her own life. Or so it was reported.

They met in a pub, controlled by Sultan's gang, to discuss their next mega production. But presently they were talking about something else in a hush-hush manner. "I do your bidding. But don't you think it was a bit too harsh to her?" Sultan said.

"No, no, dear friend – I heard she was going to engage a contract killer to bump me off," Mohan argued.

Suddenly a waiter tiptoed in and whispered something to Sultan.

"Oh no, it's those goddamned policemen again, searching for drugs and whores!" Sultan yawned.

Mohan paled. Assuring him, Sultan said, "Sit tight while I settle it. It's just a matter of routine pay-offs."

"But this is the most awkward moment for us to be spotted together by the police. It'll start the rumor mills rolling about her – yep – suicide!"

Sultan pondered and then said, "Well, there's a backdoor. Take it and hit the alley behind. Tell your driver to wait near the 'Safari' restaurant; that's just a stone's throw away."

Mohan called his driver and the private bodyguards on mobile phone and instructed them accordingly.

As he emerged from the dark back alley and headed towards his vehicle, a hit-an-run car mowed him down. "Filthy rat!" The man on the wheel uttered spitefully, as the car sped away before anybody took note.

Sanjay Khurana, a noted industrialist, was on his way to inaugurate his ambitious venture of a beverage plant in the hinterland of a North Indian province. Few months earlier, he was embroiled in a controversy when one of his companies was declared bankrupt. Thousands lost their jobs and millions their investments. Rumor was that he himself had engineered the bankruptcy by secretly siphoning off the company's assets through a phantom company. After few months of trials and tribulations he walked out scot-free, widely believed to be due to his strong connections at the corridors of power.

The proposed site was easily approachable by road. But apprehending violent public demonstrations or even threats to his life, Khurana had decided to play it safe and fly by a helicopter. A make-shift helipad had been prepared for the purpose. As his helicopter was hovering before touchdown, he dreamily envisioned a huge complex with gigantic distilling towers sprouting up within the barren fields and the meadows that lay below.

On the ground, there were dozens of policemen and private security guards ensuring foolproof safety for the head honcho. Every single person around was frisked umpteen times, every square inch of ground was scanned with explosive detectors and only the very few trusted ones were allowed to go near the helipad. The moment the big boss would land, this 'inner core' would form a human shield to escort him to the inauguration venue through a ramp that was extended up to the helipad.

Just before the touchdown and with all eyes on the helicopter, an odd security man looked back and screamed, as he saw that an empty police van parked just above the ramp had started off accidentally. Before anybody could react the massive vehicle rolled down the cleared ramp, gathered speed with every passing moment and hit the chopper seconds before its landing. The oil tank, a gigantic explosive in wait, went off immediately.

Minutes later a siren-wailing ambulance darted out of the complex with a few mangled bodies towards the nearest hospital – not with much optimism, but as a mere formality. In the mêlée none could have bothered to check the credentials of the mask-wearing medical staff who were accompanying. It was only after a good half an hour that the police would throw a cordon around the site and start grilling the temporary workers to find out if there could be a human hand behind this odd mishap.

By then a member of the medical team would quietly disappear amid the hospital crowd and whisper from a nearby payphone booth, "Mission nine – successfully accomplished".

Intelligence officer Dhillon was thoughtfully looking into a file. Several VIPs had died of accidents in rather mysterious circumstances within the last couple of years. The preliminary investigations had never suggested foul play, but the files were nevertheless passed on to the intelligence department for routine clearance. An alert deputy had collated several such cases into a master file and had forwarded it to the boss.

Dhillon had conducted an independent probe. While some of the cases were evidently stray incidents, a few others raised suspicions. Well aware of the histories of the deceased, Dhillon could guess they had personal enemies. He didn't mind pursuing a few cases further from contract killing angle.

But he was not inclined to buy the theory of a serial killer. What was missing was a common motive. Neither did the things fit into the patterns of any of the religious or political extremist groups under the intelligence scanner. Anyway, such gangs invariably boast of their 'exploits'.

"If there is a hand behind all these, it has to be His invisible hand!" He mused, with a snicker.

Well, not exactly! The invisible hand behind nearly a dozen such apparently disjointed events was of Nano, the leader of a deeply underground formation. No political or religious fanatic, the sole obsession of the leader and his foot soldiers was to 'deliver justice'. With profound anguish they had observed that many named and famed ones in the society were essentially criminals who make their ranks and fortunes by inflicting death and untold sufferings to the innocent. But the long arm of justice falls short of them, thanks to their money, power and muscle. It stirred the conscience of those excessively self-righteous people so much that they had taken upon themselves the task of delivering 'quick justice' through their chosen method.

Nano was their undisputed 'commander'. His innovative schemes could always make a mockery of the best laid protections. His superb information gathering network penetrated even the police and the intelligence. But most astounding was his time management, both at the macro and the micro levels. It earned him his nickname from the mates who would like to believe that his planning and executions were accurate to a nanosecond. They often wondered if this mystery man was an ex-commando.

Although having a bunch of followers not averse to die for their cause, the commander, however, never planned any suicidal mission. "We are very few and should spare no efforts to preserve ourselves", he would aver. He would undertake an action only after ensuring its success and doubly ensuring the safe exit of the operatives. Thanks to his computer-like precision, they had hardly any casualty so far. Opting for safety over fame, Nano would cover up their actions as 'accidents' – and well enough to confuse the best brains of the intelligence.

While suffering from no prick of conscience for eliminating their targets, Nano was not comfortable about the innocent lives lost in the bargain. Well, it's 'collateral damage'. That's

what the mighty nations call it, when they bomb the hospitals or schools of the hapless ones to smithereens! Try as you may, it can't be avoided altogether – the pigs seldom move alone!

No ideology, no mentor. But Nano often wondered if the man responsible for egging him on to this path of sin was his father, a modest but upright school teacher.

“Never lie,” he would tell Nano the child.

By the time he grew up, Nano realized that those who didn’t lie had all died or were going to. The living ones are of two kinds – one who admit they lie and the others who don’t.

“Poor old fool!” He would reminisce nostalgically of his late old man. “Didn’t know you’ll be skinned alive if you don’t lie!”

So he lied left and right and without any scruples, as he wanted to survive. And survive he did! But the “poor old fool’s” sermon had somehow left a permanent stamp on his disposition – he could never lie to himself!

And that made all the difference! It never allowed him to be normal – like everyone else!

But why are you riding the bandwagon of hate only? Can’t you love, man?

Well, didn’t he? It was a blossoming bud, the best thing God could have thought of creating that had filled Nano’s adolescent days with sweet fragrance.

She is no more. On a fateful evening and on her way back from college she just disappeared. Days later, her mangled body was recovered from a nearby ditch.

Completely shattered, Nano could keep himself going with only one mission in mind – to find out a name! With considerable trouble and risk, he did gather that. It was a dreaded gangster. He then just remembered the name – for years and years and till he became Nano!

That gangster is no more. It gives Nano a deep sense of satisfaction.

But does it give you peace?

Well, what’s that? – He replies to himself after some hesitation.

But careful as Nano might be, justice had ultimately caught up with him too. An hour ago he had received his death sentence. Ironically, it was not a jurist, but a doctor who had delivered it.

Nano had a persistent swallowing problem with occasional vomiting. Being in the life he was in, he didn’t bother to consult a doctor – until he couldn’t help it. After the routine tests, the doctor had finally given the verdict – it was esophageal cancer, in an incurable stage. With the usual pep talks he had urged his patient to fight and hope for the best. But Nano knew what to know – that he had another six months.

Nano was sitting alone in his room, trying to reconcile himself with the suddenly changed reality. Well, everyone must die. But he loathed the idea of moaning and withering away helplessly while his precious life oozes out without serving a purpose and this was

troubling him more than the occasional shooting pains near the stomach. Restlessly he switched the light on and drew the newspaper close just for some diversion. And next his eyes were glued on a small news item. Slowly adrenalin started flowing in his veins again and the lips curled in a crooked sneer.

He had hit upon a plan. As death was unavoidable, he would rather like to take someone along with, up to the bottom of the hell perhaps. And who could fit the bill better than Veerendra Joshi, the most powerful and dreaded politician of the region? Joshi, one of the most loathsome leaders, had engineered killing of hundreds of innocents with the help of his police and henchmen to consolidate his political power. But despite all cries of human rights abuse and the uproars to remove him from the positions of power, he was rather tipped to become the next prime minister of India!

A news clip had just given Nano the idea to realize as ambitious a plan as 'Mission Joshi'. It would be his final mission and for a change, it would be a suicidal one.

"There is only one life to live and only one life to die. Serve a cause with your body and soul." A voice reverberated.

"With my body and soul, dad!" He said, as he looked passionately towards his splendid person that still bore no sign of the death brewing inside.

Nano was lying on a hospital bed. Drips of 5-FU and carboplatin were flowing through his veins like hot lava. He would have to withstand this unbearable agony for another few hours. This being his first chemo, his oncologist had urged him to stay for a couple of days more in the hospital.

And Nano couldn't have asked for more. It was already on the news that Veerendra Joshi would come to inaugurate a new wing of the hospital the following day. Joshi – the worst possible enemy of humanity! Nano recalled the latest massacre his goons had orchestrated to terrorize people who wouldn't vote for his party. It was widely reported that when a pregnant woman had rushed out of the slum his marauders had set on fire and begged for mercy, the heartless killers had jovially slit her womb open and pierced the fetus to death before throwing the mother back into the inferno.

It would be a pious act if he could exterminate the kingpin of those fiends.

He had meticulously made the plan. The deadly substances were smuggled in two parts – a liquid, in the guise of his chemo medicine and a paste, in his shaving cream tube. Independently they are as docile as face lotions, but together they can blow off a tank. After getting himself admitted to the hospital, he had made some swift but in depth reconnaissance. The politician's convoy would pass through a well-guarded route. Even the windows and the balconies overhanging the route would for sure be manned by gun-wielding commandos. But ultimately the master schemer could find an Achilles' heel in that apparently invincible security shield. It was a sewage chute.

It was effectively the cover for some sewage pipes, but had barely enough leeway inside for a maintenance man to squeeze through. It could be entered through the small doors at the toilet blocks. The base of the vertical chute was close to the VIP's route. He would get inside it at the appropriate moment, descend till the base and wait for the entourage to pass.

There was a hole in the chute at that point. While excellent for keeping watch, it was unfortunately not big enough for a bomb to pass. It was an ideal sniper's post. But smuggling a gun into the hospital through the tight vigilance of metal detectors was no easy feat. A gun anyway is useless against bullet-proof cars and vests.

So he must assemble and detonate the bomb inside the chute! It would disintegrate his still magnificent body instantaneously, but won't spare his target either. Joshi's car would pass within handshaking distance of the spot and Nano knew the strength of his explosive well – only an anti-missile vehicle could have taken it face on!

But the success of the whole operation was on precise timing. He had to assemble, shake and detonate the bomb in perfect synchronization with the passing of the fleet. Over and above, he had to choose the exact time for entering the chute. It couldn't be too early lest his absence might be detected or he could get suffocated in the confine. But too much delay would mean that the security men would take control of the passages and possibly the toilets too, thereby spoiling the show.

Like the umpteen times before, time was again his adversary. But the immaculate Nano was sure that like the umpteen times before he would prevail upon it in his final mission too.

Thank God – they never consider a cancer patient, a poor soul, a suspect. That's why he could smuggle in the deadly substances without any hassle and could roam around so freely to gather information. But shouldn't it be just the other way round? Isn't any person condemned to death a potential suicide bomber, willing to take with him someone he loathes?

On a second thought, he realized the fallacy. A condemned person would cherish every moment of the rest of his life and would ill afford to lose even a single breath. Wouldn't he himself like to spend the remaining days in the company of his dear ones or in some scenic and tranquil abode of Nature? But well – he was making a sacrifice, for a cause. Would anybody ever appreciate how much he was giving up?

He had never been in a hospital before and he realized that too soon. He was surprised that a number of ladies and kids were wearing head scarves.

"They are chemo patients. You too would lose your hairs." A nurse answered to his query. Then she assured, "But don't worry, it'll come back once the treatment is over."

"They're just kids! Will they be cured?" He asked, in childlike innocence.

"We try our best and let's leave the rest to Him." She said dispassionately.

But Nano couldn't be that stoic. He couldn't forget the kids with the head scarves even during the agony of his chemotherapy.

By early afternoon, he was through. He was feeling pathetic, but still tried some walk around. He had to be perfectly fit by the next morning.

He saw a beaming housewife next to her husband, a middle-aged man who seemed to be recovering. "Dr. Mehta is God!" She said with deep regard. "He had virtually no chance. But the doctor operated, applied radiation and after six months of battle, he is cured and will go home tomorrow."

"But I have a headache." The man said sheepishly.

"The doctor had done the tests. Don't worry – he will take care of it," the wife assured.

As Nano proceeded along the corridor, he heard a muffled cry, and saw a man in white coat trying desperately to control himself.

"Do you have a patient?" Nano sympathetically asked.

"I've a lot. I'm Dr. Mehta. That man – I've lost the battle for him! Today I knew that the malignancy had reached his brain. How'll I inform the wife?"

Nano couldn't speak and just put a consoling hand on the doctor's shoulder.

Later in the evening, he once again heard some sobbing – an uncontrolled one this time, from a woman. He silently gestured a nurse who said, "Her son had swallowed twenty sleeping pills two days before and now he is –"

"Dead?" He asked with bated breath.

"Out of danger", the nurse smiled, "thanks to Dr. Desai and Dr. Prakash. The lady didn't shed a drop of tear for the last two days. Now she can't control herself anymore!"

Night fell. Trying for an early sleep, Nano tossed restlessly on his bed. It was his last day and it turned out to be a handful. First it was the hell of that chemotherapy that nearly consumed all his grit and determination. Then, it's this blessed hospital and the environs.

A fish out of water – that's how he felt!

He kills – and they save! All meticulous planning, dedicated efforts, heartfelt emotions here center around life and not death!

Not that he was ashamed for a moment. He did challenge the writs of man and God – but for the sake of justice. At the end of the day he could face himself without remorse and that's all that mattered.

But how he wished he could join forces with these people in white for a day! Pity – it's too late now!

As he looked into the dimly lit ward and the star-studded sky outside, he felt something strange oozing into his heart. Something he was familiar with in the long lost past – when he had family and love.

Peace? Why the hell is it tormenting him now in the eleventh hour – when the die had already been cast and when he was not destined to see another sunset?

They brought in a charred body, with several limbs blown off. The car driver! “Can you hold him for a moment while I fix the oxygen?” Dr. Mehta whispered to Nano, “He may still survive!”

“Sonny!” Now it was the anguished scream of his young mother. Shaken, he looked back to find that he had jumped on her lap with muck on his feet.

Nano jolted out of his sleep with beads of sweat all over. He must have had just a few winks, as it was only ten-o-clock. Reflexively he looked at his hands and feet and found them spotlessly clean.

He was clear to his conscience. He had lived his life for a cause and was going to die for one. Then why was he feeling restless and was being chased by the nightmares?

Body and soul for a cause – now there’s no going back from that! He affectionately caressed his flawless torso and the tanned limbs, possibly for the last time. Suddenly he was overwhelmed by an emotion he had hardly felt before.

With great efforts he regained composure. Time was running out and he had still things to do. Carefully examining the deadly chemicals in his possession, he ensured a safe separation. Next he silently inched towards the nearby public phone while avoiding the gaze of the duty nurse.

It was dawn. In the oncology ward a nurse was making her routine round before the shift change. Suddenly she screamed, as she saw a patient in a pool of blood with his wrist slit.

He was rushed to the ICU and after some frantic efforts was declared dead.

He had left a note, donating his body and the organs to the needy and had also left the contact numbers of the lawyers and the voluntary organizations to handle the procedures.

A shrewd manipulator of time, Nano was precise in choosing the moment in his final mission too. He was discovered when it was too late to save him but not too late to salvage his organs. He couldn’t have been more precise in choosing the date too. Another few days and the malignancy would have rendered the organs useless anyway.

“Poor soul – didn’t have the nerves to face an agonizing end,” lamented the doctor.

“But look at his face, doc.” The duty nurse murmured, “Didn’t he die in peace?”

## In Her Shadow

Barnali Saha

In our class of 1985 Tiffany Kraemer was an enigma: petite and dark, busty, athletic and satin skinned. All the boys were after her, and all the girls envied her. She would walk past us in the hallway after a class, her books neatly tucked under her arm, her gait dainty and womanly, and her skirt short and full. She never talked to us and we, in turn, hated her exotic looks. One of the girls started some nasty rumor about her and that rumor, like all high-school rumors, spread like wildfire, and one or two days later I found her after school sitting on the stairs crying like a baby. Naturally, I enquired. She told me of the rumor about how she and two of the boys were found in a locker room a week ago. "It is not true, you know," she said, sniveling. Her face was all red and wet, her nose dripped and she looked just like us – normal high school girls, no charm, no enigma, just a young woman with head full of day-dreams. Sitting on the stairs on that hot afternoon, Tiffany Kraemer looked more human than anything. And that was the day our friendship began.

Somewhere in the compendium of our lives Tiffany and I struck an unusual friendship. We grew closer and closer with every passing day, sitting next to each other in class, teasing boys, sharing secrets, partying, shopping and gossiping. We spent hours talking on the phone, and gradually she became an indispensable part of my imperfect life. She was all I wanted to be, a sum total of all my wishes and aspirations. She was like a butterfly to me: rich, beautiful and radiant, equipped with magical wings that would take me anywhere I wish to go. There she was filling my life with an alien curiosity of the kind I had never known; her colossal presence evoked memories of sunny Oriental public places, crimson sunsets and powder-like sand in deserts extending mile after mile in some luxurious country located in a different corner far, far away from my small town life, dirty linens and chapped dry hands. I drowned flesh and blood in the waves of imagination her iridescent company generated in my life.

I gave her a different kind of security, like physically being there for her, *with* her, when she needed my company. She, however, seldom shared the problems or tribulations that pestered her teenage life; instead, she just listened. Hours and hours of vacant ideas and daydreams were reported to her on a daily basis, and she listened to them over fries and sodas, over summer and winter, her face always peaceful and soft, angelic and sympathetic. My suppressed imaginations found words in her presence, and I began looking up to her as the incarnation of some divine spirit. The job of friendship became an ideal, a religious undertaking, and we exchanged solemn vows of friendship. The shamanistic aspect of our companionship made us the cool role models among our friends in schools, people looked at us and said, "Now that's the kind of friendship we don't see every day. These girls are like

soul mates." Tiffany and I loved to hear people talking about us. We began dressing the same way and doing the same kind of hairdos.

Soon, high school was over and all the madness and excitement took a back seat. Tiffany got into a rich private college in Chicago to major in Art History, while I went to a modest public college in Southern Illinois to study English. I wrote Tiffany long letters filled with my new-found college experiences – about the first time I smoked pot, about my cute and young English professor, and many more. She wrote back occasionally, notes written in perfect handwriting and measured in exhilaration. Her two-liners made my long blabbering screeds look foolish. I decided to stop writing. And just like that, the magic of friendship started to wear away bit by bit. Thoughts of my imperfections, my shortcomings and all the things I wished but could never get, loomed upon my mind whenever I chanced across the striking countenance of Tiffany.

It beat me how she had all the luck in the world; she had everything she wanted, rich house, rich parents, good clothes, better college, good looks, everything – and suddenly all this began to unfold before me like the clear light of day. The juvenile bond of companionship, that once seemed opalescent and full of wonderful promises, started to sting with painful intensity. I began dreading the summer holidays and the meetings with her where she would primly act like nothing had happened, asking me, "What's up in college?"

In the summer of my junior year I had a terrible fight with her. Small, even imagined, slights took on massive proportions, hidden wounds were exposed and I gave voice to all the hateful thoughts that had festered in my head; all my grievances found their zing, and I said things I never wanted to say. But I wasn't apologetic; by this time I was tired of her measured enthusiasm and her listening tactics. I thought she took me as a fool that always needed her superior enlightenment to be bailed out of inclement situations. Her prophetic comport sickened me. I gave full rein to my so-long suppressed belligerence. She looked astounded – a drop or two of her precious tears ran down her pretty little face. She didn't talk; she just listened to me, as always.

That summer I accompanied a couple of friends to hitchhike and Eurail in Europe. While traipsing down the streets of ancient Rome I met Tom, a young architect from Harvard who had come on his own to visit the relics of the historic world and be inspired. Instantly we clicked; he was just what I wanted – funny, cool, suntanned and dirty. We toured the environs of Europe together, sharing rooms and discovering the strangeness that encompassed us. He actually thought I was beautiful, he caressed my hair and kissed my face sprinkled with acne scars and blackheads. He showed me a different kind of world. It was a world sparkling beyond my humble Midwestern origin, my confusion; a world where security is a cracked and sinking vessel, a world where imagination and freedom sprouted like the

buds of spring, a world that I had been seeking a long time in the wrong places. And Tom lived in this world and he was willing to have me as a guest. I gave in.

Tom and I got married a few years after graduation and we moved to Cambridge in Massachusetts. Having completed his PhD at Harvard, Tom got a job at the university and we bought a small house near Lowell. Tiffany wasn't invited to the wedding; my mom thought I should have invited her, but I didn't want to stare at that face and be reminded of all I didn't get and will never get on my own wedding day.

After my marriage I took on the job of homemaking and gave birth to two beautiful daughters, Alicia and April. They grabbed a sizable portion of my life, and from the carefree, ambitious couple we used to be, Tom and I transformed into humble parents of the modern century. Often at the Harvard Square, as I window-shopped after dropping the kids at school, I would chance upon a group of young girls laughing and gossiping over coffee in some open air restaurant and I would remember Tiffany. I would remember the long summer days and orange pops we shared and how I had stuck out my colored tongue and said, "I have the bigger tongue" and she laughed, how we window-shopped in the mall and made a list in our little red scrap book all the things we wanted for our weddings. I remembered her yearbook quote: "Though with parting days friends may part and scatter, yet if hearts are loyal distance does not matter." I guess, distance did matter after all – for she never contacted me after my outburst and I never got to see her again in the next so many years that followed.

My kids began to grow and I lost track of time as I switched back and forth between mommy duties and caring for my house and my husband; my free time meant staring at the TV and watching Rachel Ray cook her easy 30 Minute Meals and trying them out in my kitchen, reading Good Housekeeping and shopping for the perfect furniture and accessories for the corners of my little house. My house became my life, and my family, my flesh and blood. The eccentricities of youth, which Tom and I thought were cool once, started to look less hot and more stupid. When we shared hearty laughs over our European trip and our erstwhile Hippie outlook of life, I embraced him and kissed him, and thanked God for giving me such a wonderful life and such a wonderful husband. During such moments I thought I was a fulfilled woman.

Ten years after I had bidden an accidental goodbye to Tiffany Kraemer, an email from Christine Holiday appeared in my inbox. Christine and I were somewhat good friends at high school and she was a bridesmaid at my wedding – a fact that had made her think that she was more important to me than Tiffany. She thought being my bridesmaid was like winning a battle over the exotic diva at school that she, like her other friends, hated. Christine and I often exchanged casual communications and shared our mommy-stories in our casual mid-afternoon Google chats. Her email declared with almost breathless enthusiasm that she had come across Tiffany Kraemer and that Tiffany had asked how I was doing, and she had talked

a lot about me and had given her my phone number. The last bit of information sent a cold shiver down my spine; I battled the instinct of getting up and disconnecting the telephone lines before replying to Christine's email. The very thought of hearing the soulful voice of Tiffany, once again, made me anxious and confused. I shut down the computer and took a nap.

The following day around nine-thirty in the morning the telephone rang. My husband, who was home, picked up the receiver and after a few affirmatives called out to me. "Honey, it is for you," he said. I knew who the call was from and I tried to act busy. "Tell the person to call back later. I am kind of busy," I said, making forceful pot-and-pan noises in my culinary lair. "Okay," he said, and a few moments later I heard the sound of the receiver being replaced. I tiptoed out into the living room and found my husband in the sofa with the laptop. "Your friend Tiffany called. She left a phone number. I kept the Post-It over there," he said without looking up. I went to the telephone stand and found a telephone number scribbled across a tiny yellow Post-It. I felt my heart pounding in my chest as I picked up the piece of paper, and then without giving it any further thought, balled it and threw it in the bin.

Tiffany called again the following day and this time I answered the phone. With my heart beating like wild jungle drums, I picked up the receiver. I was greeted by a corporate voice, put-on and over-courteous. It was Tiffany's assistant who said that "her boss" wanted her to call me, "So where is Tiffany?" I asked. To which she said that she would transfer the call to her office immediately. A moment later she picked up; it was the same soulful voice that used to fill my senses with an exotic delight, a voice that I had once heard every day but had somehow slipped out of my life for good but had once again come back with its lusciousness and unusual aura.

"Hello, Gracy," she said.

"Hi, Tiff. How are you?" I replied.

"I am good. How are you doing?"

"Good, good," I said, wishing I could pick all the happiness from my life, list them one after another and tell.

"How did you get me?" I asked in spite of knowing very well how she got my number.

"Christine Holiday gave it to me."

"Oh, okay," I said.

"It is really nice to hear from you, Gracy," she said and then waited a bit for me to reciprocate the same feeling. I didn't say a word.

"So, why did you call me?" I asked.

"You seem angry, Grace," Tiffany said.

"No, no I am not angry. Why should I be angry with you?"

"I don't know. But you don't sound happy to hear me."

"Of course, I am happy, Tiff!" I said trying to act a little graceful. A word or two later she told me why she had called me.

"I will be visiting Cambridge next week on a business trip and I was wondering if we could meet somewhere. It has been a while since we last saw each other and I miss you," Tiffany said slowly and then waited for my answer. I thought a bit and wondered if I should reply in the negative and end the matter here, but then I was more than curious about her and her life, how she looked now and what she did. I thought an encounter with her might be just the right thing to break the ice and kill my curiosity at the same time. May be we could rediscover each other and the bitterness would give way to happy friendship. I gave her my address and we decided to meet at lunchtime at my place on the Wednesday of the following week.

The rest of the days of the week went in a flutter. I was in a kind of dizzy with my head fraught with witty expressions and rebuttals that I would be using when I talked to Tiffany. I cleaned my house, got a new side table for my living room, dusted the furniture, pruned the plants in my little garden and lost a couple of pounds. After the children left for school and my husband left for the university, I spent my whole days wondering what the big day would be like. I wished Tiffany were fatter and uglier and wondered if she would notice my new hair color and the fabulous layers I had. I looked myself in the mirror and was pretty satisfied with my appearance. Finally, I thought that I had all the machinery at hand to turn down the girl who had always posed to be the superior version of me.

And then the big day arrived. I had the whole house to myself. The kids were at school and Tom said he would pick them up. Around ten-thirty in the morning, Tiffany's secretary called me to make sure my date with her boss was fixed and said that Tiffany would be there around twelve. I was ready a good half an hour before the designated time. I had put on a beautiful flowing summer dress, my hair looked all right, and lunch, which consisted of warm French lentil salad with smoked sausage, fish fillets *en Papillote* served with little new potatoes – steamed and tossed in olive oil and a little mint and fresh garden peas and chocolate mousse for dessert, was ready to be served on a dining table neatly decorated with candles and fresh flowers; expensive china and glittering silverware were laid out in perfect order. A bottle of champagne chilled in an ice bucket; tiny globes of sweat ran down the cool container. Altogether everything looked just as I had wanted them to look – perfect.

No sooner had the clock struck twelve than I heard a car being parked outside my house and moments later the door bell rung. I got up from the sofa, smoothed my dress, peeked out of the window and saw a shinning black Mercedes Benz parked right outside the house. I unlocked the door and greeted a woman dressed in a crisp gray designer woman's suit and high heels. Her face was smooth and shiny, her eyes dark and mascaraed, and her

thick hair was neatly done and fell in loose curls over her shoulders. "Grace, it is so good to see you," she said cheerfully enveloping my body with the smell of her expensive perfume.

"It is good to see you, too, Tiff. Come on in."

The woman walked into my house and looked around with modest curiosity. "Nice house, Grace," she said as she seated herself in the living room sofa.

"I am glad you like it," I replied, still inspecting the woman's appearance and forcibly trying to fight the whirlwind of thoughts that were gathering strength in my mind with every passing second. I handed her a glass of champagne and we began to talk. We exchanged stories about our lives; she told me that she had gotten an M.B.A and now ran her family business by herself, that her father had died five years after she graduated from college; I told her how I met Tom and then how I got married, moved to Massachusetts and had kids.

"But I thought you hated Massachusetts," she said sipping the cool beverage slowly.

"I did, but I don't any longer. It is actually nice in here. Tom likes it."

"I see," she said. We sat in silence for some time and I saw her looking around once again, as if forcibly trying to find out the hidden cracks and faults that lay underneath the sheer cover of dainty home décor.

At lunch she complemented me on my cooking. "You made all this by yourself, Grace?" she asked me, amazed, as she tasted the fish. "I didn't know you were such a good cook. You never cooked in college, did you?"

"No, I didn't, I hated cooking then, but now I love it. People change overtime, Tiff," I said.

"Yeah, I see that. But you still look the same," she said tilting the glass toward me and raising her eyebrows, a jovial smile on her lips.

"Enough about me, what about you? How is life with you? Are you engaged to somebody?" I asked leaning back on the chair.

"No, no. I haven't found my Mr. Right yet," she said laughing. "It seems all good men are hooked up," she replied.

"What happened to that guy you were dating in college – what was his name? Rob, yes, yes, Rob. What happened to him?" I asked.

"We broke up after college. I guess he wasn't good for me," she said.

"So, are you dating now?" I asked, casually.

"Yeah, sort of. I met this man the other day and we are, you know, going around."

"Oh, good," I said.

"Tell me something, Grace: what is it that you do except homemaking?" she asked me looking straight into my eyes.

"Tiff, I have two kids. I got no time for a career."

"You can never be too busy for a career, Grace, it's just a matter of choice," Tiffany said sipping some more champagne from the glass until the glass was half empty.

"Yes, I guess it is. I guess I choose to be a family woman unlike you..."

“Unlike me? What do you mean unlike me?”

“Look at you, Tiff, you are in your thirties and you haven’t got a man in your life to stay with you.”

“May be, I choose to be alone. May be, I feel more comfortable being myself than being somebody’s wife and taking care of his kids.”

“Well, that’s just nonsense, Tiff.”

“Nonsense, why is that? Why do you think that all people choose to be like you? Tell me something, Grace, what have you got against me?”

“What have I got against you?”

“Yes, what have you got against me? Ten years ago you walk out on me for no good reason and now, years later, when we meet you are being this jerk.”

“So, now I am being a jerk when you are the one in designer clothes spouting career advice.”

“I am sorry, Grace, if I had upset you. I was just trying to make a conversation.”

I stared at her for a while. “I think you should leave, Tiffany.”

“Very well,” she said and got up to leave.

“It was nice meeting you, Grace. I wish we had a more happy time.”

As I saw her black Mercedes reverse and then head out of the parking space, I felt a dough of stiff raw emotion formulating in my stomach and then rising painfully to my throat and blocking the nerves and channels in my mouth. I wondered what my career actually was. I cooked and cleaned and watched TV and prepared dinner. That was all I did. I had no profession like Tiffany’s, no income or inheritance like her; all I had was this household. I wish I had told her that in terms of effort and management, I am far better skilled than she was; that I didn’t need an M.B.A and an expensive business suit to announce what I did. But I couldn’t even get myself to believe that; instead, I saw all the failures and wrong decisions, all my mistakes clouding over my eyes. I had no wise rebuttal planned in my head to rescue me from my shame. I realized that, all these years later, this woman – who had once been a better and superior version of me in high school and college – had ruled me out in terms of luck, once again. I was a plain old *hausfrau* who would wrinkle and age over time, while she would inject Botox and smooth out her lines. She would enjoy hot Oriental beaches while I would sink deeper and deeper into the cold snowy floors of Lowell and one day die and annihilate once and for all. I realized that even though she was gone, I would stare out of the window at the gravel-laden path and wonder what it would be like to be a powerful businesswoman like her, drive the richest car and sip the richest wine. I would cook and clean and do my chores wondering what it would be like to live her life. I knew that while she would spend her days living in the shimmering lights, I would quietly live mine in her shadow.

## Violin

### Gigglananda

The radium dial of Romanath's wrist watch indicated it was half past eleven, another half an hour to go for Christmas. He liked the melody of the beautiful orchestra emanating from the adjacent church. On the south corner of the church there was a huge lake. A man-made jogging track encircled the garden like a garland. On the other side of the track, thick bushes, shrubs and trees stretched as far as the creek. Entrance to the joggers' park was closed at 10pm. But it being Christmas Eve, the entrance would remain open until the midnight mass got over.

It was a little cold. But Romanath liked winter. Of course, in Bombay, the winter hardly produced much effect. Romanath was a software engineer working for an American company. The park was Romanath's favorite place. Often he visited the park for an evening walk. He stayed nearby, in a rented apartment.

Though the park was open to the public, Romanath did not see any visitor. Obviously, people were thronging inside the church. Romanath walked on idly. Suddenly some beautiful music alerted him. It was different – a solo violin, and not coming from the church. Someone was there, playing a violin. Following the music he came to a bench overlooking the lake. There was the musician, a man, engrossed in his music. He did not notice Romanath occupying the other end of the bench. Although the jogging track had lights at regular intervals, the man's figure was not clearly visible, as at this part only a very faint light reached from the nearest lamp post which stood some distance away.

“Hello!” greeted a voice.

Romanath started. He was so absorbed in the music that he did not even notice when it stopped. It was the musician who greeted him. He had laid the instrument beside him.

“Hello! It is superb. I don't know how to compliment you.”

“Thanks. I can read your feeling.”

“Er... Looks like you are a professional violin player. I mean to say, the kind of mastery you have. I do not understand much about it though.”

“Sort of... Though violin is not my profession... Ha-ha! Do you play any instrument?”

“I do play guitar and harmonica. Music is my obsession - though it is absolutely my hobby. I have never given any performance except in college functions, you see. But music takes me to some other world.”

“How true! It is really otherworldly. Who knows, you may become a musician yourself one day. You never know what hidden talents you have.”

“My name is Romanath Mazumder. Do you stay nearby?”

I am Durgaprasad. Well, I do not stay nearby; I am coming from rather a far off place. Why do you ask that?"

"Honestly, after listening to your music, I was toying with the idea of learning the instrument from you. I stay here, a kilometer away. But since you do not belong to this area..."

"I can understand your passion for music. Though I am not in a position to teach the instrument to you myself, I can give you a proposal if it suits you."

"....and what is that?"

"See, as I told you, I don't belong to this place and I have to leave shortly. I intend to leave my instrument to you as I am not in a position to carry it with me. This instrument has a magic which you will get to know later. I suggest you get hold of some violin player; I am sure you will come across one, who can teach you the basics. Then you will be in a position to manage on your own. You have the talent inside, and the instrument has its own. The duo will work out nicely. Tell me, is it acceptable to you?"

"But how is this possible? How can I accept this from you?"

"Look, take it this way. At the moment you are doing me a favor. This is a beautiful, rare piece of instrument which I just can't afford to lose. Try to find out its present market value from a music dealer and you will get to know. Such an instrument is hardly available these days. It will remain safe in your custody and will be utilized properly, I know."

"This sounds all the more impossible. How can I keep such a valuable thing with me?"

"Look, Romanath. At the moment I am in a mess and not in a position to discuss things in detail. I assure you that I will visit you again and tell everything – but not at the moment. It will give me a lot of peace if you keep it in your custody and use it. Please do not hesitate. You are a gentleman, I know, and precisely that is the reason I can leave it to you happily."

"Are you in... some kind of trouble? I mean, if I can be of any help..."

"Thanks much. At the moment it would be of much help if you accept this and use this."

"Very well, if you insist. But wait.... let me give you my visiting card so that whenever you want, you can come and collect your belonging from me. I assure you, being a music lover myself, I will take good care of the instrument. And... yes, if possible learn it too."

Romanath started groping for his visiting card. But he realized he had forgotten his wallet at home. The cards were inside his wallet.

"Sorry, I have left my wallet at home where I had kept my cards. So please note down my cell number. If you give me a ring I will tell you my address."

"I have no pen or paper with me. Don't bother; we will meet somehow."

"Normally I come here for evening walks on alternate days and weekends."

"That's great."

The church bell struck twelve. Durgaprasad got up.

“I think we should part now. It is quite late.”

“Yes I suppose so,” Romanath said, rising up. “Thanks for your beautiful music and this.” Romanath indicated at the violin.

“My pleasure. Thanks for your support. Good bye.”

Durgaprasad waived at Romanath and left.

Romanath picked up the instrument and the bow with care. It gave him a feeling of joy. An instrument which can produce such a beautiful piece of music. Romanath had heard violin many times before. But the sound of this instrument was something different. He decided to learn the instrument.

Sudden work-pressure at the office made Romanath forget everything for a couple of weeks. He had to go on a tour also. After many days on a Saturday at noontime he suddenly remembered about the violin which he had packed nicely and kept in a cupboard in his bedroom. He opened the pack and saw the instrument in broad day light. It was made in Italy, the famous violin making country. He thought of getting its valuation checked as suggested by Durgaprasad. As such he had nothing much to do at home; he set out along with the violin.

His head reeled when a few shop keepers gave a very rough estimate. This ancient piece would cost nothing less than a crore, minimum. Some experienced shop owners even asked him from where he procured such a rare piece, saying that he should better try to put it up on auction. Satisfied, Romanath returned home purchasing a beautiful case for the violin and learning about its upkeep.

About a week's enquiry here and there for a good violin teacher brought Romanath the reference of a good music artist and teacher, Seshagiri, who used to play in the radio and television once upon a time. He came to know about him through one of his colleagues whose father was a friend of Seshagiri. He lived about 14 kilometers away from Romanath's place at Chembur. Romanath decided to ring him up before visiting.

“Hello, am I speaking to Mr Seshagiri?”

“Speaking,” answered an aged voice.

“Look sir, I have a very good piece of violin and I want to learn to play it from you. I have heard about your fame and proficiency in violin from Sudhir, my friend. Sudhir Desai.”

“Sudhir... Oh, yes, Krishnakant's son?”

“That's right sir. I would like to come down to meet you along with the instrument.”

“Well Mr...”

“Please call me Romanath.”

“Well, Romanath, I have stopped giving tuitions because of my age. Now I play at times only for my own satisfaction. Sorry, my health does not permit to take the strain of giving

tuitios. And my way of teaching was quite different and hence strenuous. I used to toil for hours together behind serious students and I used to take only a few and selected students. So you understand now, why I can't accept your proposal."

"I see. I am sorry to hear about your problem. But if you kindly permit me, I would like to show you the instrument. It is a very rare piece. Perhaps you would like to play it once and I would love to listen to your music."

One Sunday afternoon Romanath visited Sheshagiri. He lived with his family and two grandchildren in an apartment. It was quite spacious. The elderly gentleman received Romanath in the balcony where he was sitting on a *jhula*. He was clad in white pajamas and *kurta*, and wore golden framed glasses. His hair was totally white, neatly combed. Next to their building was a big garden with quite a large number of trees. This made the entire ambience very good and apt for music, and so did Sheshagiri's personality, too. Sheshagiri mentioned that it was there that he used to teach students. Romanath handed over the instrument to him.

"Oh, god! It is a dream instrument! Made in Italy! I can't believe I am holding such an instrument in my hands! Where did you buy it from?"

Romanath narrated the incident in a nutshell.

Sheshagiri tightened the bow, tuned the instrument for a while and started playing *Dhrupad*. In a short while both of them went into a different world. The music lasted perhaps for an hour.

"I can't refuse you. Just for this instrument I can't refuse you. It is amazing. Though I must say I can only give you time on Sundays."

Meanwhile Sheshagiri's wife had brought cold drinks for both of them. She also joined in affirmation that the instrument was really very good.

Romanath's tuition started from that very day. He decided to pay double the amount of what Sheshagiri usually took as tuition fee. Romanath considered it a great blessing that he could get in touch with such a good violinist, so apt for the instrument too.

#### *Four Years later...*

Romanath had become an expert violinist. He managed to give a few public performances that Sheshagiri had arranged through his contacts. Sheshagiri expressed his belief that Romanath had the talent. Romanath was also approached by a well-known Recording Company. After a few months his first album came out and it was very well received in music world. Sheshagiri's health deteriorated. He suffered from gout. Still Romanath paid a regular visit to him, and when health permitted Sheshagiri would sit with the violin. Often the duo played *jugalbandi*. Romanath felt perhaps it was the most ecstatic moment of his life when he was able to play with his master. However, stage performances with Romanath were out of the question for Sheshagiri. Meanwhile Romanath received invitation from some music lovers from London. He was nervous, but Sheshagiri forced him

to accept the proposal. A visibly tensed Romanath went to his first abroad trip as a violinist along with his small group of musicians. The venture was successful and he was well received by the audience.

Upon returning, Romanath resigned from his company. Violin had already become his obsession by that time. Almost whole day he played. His parents in Kolkata were anxious to get him married. But he was addicted to the violin.

*Ten years later...*

Romanath had become a famous name in the world of music. The film industry in Mumbai knew Romanath very well, as he composed the background music to quite a few films which became a hit. Sheshagiri was no more.

Money and fame poured in. Romanath stayed at Devlali near Nasik, in his own huge beautiful bungalow along with his aged parents. He kept on postponing his marriage; his days and nights were mostly spent with the violin. One thing he realized that though he had the talent and expertise of playing the violin, he could not play just as well on any other instrument. His own instrument really had some magic. The moment he picked it up, the bow started moving – as if on its own – on the strings. Many a times Romanath had experienced this.

It was a Saturday night. Romanath was alone, playing his violin sitting in his garden. The water fountain behind him, emanating from a beautiful Venus statue, provided the background music. The whole house was dark, which meant his parents were asleep, household helps retired. Only two faint lights barely illuminated the surroundings, one that streamed from his bedroom, and the other, that alight at the security cabin near the main entrance some distance away. The night guard Jhundu was on duty. It, being the month of December, was rather cold outside, but Romanath enjoyed it. He was trying to compose a new song based on *Kafi*.

“Good evening Romanath-ji.” A voice almost frightened Romanath. “Do you recognize me? Durgaprasad?”

In the fraction of a second Romanath recollected him. Standing in front of him was Durgaprasad, the owner of the violin.

“What a nice pleasure Durgaprasad-ji. Please do sit down.”

“Thanks. Tell me how things are going on? I understand that you have become a famous violin player now?” muttered Durgaprasad occupying a seat near Romanath.

“Well ... May be... yes. Thanks to your instrument and my guru.”

“It is nice that you have the heart to acknowledge. Such qualities are becoming so rare these days. I came to meet you as I had promised. Today I would like to share some thing which I could not the other day.”

“Okay Durgaprasad-ji. But let us go inside the house. It is cold here. We would have some coffee. Have you taken your dinner?”

“Don’t bother Romanath-ji. It is nice out here. Please do not bother about anything. I am full. Today just let me talk to you.”

“But you have come after such a long gap. And that, too, coming to my house for the first time. How is it possible that you will not come inside? By the way how did you get my address?”

“Well, it is not difficult to collect. You are a famous person now Romanath-ji,” laughed Durgaprasad. “I am perfect here; please do not bother about petty things. Our world... Our world of music and musicians are different... isn’t it?”

“As you wish Durgaprasad-ji, but you are a very insistent type, I must say.”

“Ha-ha-ha... But that is for your good only, isn’t it?”

“Have to accept that.”

“Well then. Let us start. Now I will tell you about this instrument... Its story, I mean, and my story, too, of course. Tell me, have you – over all these years – managed to discover the magic in the instrument?”

“Yes, very much. As if the instrument guides me, or rather the instrument plays on its own. Even Sheshagiri-ji, my master, mentioned the same.”

“Precisely. See, this piece is more than 250 yrs old. My great-grandfather used to play it. Generation-wise it was being handed over to the descendants and I learnt to play from my father. It was made by Antonio Stradivari, the world famous violin maker. In fact, at present, it is worth a few crores. My great-grandfather was very fond of this instrument. He was a chieftain at Parichhatgarh near Meerut. We were Gurjars. I am talking about 18th century. He was very fond of music and dance. I admit he had other vices also. He learnt violin quite at a late age after crossing forty. I heard that he received this piece as a gift from one of the British officials in return to some favor done to him. My great-grandfather became very efficient in playing the instrument, and it became almost like an obsession for him, just as it has become for you now. He played it for ten years, when he was killed in a duel.

“My grandfather learnt to play from him. After my great-grandfather’s demise, my grandfather had become the chief; he was a big hunter but inherited his passion for music from his father. During those days, as you know, music and dance were very common and practised in palaces. My grandfather became a master violinist at quite a young age, around thirty. He started teaching my father while he was a small child. However, my grandfather could only play the instrument for ten years before his life ended suddenly. Once he was out for a hunting game. He killed a tiger. But he was mistaken, as the animal was badly wounded, but did not die. It was twilight. Thinking the animal to be dead, he approached to have a look at it. The tiger pounced upon and badly injured him. He was rushed to hospital which was quite far off, but it was too late.

“My father had two half brothers, but being the eldest, he became the chief. Sadly, the property and the seat became the bone of contention. It was around 1920. I was in the UK

for my studies. Posts from my father revealed his mental stress as my other uncles were conspiring against him. This violin was his only solace, he used to mention. I finished my education and returned home to remain with my father and assist him. The situation had turned very hostile by then. My uncles and their team had really made our lives miserable. Finally they managed to kill my father. He was poisoned while I was away for some business to British Capital, Calcutta. It was 1930. My father had played the instrument for ten years.

“Rushing back home, I had to take care of a lot of things including my mother who could not bear the shock and became bedridden. Hiring some British lawyers I tried to settle the dispute. But it was not so easy for me. My uncles had built up a strong team and forged documents to prove that they were the rightful owners of the sovereignty. Two-three years went like that. Meanwhile I lost my mother. Constant tension made me turn to the violin one day, which though I learnt to play at a young age, I never pursued later as I went abroad. I had rediscovered it in my father’s room, and started playing it. To my surprise, after a few days of practice I found that I could play it well. Music was in my blood. Slowly the violin became an obsession. By that time I grew a little accustomed to our territory related issues and was able to build up a strong team. I was then determined to teach my uncles a lesson even if it meant killing them. However, I did not have to reduce myself to such a level. My spies managed to collect all information from them and recover all the original documents at gun point. They were sent to jail for further trial. Happy with the developments, one evening I was sitting in my palace garden playing the instrument. Suddenly a thought came to me like a flash. Right from my great grandfather, whoever played this instrument, everyone got obsessed with it. But each one of them could play it only for ten years. Was it a coincidence? I could feel that I was addicted to the violin. And I realized that by then I, too, had completed ten years of playing it. I had started playing it from 1932-33 after my father’s death, and it was then the end of 1942.

“But before coming to that part I want to tell you something else, Romanath-ji.”

“Yes?”

“You have completed ten years of playing the instrument. I have a request for you which you have to keep. After all, this instrument is our ancestral property.”

“Sure.”

“You have to destroy the instrument. I cannot do it myself, hence the request to you. You have to do it for me.”

“What! Destroy this beautiful piece? For what? Just for a few coincidences? All those incidents had nothing to do with the instrument. They were just your imagination Durgaprasad-ji. Of course, it is your property and I have to hand it over to you as I was only the custodian. But I am willing to purchase it from you at any price you quote, though I know it is priceless.”

“That is not possible, Romanath-ji; else I would have suggested that to you already. The incidents which you think as coincidence are not; they are facts. And it is also a fact that the instrument plays on its own, it has some force working through it. It is the force of my

ancestors' souls who were obsessed with it. And their spirits are hovering around stuck in the attachment for this instrument. There is no other way but to destroy it. And you don't understand that your own life is in danger, Romanath-ji. I can't let that happen. You are young, a talented musician. You have a long way to go in the world of music. You have much to contribute to the musical world."

"Look, Durgaprasad-ji. I understand your feelings and your concern for me. Perhaps, as you think, the incidents that happened in your family had some connection with the violin, agreed. But I do not belong to your family. This instrument is in no way going to harm me. Not at all."

"Romanath-ji, try to understand. It is not regarding ancestral lineage. What I mean to say is, this particular instrument is cursed. It is cursed that whosoever played it would die in the next ten years. Perhaps it all started with my great grandfather who was greatly attached to it."

"How can you say that? You said that you played it for almost ten years. And you are still living."

"I AM NOT, ROMANATH-JI... I AM NOT A LIVING BEING... WHAT YOU SEE IS JUST A REPLICA OF MY PHYSICAL BODY WHICH I MATERIALIZED FROM THE ETHER IN ORDER TO REACH YOU... MY SOUL, JUST LIKE MY ANCESTORS' SOULS, IS HOVERING AROUND, ATTACHED TO THIS INSTRUMENT... I DIED IN A ROAD ACCIDENT IN THE MONTH OF DECEMBER 1942... THERE IS NO WAY OF OUR ASCENSION OTHER THAN DESTROYING THIS INSTRUMENT WHICH IS OUR ATTACHMENT..."

Guard Jhundu discovered Romanath's body early next morning lying in the garden, dead. The violin was beside him destroyed, shattered into pieces. It was 25th December.

## Tall Lives

Shomik Banerjee

*“Papa, please don’t come to drop me. I will walk to my class by myself.”*

*My hands froze on the lock of the car door. As I heard those words, they turned me to stone. Why was he avoiding me? I looked deep into his soft eyes. My heart skipped a beat. It was a moment of defeat.*

*“Ah, yes! I see my son has grown up. Go along and have a nice day!” I recovered quickly, clutched his small hands and kissed him before letting go. The smile in my face hid whatever was racing through my mind, my thoughts for a three-year old.*

I looked up from the letter I was reading, thinking about the fateful morning I had been summoned to my parent’s room. The normally cheerful atmosphere wore a serious look and made me uncomfortable.

“Hi, Ma. Hi, Pa.”

“Hello.” And, without any further reception, my father blurted out, “Prithwish, these are letters from your real Pa” – handing me a bunch of faded letters.

“These are dated 22 years back,” he said.

“My real Pa?” The words came out as question, shock and surprise.

“Yes. Please read them before we speak about these further.”

*Prithwish’s walk to the school gates seemed to take ages. He did not turn to wave back. I did not know what my child was thinking, but I realized that the battle had just begun. This world seems to have made our normal son see abnormality in his parents. He has grasped the difference between this world and that of his parents. Our struggle has just begun to be accepted. We will not give up so easily.*

As I turned to the next letter, the man whom I called Pa until this day said, “You may not remember this; through a series of incidents that took place, it struck your parents that their abnormality could have a severe psychological impact on your mind. They asked us for help. We were happy to oblige, as we couldn’t have our own child.”

I saw he was struggling with his emotions while revealing this. My mind was numb. I bent my head down to read further.

*Anant, giving away Prithwish to you and Deepanjana is not easy for us. But we realize that this is the best to save our child from what he considers his humiliation. We will not be the reason for him to be ashamed. I am sure that one day he will come to terms with our so-called abnormality and accept us as normal people. As I give away my child to you, I pray to God not to let this sacrifice go waste.*

It all sank in. For the past few years, I was made to interact with the dwarf community in California. I would have questioned my parents’ reasoning on this, had I not genuinely appreciated the ‘little’ people’s efforts to be productive members of the society and felt a

soft corner for them. Perhaps, now I know ‘why’, the reason Pa had forced me to be an E.N.T. specialist, since the children with dwarfism often suffer from a greater susceptibility to ear infections and hearing loss than average-sized children.

“It was all meant to save you.” This time it was my Ma speaking, “You were too young to understand then. But we did try to make you appreciate this aspect, which cannot be altered. We tried showing you and making you understand that dwarfs are not jokers to be seen in a circus or a movie, but are real people with a mind and personality of their own. They are meant to be respected and treated with dignity just like any other human being.”

“Can I meet them?” I asked, in a rush.

“Yes, we are leaving for India tomorrow. Anil has not been well for some years. Now his condition is serious, your Ma had called up to inform us,” she said with sincerity. I couldn’t help wondering how she felt revealing the reality of my situation to me.

The woman in front of me, my real mother, is sitting up late night personally replying to all the letters that have come.

“Ma, please get some rest now. I will take care of the letters,” I offer, as I sit on the floor next to her couch.

“I want to do this myself, Prithwish,” she says, with a sad smile but an air of finality that leaves nothing to be debated. Only a pall of silence hangs in the air.

“Anant says your father was a giant who stood like a pillar against all diversity.” I can hear the cheer in her voice as if she is in complete agreement.

“He was really a giant, your dad.” Her voice was full of pride.

“Yes. He really was,” I agree, as she goes back to replying to the letters, leaving me to the thoughts which I have deep inside me.

I distinctly remember the large, round face with a big forehead with a mismatched, or rather awkwardly fitting, small pair of eye and a flattened nose above the thick lips. A bright smile had spread across his face when he saw me.

“I am not going to lose to this disease so easily – at least, not when I have you beside me;” he had said and put a brave fight; a fight only great Samurai warriors are capable of. I had hidden my tears seeing his smile.

*Anant and Deepanjana are your real parents. You acknowledge us today because of the upbringing they provided. We gave you birth, but they made you human. You respect life today. I am sure, in another life – if there were ever one – we will fulfill our duties towards you completely. We owe much to them and to you, but I would ask you a favor: just help those that are not ‘normal’ in the sense of this world, to bind their family together; don’t let them do what we did to you because of our own weakness. I don’t want that anyone else should have to bear what we had faced these long years without you...*

*We could have lived in anonymity forever, but I have this little queen in my life, your mother. She is the life force who dared me to face all the odds. The strength to give up our*

only son for his future well-being was derived from her. We have taken care of each other until this day. But now, when I am to leave, I want you to not only take care, but also give her the respect and dignity for which we have fought all our lives. I leave my little queen to you.

As I read this last letter from my real Pa, my head instinctively goes and rests on her knees. The writing stops and her hands ruffle my hair.

"He is still here, with us, between us. He shall always be," she says, in her soft soothing voice. In those words I sense his victory, their victory.

ନୟନ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟରେ

**Editors' Note:** Kudos to Shri Banerjee for highlighting an important issue through his story.

Dwarfism is a medical/genetic condition characterized by short stature – technically, an adult height of 4 feet 10 inches or under – in both men and women. This condition may be attributed to one of >200 conditions, most of which are genetic. The most common cause of dwarfism, accounting for 70% of all cases, is called achondroplasia, followed by spondylo-epiphyseal dysplasia congenita and diastrophic dysplasia. Achondroplasia often occurs in families where both parents are of average height. In fact, 85% of children with achondroplasia are born to average-size parents. On the other hand, even when both parents are achondroplastic, there is a 25% chance that their children may inherit the non-dwarf allele (form) of the gene and be average-sized.

To refer to persons with Dwarfism as a group, such terms as dwarf, little person, LP, and person of short stature are all acceptable; but 'midget', a throwback to an earlier era, is considered offensive. Individually, of course, most little people would rather be referred to by their name than by a label, just like anyone else.

Dwarfism is a condition, not a disease that requires a 'cure'. Majority of LPs have normal intelligence, and enjoy normal life spans, and reasonably good health. However, many require surgeries or other medical interventions to deal with orthopedic or secondary complications. Otherwise-healthy LPs can participate in swimming and cycling; however, long-distance running, contact sports and other activities that can potentially put significant pressure or impact on the spine are medically discouraged.

Answers to various questions on this issue may be found at the informative website ([lpaonline.org](http://lpaonline.org)) of the advocacy group, Little People of America (LPA), which has, since 1957, provided peer support, social and educational opportunities to thousands of individuals with dwarfism and their families. To put the facts about LPs into perspective, the LPA is comprised of >5000 individuals with >100 types of dwarfism, their families, a medical advisory board, and other friends and professionals. It counts among its community LPs who are teachers, artists, lawyers, doctors, accountants, welders, plumbers, engineers and actors, representing every nationality, ethnic group, religion and sexual orientation – with the common feeling of self-acceptance, pride, community and culture. LPs are single and married, with families with spouses, parents and children who are average size and dwarfed, biological, and adopted.

## The Cleanliness Drive

**Subhobroto Mazumdar**

I was supposed to see Asha Oberoi smiling at me as she used to do in college; yet the only thing that was looming before my eyes was the disgusting face of my boss DK with his python-like smile. Nobody has ever seen a python smile other than Ruskin Bond. Yet, sometimes a python and my boss melt into one and the same entity, as was happening now.

This wasn't expected to happen and I was supposed to have dreams that would make me happy, at least temporarily (like Asha Oberoi smiling at me); yet the cocaine tablet wasn't having any effect, although it did have a familiar taste. It was an experiment devised by Roy – he had procured three tablets of cocaine from somewhere and distributed them among Ravi, SP and myself. He wasn't to take one as he was there to note down the effects of cocaine on each one of us. Half an hour had elapsed and yet there wasn't any feel good sensation in me; only my boss and his thrashing during the past week were repeating themselves like the newsreels of *The World This Week*. Suddenly all my dreams got jumbled up by the shrill siren-like voice of Ravi breaking into his characteristic *Saharanpuri* abuses. Even he wasn't having happy dreams. Roy was busy meticulously noting down the barrage of abuses and other effects of cocaine on Ravi, when SP too joined in the cussing – and all of their volleys seemed to be targeted towards Roy. They had jointly discovered the fact that the tablet wasn't actually cocaine but an antacid tablet – and that we had been collectively duped off five hundred rupees for just three tablets of Gelusil.

The experiment was adjourned and was given a status of inconclusive, and we set off for the marketplace for the daily dose of eating junk food and watching girls, something that diverts our mind off the ordeals of the week and keeps us happy, at least temporarily.

It had been almost six months of our stay in this bachelor accommodation in Jorhat and we were gradually coming to terms with the ups and downs of life in this foothill city. Life had fallen in some sort of routine track, where, for the five days of a week, we got pounded daily by office work, fired by our bosses and bullied by our staff – and then, from Friday evening to Monday morning, did whatever we could to recuperate, rewind and replenish ourselves to bring our energy level up to a ground state. This cocaine experiment was part of that rehabilitation process that, however, had gone hopelessly awry.

Roy was probably in the most pathetic state among all of us. Throughout the week, he had been appointed as a duty officer to some foul-tempered senior visiting dignitary, and his basic job profile consisted of leading the said dignitary to the toilet, getting his dressing gown, finding out if his bed sheets had been ironed and explaining to people that this fellow wasn't smoking in a No Smoking Zone but just chewing a pipe devoid of any tobacco just to show off his importance. This he endured for the first three days of the week. Then, on the fourth day, he turned up in sunglasses reporting an attack of severe conjunctivitis and was

sent back immediately on forced leave. From then onwards he stayed at home, in a permanent sort of sulking mood, trying to figure out whether he should give up his job or tear up his M.Tech Diploma in Applied Geology from the University of Roorkee.

It was probably the effect of his downcast frame of mind that made Roy suddenly realize that our accommodation was in some sort of filthy state and that weekend should be spent to clean it up. It was true that our rooms were getting dirtier and dirtier by the day; it had ultimately reached a level that where even Roy – who had the privilege of being unanimously considered the dirtiest among us – had realized that the house was filthy enough to require cleaning. So, that evening at dinner, when he expressed his opinion about our house looking a bit dirty, everybody at the table felt that it really was high time to get our accommodation cleaned.

However, this was not the only factor that triggered our decision about tidying up. Also added to this realization were the orders of the retired major and landlord of our house who lived across the street. He had somehow firmed up a conclusion that it was easier for him to live in any “bloody battlefield than beside our damned house, and given any damn chance he would really pack his bags and head off to any damned war in any damned country rather than living across us as our damned neighbor”. Anyway, we cared a damn for him until he began accosting us on our way to and from office and lecturing us endlessly about the art of cleanliness, about how we lacked discipline, about how really and utterly hopeless we were, how our lifestyle was shattering his mental peace, and how given a chance he would set us straight within a day or two – and many other such things which were likely to make even a dead man get mad and bored and walk away from his grave. Fraught in all these sermons of discipline and cleanliness were also the age-old woes and anguish of an old, antique, primitive man that we were a generation wasted and rotten, and how things, so beautiful, principled and flawless in their time, were fast deteriorating, since our generation began.

The major was not alone. There was his dog, too, that added to our distress – a terrier or something like that, of a foreign pedigree with an eternally gloomy and sad face bearing an expression of perennial disgust about everything he saw around him. Somehow its looks had always appeared familiar to me although I could not place it properly to any particular individual. It was only on my last visit to a conference in Kolkata that I realized that my erstwhile guide in IIT also wore the same look in his face whenever I saw him.

Anyway, my guide may be left alone to rest in peace, but both the major and his dog shared a common dislike for us and never hesitated to express their displeasure whenever we met – only the dog did it in a more vocal and a more violent way. Every evening and probably in the early mornings too (we never got up that early to see early mornings) the dog took the major on his walk and on his way back relieved himself on our lawn and then barked aloud to declare his achievement. Anyway, this had continued on for quite some time without any apparent effect, until that evening, when things reached a flashpoint after we had to withstand a whole hour of the major’s gruesome and tiring lectures and his dog’s

disgusted looks, that left us with a lot of insights about our being hopelessly idle and utterly dirty and also a temporary loss of appetite for junk foods and watching girls.

The next morning was a Saturday and like all other mornings breakfast was a horrid affair of bread, butter and jam. The shop that provided us breakfast probably knew of no other edible configuration or incarnations of bread; sometimes it appeared that most likely we had the distinction of being the greatest end user of bread in Jorhat or probably Assam or perhaps the entire North-East India. Long ago, during our school days in St. Xavier's, it was mandatory for us to recite a prayer that went like "Our father in Heaven... Give us today our daily bread". Now, I am not a firm believer, but had never expected that these lines would turn such horribly true. Next time, if I were to be given a chance, I would ask to be allowed to recite it as "Give us today a different version of bread".

Anyway, the happenings of the previous day prompted us to conclude at breakfast that our house needed to be cleaned that weekend. However, right there was the most difficult part of it, to devise the means of cleaning it up. Nobody among us had any idea of cleanliness or had the experience of cleaning anything up including his own self and neither did we expect anybody among us to do such a thing. SP came up with an idea of a brainstorming session, in which everyone was to speak up about his ideas and plans of getting our house cleaned.

First it was Ravi's turn to storm his brain to get an idea, but this did not work out quite well. Ravi was in a particularly foul mood, as a result of the compounded effects of the major's lecture, the cocaine experiment, and a traffic policeman who had robbed him off two hundred rupees as a bribe to get away for pillion riding – considered illegal from a security point of view at that time – in the marketplace. So when we asked him about his ideas, the only output was in the form of very high quality expletives with particular reference to one's mother and sister, liberally aimed at everybody including us, his boss, the major, his dog, the traffic policeman, the prime minister of India, the president of US and everybody that came to his mind. He stopped only when he ran out of his stock of expletives and persons to direct them to. Although his brainstorming didn't get us anywhere in our cleanliness drive, it did acquaint us with a lot of abuses from around the world.

Subsequent to Ravi, it was Roy's turn to enlighten us with his ideas. Now Roy always dwelled in some abstract plane with a lot of ideas and philosophy, none of which were distinctly or distantly practical. Most of his cerebrations were spent on many important issues, like Ho Chi Min's policies regarding Viet-Nam, or how Hrittik Ghatak was a better film director than Satyajit Roy; he appeared to find it a bit demeaning to think about something as insignificant as cleaning up our house. This time though, he spoke confidently for half an hour about his methods of getting our house cleaned, none of which I could comprehend and am sure the others couldn't too. His speech or whatever was full of statistics, analogies and euphemisms, and appeared more like an address given on the floor of the UN General Assembly which very few people do understand but is always mandatory to clap. Here too, I was a bit tempted to clap at the end of Roy's elaborate and incomprehensible deliberations,

but then thought it more prudent to restrain myself as of now. At the end, however, Roy's ideas added very little to whatever Ravi had explained a few moments ago in his highly ornamental speech.

Anyway, after Roy it was my turn to express my ideas or whatever I thought of as a proper means of getting our house cleaned. This I found a bit difficult, the basic hindrance being that ideas never came to my mind unbidden and I found it too much complicated to think about anything when told to do so. Whenever I was persuaded to think about something, I suffered from a sudden and severe constipation of thoughts and thus always depended on others to think something for me. In other words I preferred to outsource my thinking facilities. However, given that now I had to think and say something, I pretended to do so but found it was not easy, and hence gave up after a few moments. Since I was required to say something, I took the safest way out and said that I fully agreed with what Roy had said and I was also actually thinking on similar lines. As expected, nobody seemed to bother about my thoughts, and it was all left to SP to think and get a proper way out of our cleaning problem.

SP was the best thinker among us; he would cautiously, logically and methodically think out everything and then give us a very elementary solution, which most of the time turned horribly wrong. Well, that's a different issue altogether, but at present he did come up with the solution that we needed a cleaning lady to clean up our house. This seemed a good idea, and Roy added that whatever he meant to convey with his half-an-hour idea was actually what SP had proposed; and since I had agreed with Roy earlier, I agreed with SP too. Ravi did have some objection about getting a cleaning lady, pointing out that we do have to pay her also, but since he always objected to anything and everything that is decided by others, we chose to ignore him. Nevertheless, it was decided that we needed a cleaning lady to clean up our accommodation and we emerged to the next step of finding one out.

Getting such a cleaning lady, however, turned out to be an easier process than deciding to get one and it was all courtesy the major's wife. She was a nice, kind, caring motherly lady with a lot of genuine concern for our wellbeing and she had already thought ahead of us and had arranged a maid-servant to get our house cleaned. Ravi, however, felt that her concern was more for her husband who was planning to leave Jorhat because of us. Anyway, Ravi always thought in the direction opposite to others – so we ignored him again. We were told that the lady would arrive at 9 o'clock on next Saturday morning and we should be ready for her.

I still don't know where the major's wife got this cleaning lady from, but the lady had the attitude of a field marshal. She arrived dot at the time she was supposed to and began banging our door so fervently that it woke us all up from a peaceful and heavenly Sunday morning sleep at that an unearthly hour. I was on the banks of Subararekha in Ghatsila happy with Asha Oberoi, but the racket landed me back in Jorhat sans Asha and sans happiness. None of us, however, bothered to get up to open the door, each expecting any of the other three to take up the ordeal or rather the person bothering us to get frustrated and leave. This

did not happen and the door banger turned out to be more persevering than we had expected. Ultimately it was Ravi who was the first to run out of patience; he got up from his bed and, like a professional somnambulist, walked up to the door, opened it, and without caring to see who or what was at the door, retraced his steps back to his bed and immediately fell asleep again.

The person at the door, none other than our new cleaning lady, probably had been a bit shocked at this type of welcome, but soon regained her faculties enough to decide to take this type of behavior as an insult to her persona. Marching in behind Ravi and finding him asleep, she began to scream and shriek, protesting the dishonor meted out to her by such ungentlemanly attitudes of us. She carried on with such a dreadfully screeching voice that we all thought it sensible to get up. Until that moment, we all had believed that Ravi was gifted with the most terrible voice ever; when he shouted or even spoke, it was like a philharmonic orchestra of a thousand crows cawing with sore throats. Yet that day, our knowledge about the most appalling voice got updated: Ravi wasn't the only talented one around; he really had a tough competition from the lady visitor.

Anyhow, it took a lot of the HR skills of SP to pacify the lady and explain to her that all her insult was unintentional and that it was just a misrepresentation of the situation. Whatever she understood of that I really couldn't say, but she did end her verbal tirade and everything became cool again. The very first thing she demanded was an inspection of our house to which we obliged sleepily. She examined every corner of it with the demeanor of an army general inspecting his troop, arriving at the conclusion that we were really dirty people and in her entire life (most probably spanning about 40-45 yrs) she hadn't come across creatures who lived as shabbily as we did, to which observation also we readily agreed. Then she provided an ultimatum that if we wanted her to clean for us, we must clean up everything within Monday. It was more of a command, and then she left us indicating that she would come again on Monday for another inspection. Long after she left we stood there bewildered, wondering why we did think at all about cleaning our house and that, too, with a cleaning lady.

The impact of this short cameo visit was so astounding that momentarily it left us standing with a lot of 'shock and awe'. Roy described it – in his own diplomatic way – like the declaration of a national emergency where our civil liberties were being grossly dishonored. What he meant by civil liberties was the right to sleep, and any violation of that really did make him very upset. Ravi was more direct in his protest and used his flowery *Saharanpuri* language in his wonderfully high pitched tone to voice his displeasure. SP was thinking about something, probably about the means to keep Ravi quite, and I was trying to make a mental calculation of how much garbage we had to clean out for tidying things up. This meant that the whole Sunday was to be spent in cleaning up our house – which really seemed to be a Herculean job. Even Hercules would have refused to do it on a weekend. Yet, we decided that in the best interests of us and of our neighbor, the major, we needed to sacrifice the Sunday in the name of cleanliness.

It didn't start well. To begin with, it was a really difficult job to distinguish between what was essential and what was garbage; often we – and especially, I – were trapped in the indecisiveness of whether to keep an object or throw it off. Most of the my belongings seemed to fall in this indecisive category, and in effect I ran around first throwing my things away and then collecting and restoring them. On top of that, the major was angry, again, that we were making the entire *mahalla* dirty by our earnest efforts to clean our house, and kept sending repeated orders for us to stop immediately.

The worst part of it was to get Roy to clean his room. Roy was the type of guy who would sleep continuously for about 7 hrs, get up only to declare that he was tired after sleeping so much, and sleep again for 5 to 6 hours. His room resembled the primordial state of the universe in which everything was in a disorderly way; nobody had any idea what was in there. He did have a dustbin, but it was the cleanest object in his entire room (including him), adding itself to the gamut of things so wonderfully displayed on the floor of his room. Roy lived in equilibrium with his environment; nobody expected him to change the status quo or to allow any of us to do so. Nobody ever dared step inside his room for two reasons – one, there was no place for anyone to step, and secondly, Roy told us it was dangerous to do so without any protective wear. The cleaning lady's stern orders, however, changed everything; Roy was eventually seen coming out of his chain of slumbers and making serious efforts to get his room cleaned. The entire day was spent like that, cleaning up our house; when we finished, our limbs ached. That fateful weekend had made us even more tired than the weekdays.

Our cleaning up operations ended abruptly at sundown when the major came up with his dog, commanded us to stop immediately, and complained that we were highly irresponsible, lazy and filthy people, and that we were solely responsible in dirtying up the surroundings of his house. His dog, he mentioned indignantly, had relieved himself in his yard, and for that, too, we were responsible; the dog, however, showed no displeasure like his master but bore the satisfied look of being able to shit at his master's house. Surely enough, our bachelor's accommodation did look a bit clean, but during the cleaning process we had managed to convert the whole of major's front yard into a terrible type of dumping ground.

The effects of that Sunday were longstanding. We were never again lectured on better ways of living. We never attempted another cleaning up job throughout our stay in Jorhat. The major, however, didn't leave Jorhat for some battlefield, but managed to stay on as our ill fated neighbor, ultimately coping up with the fact that we really were hopelessly irresponsible, lazy and filthy people. As for the lady, she never turned up. Probably she couldn't overcome the shock of seeing the dirtiest house of her life and the dirtier inhabitants within. Although, it must be said, she did manage to get us waste our weekend.

## খেলা

আকাশলীনা

যা বলতে চাইলাম তা বলা হয়ে উঠল না  
 ভবনার হল না দৃশ্যায়ণ  
 সব রং টেনে নিলো সমুদ্র-চেউ।

আধাৰঙ্গ কচুপাতার জলচোখে  
 গৱৰণগাড়ির দু'চাকার পথের দাগে  
 ছোটো ছোটো দুলন্ত ঘাসের ডগা।  
 কুলকুল অনন্তধারা নদী, ধূসুর চুম্বন –  
 ওৱা সকলে বলছিল  
 নিষ্পত্ত আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা নিঃশ্বাসকে  
 হাসপাতালের বেডে, এই দেখো  
 তোমার ভালোবাসায় মৃত্যু কেমন হাঃ হাঃ হাসছে।

শরীরকে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে একদল শ্বেতপোষাক।  
 মন তখনও কল্পনায় আপ্নুত  
 ঠুং ঠাং ছুরি-কাঁচির তরঙ্গ-তোলা নাচন  
 দিগন্ত বিস্তৃত জলে শিকারার দোলনায় দুলুনির ঘোর।  
 আমি তোমার শীৰ্ঢকার শুনছি  
 বড় আলোকপিণ্ডের নিচে শুয়ে, আর  
 কতগুলো দানবমুখ একমনে ঝুঁকে  
 আমাকে নিয়ে কাটাকুটি খেলে চলেছে।

## ইতিহাস চিহ্ন

### বৈদুর্য সরকার

পাথরের ফাঁকে জমে থাকা জল  
 অনেক গভীর... যতটা নামা যায়  
 জীবনমরণ সব ডুবিয়ে জলে  
 খুব চেনা একটা সুর, অচেনা গোধূলি  
 হারিয়ে যাওয়ার গান গেয়ে ওঠা  
 বাঁধার পাহাড় টপকে সূর্যোদয়ের কামনায়।

অকারণ অহঙ্কার আর উৎসবের জয়ধ্বনির শেষে,  
 পাথরে জমে থাকা শ্যাওলায় অবিচলিত  
 পা ফেলাই আমাদের খুব সত্যি,  
 ছেঁয়াচ লেগে থাকা হাতে অনেক ফাঁকফোকর...  
 বড় নিঃস্ব বলে মনে হয়।

## লঙ্কাকাণ্ডের পরে

### বন্দনা মিত্র

রাম তো রাবণকে বধ করে বীরপুরুষের মত সীতাকে বললেন  
 সীতা, আমি তোমার জন্য যুদ্ধ করিনি,  
 যুদ্ধ করেছি আমার পৌরুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য  
 অতএব, হে লঙ্কাপতির উচ্ছিষ্টা রামণী  
 অযোধ্যার রাজবধূ হওয়ার স্বপ্ন ছাড়ো,  
 চাইলে অক্ষশায়িনী হও যে কোনো বানর সেনা,  
 সুগ্রীব, এমনকি লক্ষণই বা নয় কেন?

সীতা দীর্ঘ সময় পর স্বামী সন্নিধানে আসার আনন্দে  
 তখন থর থর করে কাঁপছিলেন।  
 তাঁর কপোল সিক্ত। অশোকবনের নিরন্তর ঝতু পরিবর্তনে  
 তিনি শীর্ণা, রুক্ষকেশিনী।  
 তাঁকে দেখে মনে হয় যেন এক দীন দরিদ্রা  
 অযোধ্যার রাজপুত্রের কাছে কিঞ্চিত তাত্ত্ব কাহনের  
 প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে।  
 রামচন্দ্রের কথায় তাঁর চমক ভাঙল।  
 হঠাৎই মনে পড়ে গেল  
 অযোধ্যারাজের অপহৃত পত্নী হওয়া ছাড়াও  
 লোকে তাকে আরো এক নামে চেনে –  
 রাজেন্দ্রনন্দিনী, জানকী, মিথিলারাজ্ঞী।

আনত অবগুঠন সরিয়ে ঢোক্হের জল মুছে  
 সীতা স্পষ্ট কঢ়ে বললেন  
 রামচন্দ্র, আপনি দশরথের পুত্র, সূর্য বংশের সন্তান।  
 ইতরজনের মত কথা আপনাকে শোভা পায় না।  
 অযোধ্যাপতির আশ্রিতা নারী বলাঙ্কৃতা হলে  
 সে লজ্জা অক্ষম অবল রাজাধিরাজের,  
 শাস্তি পাবেন অযোধ্যারাজ –  
 কোন অপরাধে সে নারী হবে পতি পরিত্যক্তা ?

রামচন্দ্র অবাক বিস্ময়ে তাঁর ধৰ্ষিতা স্ত্রীকে দেখছেন।  
 চিরকাল শুনে এসেছেন মেয়েমানুষকে জুতোর তলায় রাখতে হয়  
 মাঝে মাঝে দণ্ড তাড়না করতে হয়  
 সে শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী আর বার্ধক্যে পুত্রের অধীনা –  
 সে কেন পায়ে ধরে মিনতি করার বদলে  
 সর্বসমক্ষে গলা তুলে কথা বলে ?  
 আর তাও গায়ে জ্বালা ধরানো সত্যি কথা?

দেবতারা যাঁরা আকাশে অদ্ভুত থেকে মজা দেখছিলেন  
 তাঁরা এতক্ষণে নড়ে চড়ে বসলেন –  
 নাটকটা বড় বেগতিক মোড় নিচ্ছে।  
 পিতামহ ব্রহ্মা চেঁচিয়ে উঠলেন,  
 মুখব্যাদান করে সব অবলোকন করছ কি?  
 শীত্র পুষ্প বৃষ্টি করে পালা সমাপ্ত কর।  
 সীতা সতীশ্রেষ্ঠা রমণীরূপে বিশ্চরাচরে পূজিত হোক  
 আর বাল্মীকীকে বল,  
 কথোপকথনটি উত্তম রূপে পরিমার্জনা করে  
 সনাতন প্রথায় রাম সীতার মিলন ঘটাতে।

‘অতঃপর সীতা নতমস্তকে অগ্নিপরীক্ষায় সমাসীনা হলেন।’

## জীবনের সঙ্কেত

দীপা পান

একটা গাছের গুঁড়ির পাশে সারারাত শুয়ে আছি আজ  
 সবুজ পাতার স্পর্শে খুলে গেছে বন্ধ বিনুকের ঠেঁট  
 এতদিন যার কথা ভেবে মুক্তো জমেছিল –  
 আজ তার বাকলের নিচে অসীম আকাশ দেখেছি আমি।

শুয়ে শুয়ে দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ-অবয়ব নক্ষত্রের সমাবেশ,  
 তাদের উষ্ণতা বুঝতে পারছি না গাছের উপস্থিতির প্রাবল্যে  
 অথচ জানি ওরা বহুদূরে একেকটা বিরাট নক্ষত্রমণ্ডল  
 নানাভাবে আমাকে জীবনের সংকেত পাঠিয়েছে...

হালকা কুয়াশার সর ভেঙ্গে দেখা যায় আবছা গ্রামরেখা  
 জোনাকিরা আলো জ্বালানোর কোন প্রস্তুতি নিচ্ছে না  
 তাই তার সবুজ চুলের বোঁটায় আমার আঙুলের উৎসব  
 লিখে দেয় আলোর বর্ণমালা স্পর্শপ্রভাবী মুক্তির সংজ্ঞায়।

একটা গাছের গুঁড়ির সাথে রাত কেটে যাচ্ছে ক্রমশ...।  
 তবু তাকে জড়িয়ে মধ্যমায় মধ্যমা ঠেকানো যাচ্ছেনা কিছুতেই  
 এতটা চওড়া তার পিঠ, এতটা গভীর তার কোমর –  
 অনুভব করছি আদিম অরণ্যের গন্ধ উঠে আসছে শিকড় থেকে।

## তারপর, রাত্রি নেমে আসে

### জ্যোতিষ্ক দণ্ড

[ আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,  
 তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই! –  
 শুধু তার স্বাদ  
 তোমারে কি শান্তি দেবে! –  
 নির্জন স্বাক্ষর – জীবনানন্দ দাশ ]

তারপর রাত্রি নেমে আসে,  
 কয়েকটা শব্দ এলোমেলো হয়ে লেগে থাকে  
 কপালে, চিবুকে... কয়েকটা তারও নিচে...  
 কয়েকটা শব্দ পাক খেতে খেতে উড়ে চলে যায়  
 বনে, বনান্তরে...  
 ছাদের তারে আটকে যায় কয়েকটা,  
 আর ক্যানভাস ফুটো করে কবিতারা নামে এ শহরে...  
 কয়েকটা শব্দ আমরা শুনতে চাইনি কোনদিন-ই...  
 আর কয়েকটা লিখতে পারবো না বলে,  
 স্নানের জলে ধূয়ে ফেলতে চেয়েছি গত রাত্রের ভালোবাসাবাসি...

তারও পর স্বপ্নেরা ঝান্ত হয়,  
 শব্দেরও প্রয়োজন ফুরোয়,  
 আমি ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসি,  
 রাত্রি তখনও নামে, নামতেই থাকে  
 একজোড়া ঘুমন্ত চোখে...  
 আমি তাকাই তার দিকে আর  
 না দেখা কয়েকটা স্বপ্নের খোঁজে ঝাঁপ দিই প্রাণপণ  
 আর ডুবতেই থাকি তার বুকে...  
 আজীবন জমে থাকা শিশিরের জলে...

## কাল থেকে...

কাল থেকে আর দূরে দূরে থাকব না,  
কাল থেকে আর আঙুলের ফাঁকে জমে উঠবে না  
নিকোটিন আর মরা বিকেলের চিঠি...

এক কাপ একলা চা আর  
আমার ছত্রিশ হাজার ব্যর্থ কবিতার মাঝে  
কাল থেকে খুঁজে নেব পায়ে চলা একটা পথ...

সকাল সাতটার দিকে তাকিয়ে বলব,  
“আর দুটো মিনিট, প্লীজ!”  
শেষ লাইনটা তখনও আমার বুকের মধ্যে  
খুঁজবে একটা বারান্দা, একচিলতে রোদ, একটা ইজিচেয়ার...

ইচ্ছেদের গায়ে সেই রোদচিলতে লেগে থাকবে কালকেও,  
তবু, কাল থেকে দেখো, সেই বারান্দাটায় আর  
বিকেল একা একা আসবে না...

## দুটি কবিতা

### কৌন্তত অধিকারী

সম্প্রতি উদ্যাপিত ডারউইনের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় কবিতাটি একটি ব্লগে প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকপাঠিকাদের জন্যে আমরা পালকিতে দিলাম। ব্লগে পূর্বপ্রকাশনা আমাদের নিয়মের পরিপন্থী নয়, পুনঃপ্রকাশ কম রাখতেই আমরা ইচ্ছুক; আগামী লেখকদের জন্য এটি অনুরোধ রইল।

### বালিকাব্য

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ তো শ্যালিকা  
হে চৈনিক বালিকা।

ওষ্ঠ তব লঙ্ঘা চেরা, অক্ষি চেরা ধান্য...  
ক্লিষ্ট দেখি চিত্ত মম, হও কি গো বদান্য?

রাঙ্কো যবে শুকরান্ত, উনুনঘরে আসি –  
গন্ধ সেও সহ্য করি, শুক্ষাননে হাসি;  
তরুও তুমি দীনের প্রতি নিতান্ত উদাসী –  
মিহি আঁখিতে রাগানুরাগ ওঠে না কভু ভাসি...

চপস্টিক-মাঝে তব, পড়িয়াছে চিপা,  
তবু এ হৃদয় 'পরে করো না যে কৃপা –  
নির্দয় নিষ্ঠুর তব পররাষ্ট্রনীতি;

নিত্য তাহা দেখি ক্রমে জাগিছে প্রতীতি –  
নাই নাই মোর তরে চেরী'র মালিকা...  
বৃথা এ লালিকা।

### ঈশ্বরের খেদ

দীর্ঘ ছয় দিন ধরি মৃত্তিকা ছানিয়া  
রচিলাম আদমেরে; জগতে আনিয়া  
দিনু তারে সঙ্গনীও, ঈতি যার নাম—  
তরুও আপেল চাখি' করিল আকাম!

কামলীলা ফল দিল, ভরিল জগৎ;  
সে ভুলের ফল হাতে পাইনু নগদ—  
আদমের কুলে হায়, জন্মি ডারংইন,  
বিশ্঵পিতা আমারেই করে দেয় হীন?

বেটা নাকি কয়ে গেছে জ্ঞানের বচন—  
মূর্খ সবে যারে নাম দিল বিবর্তন;  
জেনেসিস প্রবাদের ফাটায়ে ফানুস,  
অহঙ্কার করে যত পাষণ্ড মানুষ।

আসিছে তাহারা নাকি বানর হইতে;  
এ-কথা হাঁকিয়া ফেরে, ভয়হীন চিতে!  
রেগেমেগে হয় মনে, দিয়ে দিই শাপ—  
কপিই হয়ে যা তোরা, বান্দরের বাপ!

#### টীকাঃ

১. গবাদি পশুর পাকস্থলী, অন্ত ইত্যাদিও জনপ্রিয় খাদ্য, চীন সহ নানা দেশে।
২. চেরী গোত্রের ফুল পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বিশেষ সমাদৃত।
৩. প্যারতি'কে বাংলায় বলা হয় লালিকা।

## সুখী ব্যাচেলরের জীবনদর্শন

মাসুদ মাহমুদ

একাকী থাকার স্বাধীনতাটুকু, ভয়ে থাকি, কভু খোয়ালে –  
 বোকা গরু বনে যাবো আমি, যদি ভার বেড়ে ওঠে জোয়ালে।  
 এমনি তো সুখে আছি নিরবধি –  
 ঝুঁকি নেয়া কেন খামোখাই, যদি  
 আসে নিয়মিত দুষ্টু গাভীরা আমার এ শূন্য গোয়ালে?

## কবিতা চতুষ্টয়

ময়ূরী ভট্টাচার্য

### (১) স্বপ্নেরা ধাঁধার মত

স্বপ্নেরা ধাঁধার মত  
লাল-নীল-সবুজ নানা রঙের।  
তোমাকে পাব বলে অনেক স্বপ্ন বুনেছি  
তোমাকে পাওয়ার জন্যে অনেক স্বপ্ন দেখেছি  
সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছি  
তোমাকে পাব বলে।

### (২) আলো

নিঃসঙ্গ রাতগুলো বড় গন্তীর।  
আমার মত কালো।  
তুমি আলো নিয়ে আসো না কেন?

### (৩) শূন্যতার গহুরে অদ্রশ্য তোমাকে

শূন্যতার গহুরে অদ্রশ্য তোমাকে দেখি কখন হারিয়ে গেছ।  
নিজের অনুভূতিগুলো চেপে রেখেছ বহুদিন  
বহুদিন ধরে নিজের সাথে লড়াই করতে করতে  
তুমি বদলে গেছ প্রতিদিন।

কতদিন বৃষ্টিমাত সবুজের ঘাসে রোদ ওঠে নতুন উজ্জ্বল  
খোলা মনে হাত বাড়িয়েছ কী?  
তুমি শূন্যতার গহুরে একাকী প্রতিদিন  
দেখছি হারিয়ে যাচ্ছ দিনদিন  
তোমার আমি এখন পুরোনো অন্য কেউ  
চেনো না তাকে তাই সঙ্কোচ, অসন্তোষ –  
চোখ বুজে দীর্ঘশ্বাসে আমিও দেখি তুমি নেই  
কোথাও নেই, হয়ত কোনোদিনই ছিলে না!

শূন্যতার গহুরে আমরা হারিয়ে যাচ্ছ... প্রতিদিন।

(৪) ব্যথা

সময়ের বেয়াড়া কোগগুলো চিনে খুলে ঘায় নানা রঙের মুখোশ  
ব্যর্থতা কিনে কিনে একলা ঘরে তবু পড়ে থাকে কিছু আরাম  
ছায়ার সঙ্গটা ভালোবেসে।

কিছু কিছু বেদনার মুহূর্ত যন্ত্রণার চেয়েও কালো ছিল  
কঠিন সময় শূন্য শিহরণ  
ব্যথার চাদরে খুঁজেছিল মেয়েটি চাঁদের জোছনা।

## কবিতাত্ত্ব

### পার্থ মুখোপাধ্যায়

#### জার্নাল

(১)

পানের ডিক্বার অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ নিয়ে  
নিবিড় যুদ্ধ  
পঞ্চাশ বছরের আশপাশ  
চলার পর  
তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষান্ত দিলেন, শান্ত হলেন পাকাপাকি;  
আজ তুমিও  
চৌকাঠে দাঁড়িয়ে  
টর্চ ফেলে যুদ্ধের ইতিহাস দেখো  
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে  
মনে পড়ে  
ডিক্বার শেষ অধিবাসীকে  
বাঁচিয়ে রাখার  
সূক্ষ্ম জেনিভা প্রথা  
কখনো লুকোনো সুপুরি চালাচালি  
বন্দীবিনিময়  
তুমুল গোলাগুলি শেষে  
শান্তি চুক্তি  
কখনো সীমান্ত পেরোনোর বাড়াবাড়ি  
এবং রেডক্রস;  
আজ ডিক্বা ঠাসা পঞ্চাশ বছর  
ঘরের কোণায় সারাক্ষণ কুরুক্ষের মতো  
কথা বলে  
জানি কেন খুলতে ভয় পাও  
জানি তোমাকে ভীষণ চিন্তিত করে বৃষ্টির সকালে —  
আধখানা পান সে কি রেখে গেছে?  
রণাঙ্গণ ছাড়ার ঠিক আগে?

(২)

ঠগহাঘরে তাসছে বৈতরণীর পাঁকে  
নিকোয় পুরুত দৃকসিদ্ধ খিদের দালান  
দু-দাগ করে বিষাম্বত গিলতে বলো?  
টাকার খাটে উবছে মেয়ের মেকাপ-পরাণ  
সালতামামি করলে পাবে ন্যাংটো বছর  
ভরছে তবু জোচোর ওই যমের খাতা  
খিদেই আল্লা, নষ্টঠাকুর, বদের নিমাই  
কে-ই বা বোঝো, আবর্জনার বিপন্নতা?

(৩)

প্রত্যেক শ্বাসে আছে  
প্রথম শ্বাসের কিছু অণু  
তাই বাঁচা আজও অলৌকিক  
প্রথম সে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ  
ত্রিশূল শিবের থানে রেখে  
দাঁড়িয়েছে বেখান্না, ঝজু, ধর্মতলায়;  
ঘাটশালিক, সরফদার ডোমকে রোকো  
শুয়ে নয়, যেভাবে যায় ক্লীব শতচিহ্ন বাঘ  
পরিচিত অমল শিশুর হাত ধরে যাবো  
উল্লাসে, টালমাটাল অনিশ্চিত পায়ে  
ছাইমানুষ।

(8)

যেখানে যা হয়নি শেষ, তার শুরু এই কবিতায়;  
 ধার-বাকি রয়ে গেছে  
 মুদ্দোফরাস চৌকাঠে দাঢ়িয়ে  
 জরিপ করছে আটচালা;  
 বুকমাদুরে চোখ রাখলে দেখি  
 নাছোড় বকের মতো  
 আসমানী হাজার জলফোঁটা;  
 বৃষ্টি হলে বেশক্ পুড়বো  
 তাই  
 নেফারতিতিকে বেপরোয়া রাণী করি  
 খিদিরপুরের ডকে, মাটির অনেক তলায়।

### জন্মদিন

আমি-ই দিয়েছি জন্ম এ দিনের  
 লাল পতাকাও পোঁতা আছে  
 তির্যক

আমি-ই নিয়ে যাবো  
 সাদা চাদরে টেকেতুকে  
 ক্যালেন্ডারের কালো গর্তে চোখ রেখে  
 তুমি বলবে  
 “কেউ এসেছিলো মনে হয়”

### তিল

অঙ্ককারে সবকটা তিল যেদিন গুণতে পারলাম  
 তোমার ঠুমরীর গলায় হাসলে  
 মিষ্টি সিরাপের মতো  
 একটু বিশেষ আদর

যেটা আমি আর তোমার ল্যাত্রাড়োর  
 পেয়ে থাকি যেদিন সৌরভ জেতে,

আমি ঠান্ডা ইঁদারার জলে  
 শাসবন্ধ কাঁদলাম।

নতুন গোমেদ চুণী তিল  
 এখানে ওখান ফুটে আছে  
 নিশিপদ্ম, তার নিশিডাকে  
 মানুষ পাগল হয়ে যায়।

## ন হন্যতে

### পিপুফিশ

তোমাকে চুমু খাব বলে সটান বাড়িয়ে দিয়েছি ঠোঁট  
 তুমি উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতেই পিছু হঠেছি  
 উষ্ণতম স্বল্পনের আগেই  
 লাল হয়েছি লজ্জায়  
 জতুগৃহ থেকে সদ্য উদ্বার করা মাংসল দেখেছি মর্গে  
 নিসংকোচ কৌতুহলে

আলিঙ্গনে বুঁদ হব মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছি অঞ্চলে  
 তুমি বুক বাড়িয়ে গ্রহণ করেছ আমার শ্বাস  
 শ্বাসরংশুকর চরম আবেশের আগেই  
 হাত পা ছুঁড়েছি দ্বিধায়  
 সমুদ্রের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ফেরত দেওয়া প্রেম কাহিনী  
 চের শুনেছি আগ্রহভরে

তোমার গজগমনে টেউ হতে চেয়ে বুক পেতে রেখেছি রাস্তায়  
 তুমি চমকে উঠে জিভ কেটেছ, সলজ্জে চীৎকার  
 দেহি পদবল্লব... বলার আগেই  
 সরে বসেছি অহঙ্কারে  
 দীর্ঘপথ আরো দীর্ঘায়িত হয়েছে, থমকে গিয়ে প্রশ্ন রেখেছি  
 দলাপাকানো খণ্ডিত হৃদয়কে

বিষপূর্ণপাত্র নিয়ে বসেই থেকেছি তোমার নীলে মিলে যাব একদিন  
 তুমি ধীরে নেমে এসে এক গাঢ় কালো ধোঁয়া হলে  
 গলাদ্বিকরণের আগেই, আমি  
 থু থু করেছি জ্বালায়  
 চরম বিষণ্ণতায় তোমার জন্য কিছুতেই পারিনি, শক্রকূলে  
 মীরা বা প্রহ্লাদ হতে

## ধুলো, পাতা এবং অপেক্ষা

### প্রজ্ঞা মৌসুমী

এক কণা ধুলোর আশ্রয় মিলেছিল পাতায়  
বেঁধেছিল ঝুঁপদী সখ্যতা, গড়েছিল পরিচয়  
সদ্যজাত অঙ্গিত্বের সাথে। কুয়াশার জলসায়  
অনন্য আশাবরী-রাগ শুনেছিল ধুলো মুন্দুতায়।

ক্লান্ত বেহুলা-রোদ থেমে গাছের ছায়ায়  
দেখিয়েছে জীবন্ত বায়োক্ষোপ পাতার নৌকোয়  
ভাস্ত পিপঁড়ের চোখে পৃথিবী বিস্তৃত বিস্মায়।

ইচ্ছের ‘সিদ্ধার্থ’ বাড়ে ধুলোর সন্তায়,  
ছাড়ে পৌরাণিক আশ্রয়; পৃথিবী দেখার উত্তেজনায়  
রাতের প্ল্যাটফর্মে যাত্রী ধুলো দাঁড়ায়।  
উঠে পড়ে ট্রেনে; রাখে চোখ স্বচ্ছ জানালায়  
ছুটে শিশিরের ট্রেন পাতা থেকে পাতায়  
বিস্মিত চোখে, ধুলো শুধু তাকায় —  
দেখে পৃথিবীর অলিগলি, রাতের জমিদারী; জ্যোৎস্নায়  
ফেরা বিলুপ্ত যোজনগন্ধা — পায় বিচ্ছি স্বাদ হ্রিত আত্মায় —

যাদুকরী আলো আরেক চরিত্র দিয়ে দিনের স্তন্ত গড়ায়।  
বিস্ময়ে ধুলো — জলের দেয়াল থেকে দুই বাহু বাড়ায়।  
জেনে যায় — গন্তব্য — এখানেই শেষ নয়  
শিশিরের ট্রেন যাবে আরেক বিহুলতায়।  
চলে যায়... যায় ধুলো শিশিরের সাথে অসমাপ্ত অজানায় —  
সূতিভূষ্ট বৃন্দা-পৃথিবী ভুলেছে তাকে, ভুলেছে ব্যন্তি-কিংবদন্তী ‘সময়’  
হয়তো ভুলেছে ধুলো নিজেও। পাতারা ভোলেনি কিছুই — আছে অপেক্ষায়  
যদি কোন একদিন, অলৌকিক কিছু এক, আবার ধুলোকে ফেরায়  
জীবিত বাস্তবতায় — আজও সেই অপেক্ষায়!

## হৃদয়নন্দন বনে

প্রশংসন কুমার চট্টোপাধ্যায়

ভালো থাকবার মতো ওষুধ ছিল না  
 শুধু তুমি ছিলে মাথার পিছনে  
 অলাতচক্রের মতো। ছন্দ-লয়-স্বরময় মীড়ের কোমল  
 স্নেহময় হাত দিয়ে ছুঁয়ে গেছ বার বার, আমরা অবাক তাকিয়ে  
 কী করে জেনেছ তুমি আমাদের কথাগুলো, স্বপ্নগুলো, দেখা ও অ-দেখা  
 এসব আমার কথা। আমার মতন এক সামান্য মানুষ!  
 এবং তারাও, যারা আমার-ই মতন;  
 পঞ্চিত কখনো নয়; নয় দার্শনিকও এমনকি নয় কোনও মোহর লাগানো কবি-  
 গ্রন্থসিক।

স্তুর্বাক তোমার ওই পাখির মতন; ঈশ্বর দিয়েছে যাকে গান  
 আমরা তোমার মতো ভগবানদত্ত স্বরে, সুর জুড়ে, কথা জুড়ে, সাজাতে পারি নি।  
 নিতান্ত অ-সুর এই পক্ষে তোমাকে সামনে রেখে পেটের জোগাড়  
 করার মতনও কোনও পড়াশোনা নেই। যেমন ওদেরও নেই; যারা সব  
 করে খাচ্ছে তোমার কৃপায়!  
 বিপদভঙ্গন তুমি, প্রিয় কবি সকলের, সকল দলের। দু'হাজার এগারোটা পার করে দাও।

## কবিতা চতুষ্টয়

পংখীরাজ চৌধুরী

### খোলা চিঠি

এই নাও বললাম —  
মনে মনে কত বার গেছি তোমার পাড়া  
  
শুধু নাভী ছাড়িয়ে যাই নি কখনও।  
কি চেয়েছি বল —  
তোমার দুন্ধপোষ্য হওয়া ছাড়া?

### আ-দিম

কি বাজাচ্ছ? কোন তাল?  
আ-দিম! আ-দিম!  
সাঁওতাল

কে শেখাল এমন বোল?  
মা শেখাল —  
মাদল

### রোবট ও গাছের সংলাপ

গাছ। কি খুঁজছ?  
রোবট। প্রাণ  
গাছ। সে তো আমার অফুরান, নেবে?  
রোবট। (একটু ভেবে)  
এমনি তো দেয় না কেউ  
তোমায় আমি কি দিতে পারি?  
গাছ। দেবে? এই শরীর চালু করতে  
দু-একটা ব্যাটারি?

### তিরুতে টিনটিন

গভীর দৃশ্যে কৈলাস পাহাড়  
নির্বাচনের দিন।  
ভেট দেবেন কোন বাঞ্ছে —  
তিয়ানআনমেনের চীন  
নাকি তিরুতে টিনটিন?

## চলো, ভ্রমণগদ্য

### রমিত দে

ছায়ার তলায় যে লোকটা থাকে  
 মাঝে মাঝে কোন কারণ ছাড়াই জেগে থাকে,  
 উত্তল হয়  
 পা টেনে টেনে  
 কালরাতে নেমে আসে অলিভপাতার পাশে,  
 আরো গভীর বনে ঢোকে  
 নিরক্ষর হাওয়াদের সাথে  
 জুয়ো খেলতে বসে নদীর পায়ের কাছে,  
 দরদী প্রশান্তির কাছে,  
 জামা তুলে লুকিয়ে রাখে কান্না...  
 সত্যি...

.....সত্যি।

এখন আমি উবু হয়ে দেখি নিজের শরীর,  
 আমাদের দু'তিনখানা বাড়ির পরই  
 আনকোরা ছায়ারা শুয়ে থাকে  
 সন্ধ্যামণির কোলাহলে,  
 আর আমি উবু হয়ে দেখি নিজের শরীর।

কি বোকা আমি!  
 ধানফুল সরিয়ে লাল পিংপড়েরা আমাকে  
 পেরিয়ে চলে  
 সদ্যোজাত শেকড়গুলোর দিকে  
 সম্মালিত জীবনের দিকে...  
 এমনি হতে হতে এ জায়গায়  
 আর ফেরা নেই;  
 কেউ কি আছে গভীরে? আরও গভীরে....!  
 কি জানি, কফিটা শেষ করে  
 কালো পাথর সরিয়ে  
 আমরা যারা  
 ঘর থেকে বেরিয়ে যাব ঘুমে... গাঢ় ঘুমে...  
 সত্যিই দেখতে পাব কিনা  
 মুসাফির, চলে গেছ তুমিও!

## দোলাচল

### রোমেল চৌধুরী

আমার বয়স হয়েছে তাই আজ অতীতের সুখসূতি  
অনুত্তাপের মতো মনে হয়।

এই যে এই মুহূর্তে জানালার ফাঁক গলে  
বিকেলের রোদ এসে আমার শিয়রে ছড়াচ্ছে কবোৰ্দ স্তনের আগ—  
উটপাখির মতো আমি সেই উষ্ণতায় মুখ গুঁজে সন্তাব্য তুফান এড়াই।

দুয়ারে দখিনা হাওয়া, তবু শুনি কঙ্কাল ঘোবনের খনখনে স্বর,  
“বসন্তরাগী তোমার নয়, তোমাকে  
অবজ্ঞা করে এ মৈথুনের ঝুতু, —

তুমি ঘোবনের অম্ভত সঞ্চয়ে শত পুষ্পে বিকশিত নও,  
বরং কালঙ্গোতের বিপর্যয়ে নিহত শুণ্যতাই তোমার নিয়তি”।

যখন অর্বাচীন ভালোবাসা এসে জোনাকি জ্বালায়, —  
অভিজ্ঞ হাড়ের শরীরে; মনে হয় আমি এক জাতিস্মর যেন  
মাতাল ঝত্তিকের মতো কেঁপে উঠি শুন্দাচারী সৃতির দহনে।  
জীবনের একান্ত সত্য এসে ফের বলে যায়,  
“প্রকৃত প্রস্তাবে সবই ক্ষণিকের, কিছুই চিরন্তন নয়”।

নারকেলের পাতা বেয়ে স্লান জ্যোৎস্নার নেমে আসা শেষ হলে  
হয়তো বা ধীরে ধীরে একদিন কেটে যাবে দীর্ঘ শীতরাত্রি;  
আদিম রাত্রির গহ্ননে আমি আর বসে একা একা  
নেবো না দুঃখের ভার ভুল সময় ভুল রমণীকে ভালোবেসে।

হয়তো কখনো বসবো না রাত্রির জানালায় মৌনমুখ  
বৃক্ষের স্তন থেকে ঝরবো না শিশিরের মতো ফোঁটায় ফোঁটায়  
ঝরা পাতাদের বনে, — মনে মনে, টুপ-টাপ বিষগ্ন আয়োজনে।

তবু এই বসন্তদিনে প্রিয়তমা যদি তুমি আসো  
এলোকেশে মোহিনীর বেশে  
এই মন কেন তবু হয় উচাটন ক্ষণিকের তরে?  
বসন্ত বিলাসে কি এমন মাদকতা মাখা আছে?

## বাঘিনীর বিরহে বাঘার খেদ ও মৃত্যু

**শরৎকামিনী চৌধুরাণী**

(শ্রী অরূপ চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

বাঘা আৰ বাঘিনী থাকে  
গহন বনেৱ মাৰো  
বাঘিনী হারিয়ে গেল,  
বাদলেৱ এক সাঁৰো।

(১)

বাঘা কান্দেৱে, গহনবনে বসে  
বাঘিনী হারিয়ে বাঘা নয়নজলে ভাসে,  
বাঘা কান্দেৱে।

(২)

বাঘা বলে, বাঘিনী লো, এই পন্থে না যাইও,  
জমিদারেৱ গৱেষণ দেখে, সেলাম জানাইও।  
বাঘা কান্দেৱে।

(৩)

বাঘা চললো রে, জমিদারেৱ বাড়ী।  
সেই বাড়িতে ‘পাইক, প্যাদা’ আছে সারি সারি।  
বাঘা কান্দেৱে।

(৪)

বাঘা খুঁজেৱে, জঙ্গলেৱ ওই ধাৰে,  
লোকেৱ শব্দে উঠে গিয়া দোতালা উপৱে।  
বাঘা কান্দেৱে।

(৫)

বাঘা লুকায় রে, ছাপৱ খাটেৱ তলে,  
খোঁজ পাইয়া যত লোকে দৌড়ে দলে দলে।  
বাঘা লুকায় রে।

(৬)

বাঘা কান্দেৱে, খাটেৱ তলে শুইয়া,  
নিৰাগত কৰ্ত্তাবাবু উঠে লম্ফ দিয়া,  
বাঘা কান্দেৱে।

(৭)

বাঘা বলে বাঘিনী লো, এই ছিল তোৱ মনে?  
তোৱ লাগিয়া এবাৱ বুঝি, মৱিলাম পৱাণে,  
বাঘা কান্দেৱে।

(৮)

বাঘা কান্দেৱে, হা হতাশ কৱিয়া।  
জমিদার ধেয়ে আসে, শেল, লাঠি লইয়া।  
বাঘা কান্দেৱে।

(৯)

বাঘা উঠেৱে, গৰ্জন কৱিয়া।  
জমিদার পালাইল নেঁটীটি ছাড়িয়া।  
বাঘা কান্দেৱে।

(১০)

বাঘা পড়লোৱে, একি ভীষণ ফাঁদে,  
বাঘিনী স্মাৰিয়া বাঘা, হামুৱ হমুৱ কাঁদে।  
বাঘা কান্দেৱে।

(১১)

বাঘা গৰ্জেৱে, লম্ফ বাম্ফ দিয়া।  
বন্দুকেৱ গুলি গেল, কঢ় যে ভেদিয়া,  
বাঘা মৱেৱে।

(১২)

বাঘা কান্দেৱে, শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া,  
বাঘিনী লো জীৱন দিলাম, তোৱ খোঁজে আসিয়া।  
বাঘা কান্দেৱে।

সেত্য ঘটনা – ময়মনসিংহ-এৱে সেনবাড়ীতে এক বৰ্ষাদিনেৱ ঘটনা।  
শরৎকামিনীৱ দাদামহাশয়েৱ খাটেৱ তলায় রয়াল বেঙ্গল বাঘ সিঁড়ি  
বেয়ে এসে লুকিয়ে ছিল; তাকে গুলি কৱে মারা হয়েছিল। সেই  
ঘটনাৱ পৱ সংগ্ৰহাধিক শৱৎকামিনী দুঃখতাৱাক্ষৰ্ণ মনে অনেক  
কানাকাটি কৱেছিলেন এবং ছড়াৱ আকাৱে নিজেৱ মনেৱ কথা  
লিপিবদ্ধ কৱেন।

## তোমাতে

সর্বজয়া মুখোপাধ্যায়

ভুরভুর বাগড়ায় বাজে না দেওয়ালগুলি  
কেবল প্রেমকথা কিলবিল

দরজাটি বন্ধ।

তারপরে হঠাত ছাড়াছাড়ি  
দুই দেশ আড়াআড়ি

দরজাটি খোলা।

তারও পর বললেম দূর হও।  
দূর দূর দূর দূর হয়ে যাও

চৌকাঠে বলে ‘টুকি’

এরপর মুশকিল ঝিলমিল এরপর  
দেওয়ালেরা আর এই এই ঘর  
প্রশ্ন ও উত্তর এক সাথে শুধাও

দরজাটি হয়েছে উধাও।

## ভালোবাসি আলো-হাসি

**মেহাশিস ব্যানার্জি**

আমার হাতে, আমার খাতায়, আঁকছি তোর ছবি,  
 রং নেই, কালি নেই, তোর প্রেমিক কবি।  
 আঁকতে পারিনা, আর্টিস্ট নই, লিখছি আমি কবিতা।  
 আসবি না ফিরে, জানি আমি, ব্যর্থ হবে সব-ই-তা।  
 গরীব নই, ধনী-ই বটে, আসবি কি-না দ্যাখ;  
 শুনবি নাকি, কি কি আছে, একের পর এক?  
 আকাশ দিয়ে শুরু করি, ওটা-ই দেবো ফাস্ট;  
 ফ্রী-তে দেবো – বিলীভ মি – করিস যদি ট্রাস্ট!  
 আকাশ-টা তো অনেক বড়, ফান্ডা তবে শোন,  
 স্বর্গ বানাস, আমায় শুধু দিস একটা কোণ।  
 ভালোবাসি পাগলি তোকে, শিশির ভেজা ঘাস।  
 গ্যারান্টী দিয়ে বলতে পারি, কোথাও যদি পাস।  
 শিউলি তোর কেমন লাগে? দেবো দু-চার মুঠো।  
 মালা গেঁথে পরে নিস, দেবো ছুঁচ-সুতো।  
 আবার বলছি ভালোবাসি, আর-কি লাগবে বল;  
 না বললে ডুববো আমি, সাগর ভরা জল।

## যৌনতা কিংবা গিমিক বিষয়ক

### শুভ আট্য

(১)

ভিজে চুল থেকে ঝরতে থাকা তারায়  
ভিনদেশী মিথ্যেরা গা-সওয়া,  
জ্বরের মাঝে লেভেল-ক্রসিং-এ তুই  
রং যেন ভ্যান গো'র সানফ্লাওয়ার

গতকালের সঙ্গে শাড়ীতে নিয়ে  
নামতে থাকিস আমার কপাল খুঁড়ে  
কিছু চকোলেটের রাংতা এখনও জমা  
জ্বরের নেশায় তোর থেকে বহুদূরে

তালসারি বা মন্দারমণি হলেই  
বালি দুকে যায় স্বপ্নে, চোখে-মুখে  
তুইও জানিস আমার ভাবার দৌড়  
ঝাঁপিয়ে পড়া, পালিয়ে যাওয়া

সবই আটকে

তোর ব্লাউজের হকে।

(২)

শহরের কাছে অপেক্ষা পড়ে আছে  
ময়দানের ঘাসে সবজে ফোটোগ্রাফি  
কিছু দিন যায় একই চেনা সেই ছাঁচে,  
কোনো রাতের স্বপ্ন খুন-খারাপি

কোনো দুপুর বেঞ্চিতে একা বসে  
কোনো সঙ্গেয় জ্বলে না নিয়ন আলো  
কখনও নিজেকে নিজেই লাথাই কষে  
মনে হয় এইমাত্র চোখ গেল;

ট্রামে করে তুই শহর চিরে এলে  
রাতের গন্ধ হয়ে যায় খুব বন্য —  
না মেলানো অঙ্কেরা সব মেলে  
শক্ত হই হয়তো তোরই জন্য

শক্ত হয়

শুধুই তোর জন্য।

## কবিতাত্ত্ব

সুদীপ্ত বিশ্বাস

### তর্ক

তর্কে যে পাই যুক্তি খুঁজে  
তর্কে যে পাই শান্তি  
তাইত আমি তর্ক করি  
তর্কে যে নেই ক্লান্তি।

অজানা আর নেইত কিছুই  
সব কিছুই জানি  
চলার পথে তাইতো খুঁজি  
তর্কের হাতছানি।

সুযোগ পেলেই হাত গুটিয়ে  
তর্ক করি শুরু,  
প্রমাণ করি সব বিষয়ের  
আমিই আসল গুরু।

আমার সাথে তর্ক করা!  
এন্ত বড় স্পর্ধা?  
এক্ষুণি দেখিয়ে দেব  
কে যে আসল বড়দা।

তর্কে আমি উঠব চূড়ায়  
তর্কে দেব পিষে,  
নইলে আমার আমিত্তির  
প্রকাশ হবে কিসে?

### ভেজাল

খাচ্ছি ভেজাল মাখছি ভেজাল  
হাসছি ভেজাল হাসি,  
ভেজাল তেলে ভেজাল চালে  
ভেজাল ভালবাসি!

ঘোল আনা খাদ মিশিয়ে  
বানাই সোনার দুল  
তাইত দেখি খোকার মাথায়  
ঠাকুরদাদার চুল!

খোকন সোনার চোখে ছানি  
চশমা পরে তাই  
নিজের সুখে ভায়ের বুকে  
ছুরি মারে ভাই!

ওষুধে ভেজাল পথে ভেজাল  
ভেজাল রোগীর রত্নে  
পাদ্যে ভেজাল অর্ধ্যে ভেজাল  
ভেজাল দেবীর ভঙ্গে!

বিজ্ঞানীরা চেঁচিয়ে বলেন  
ওজোন লেয়ারে গর্ত,  
ভেজাল যত দেশের নেতা  
ভেজাল তাদের শর্ত!

ভেজাল দেশের ভেজাল মানুষ  
ভেজাল তাদের মনে  
উপরে ভেজাল ভিতরে ভেজাল  
ভেজাল ঘরের কোণে!

ভেজাল শুনে ভেজাল দেখে  
ঝাপসা হল দৃষ্টি  
কোথায় তুমি হায় ভগবান?  
ভেজাল তোমার সৃষ্টি!

## অন্য গ্যালাক্সি

আমার সমস্ত প্রেমের কবিতা জিঘাংসা হয়ে গেছে।  
 অনেক চেষ্টা করেও প্রেমের কবিতা লিখতে পারি না আমি।  
 অথচ একদিন প্রেমিক ছিলাম  
 সারা রাত বসে বসে তারা গুনেছি কত ইয়ত্তা নেই তার  
 বাদাম ভাজা, ফুচকা আর আলু কাবলির সাথে কেটেছে  
 সোনালী দুপুর, বিকেল  
 ঢেউ গুনেছি দামোদরের তীরে  
 দিনের পর দিন  
 অফিস পালিয়ে  
 তিনটে ট্রেন পালটে তবে সেই পুকুর পাড়  
 দেখেছি বিকেলের সূর্যটা কিভাবে রাঙ্গা কুসুম হয়ে যায়  
 কিভাবে সন্ধ্যা নামে মাটির পৃথিবীতে।  
 জোনাকিরা এসে রাতের হিসেব দিয়ে যায়  
 চুলে বিলি কাটতে কাটতে  
 চোখ বুজে ডুব দিয়ে অ -নে -ক গভীরে  
 শিখেছিলাম কিভাবে অন্য গ্যালাক্সিতে যাওয়া যায়।

## জানালার এপারে বন্দী

### সুমন বারিক

খাটে একাকী, আমি শুয়ে থাকি  
জানালার এপারে বন্দী  
এই দুপুরেই, ফিরে আসে সেই  
দূরে পালিয়ে যাওয়ার ফন্দী ...

কত নিশ্চল, কত চুপচাপ থাকে  
চার তলার এই ঘরটা  
ঘূম পাড়িয়ে দিয়েছি ঘড়িটাকে  
ভুলে গেছি সময়ের দরটা ...

তারে বসা কাক, কত দেয় ডাক  
চলে মিঞ্চিরিদের ঠুক-ঠাক  
শব্দের শ্রোতা, করি সমৰোতা  
উৎসের সূতি এসে দিয়ে যাক

কে যে সয়েছে, সুখী সেজে –  
কে যে পেয়েছে মনের কাজকে  
আমি গেলাসের নিচে থিতিয়ে পড়েছি  
দিও না নাড়া আজকে ...

মন উত্তাল, দেয় প্রোপোজাল  
চল চঞ্চল হই দু-জনে  
আমি হাসাবার ভাষা হারিয়ে হাসি  
খঁজি পাখিদের কৃজনে...

হাওয়া উড়ে যায়, বলে উঠে আয়  
মেলে দে পাখা, পাশে পাশে  
আমি শান্ত সাগর শুয়ে পড়েছি  
দৃষ্টি মিশেছে আকাশে ...

ছোট পথ তবু, ছোটে গাড়িগুলো  
যত অলস ধূলো উড়িয়ে  
আমি থেমে গেছি মাঝপথেই, আমার  
রাস্তা গিয়েছে ফুরিয়ে ...

কত অনুভূতি, ভাসে বাতাসে, ‘তাদের  
ছুঁয়ে দেখা’-তেই মন দি’...  
খাটে একাকী, আমি শুয়ে থাকি –  
জানালার এপারে-ই বন্দী ...

## এক যে আছে রাণী

স্বাতী মিত্র

রাণীর মুকুটটা দেখেছ শুধু,  
জানতে চেয়েছ কখনো  
কত তার ভার?  
অঙ্গসজ্জার বহুমূল্য আভরণ দেখেছ,  
কখনো ভেবেছ ভুলেও  
সে সজ্জার বিড়ম্বনা কত?  
ভক্তির অঞ্জলি বেঁধেছ,  
দূর থেকে দুচোখে মুঞ্চ প্রদীপ জ্বলে  
আরতি করেছ;  
কখনো বা গোপনে, অজান্তে  
ঈর্ষাও করেছ হয়ত  
ঐ মুকুট, ঐ আভরণ,  
ঐ ঐশ্বর্যের আড়ম্বর।  
শুধু যদি জানতে —  
রাণী হওয়া কত কঠিন কাজ!  
যদি জানতে —  
সোনার জুতো পায়ে  
রাজকীয় গরিমায়  
গোলাপের মখমলী পথে  
অন্তহীন চলার ব্যথা।

রাণীর ধমনীতেও যে লাল রক্ত বয়,  
সে বোঝার দায় তো কারো নেই।  
মাঠের সবুজ, আকাশের নীল,  
বর্ষাভোজা হাসনুহানার গন্ধ,  
অথবা জ্যোৎস্নারাতের মায়ায়  
তার তো মন কেমন করতে নেই।  
অন্তরের অন্তঃস্ত্রলে যদিও অবিরাম রক্তক্ষরণ —  
তবু চোখের জলের বিলাসিতা তার সাজে না।  
সে যে রাণী —  
ভক্তের সভায় সদা শুচিস্থিতা,  
প্রতিপল শুধু অন্যের জন্য বাঁচা;  
তাকে শুধু রাণী হয়েই বাঁচতে হবে,  
মরতেও হবে রাণী সেজেই।

## দেখা, না দেখা

তাপস রায়

ডাঙ্কির ক্লান্ত পায়ের কাছে পড়ে আছে মৃত নক্ষত্র, ওই ঘাসফুল  
তার ওরকম স্লান প্রস্ফুটনে কত আলোকবর্ষ ইতিহাস  
তার ওই অবাক দৃষ্টিপাত ধরে মেঠো হাওয়ার  
না-জানা শিহরণ

ছড়ানো হিংসার ভেতর ভীরু-পায়ে হেঁটে যায় ডাঙ্কি ডাঙ্কি  
এই রচিত বিমর্শের ভোরে হেঁটে উঠে প্রতিদিন  
যা যা খুঁটে পায়, মালা গাঁথবার মতো — অক্ষরের দিকে  
টেনে আনে

শ্রীকৃষ্ণের চলাচল ধরে ব্যাধেরাও মুক্ত, ঘোরাঘুরি করে  
সমস্ত আরক্ষিম আনন্দের দিকে লক্ষ্য রাখে তীক্ষ্ণ, তীব্র তীর  
যে শিশির ঘাসের পল্লবিত মুখে একটি ফোঁটার মতো ফুটে আছে  
তার অশ্রু বিবরণ

কোনো নিখিল না-এর কাছে প্রাণপাত আকুল আকুল হয়েছে  
প্রান্তর প্ররোচনা জানে, তার শোকগাথা, তার বিরোধী আঁধার  
স্পর্শ উন্মুখ কত কী নীরবতা টের পায়, লাইনপাড়ায় এর ওপর  
বসন্তের বিরহী বাতাস

## To Florence

Amit Shankar Saha

Dear Florence,  
Remember  
Once you took  
Me to watch  
A movie,  
“Anjali”,  
At Chaplin  
And the film  
Had made me  
That evening  
Too somber,  
But so pleased  
I was then  
During those  
Puja days.

Once we went  
To the Scoop,  
Princep ghat,  
And had thrown  
Half a pack  
Of French fries,  
Too salty,  
Out of the  
Window of  
The taxi  
On the road  
Returning  
From the Scoop  
And the day  
Had gone by.

You had brought  
Books for me,  
The British  
Library,  
I was too  
Young to be  
A member  
Over there,  
Theatre road  
Located  
Institute,  
And had read  
All those books  
All those days  
Come of age.

I am still  
That good boy  
And though still  
I go out  
For dinner or  
Lunch with you,  
Nothing tastes  
Too salty,  
Nothing is  
Too somber,  
And I am  
Not too young,  
I can't take  
Advantage  
Of you now.

## A Fine Day to Leave

Ratnadipa Banerjee

I wish to leave on a day like this  
With a February sun,  
Balmy and benign, like a mother's scolding...  
Salvia and pansies are in bloom,  
Rosebuds have opened obediently  
As per diktat of season.  
My love is alive and well,  
Happy beyond my belief...  
So that I let him hold my hand  
For a while.  
I wish to leave now  
When friends are still friends,  
Their smiles like the first summer shower...  
Guavas have fresh, crisp taste of our  
Girlhood,  
When we returned from school  
In rain drenched clothes.  
If I leave now,  
I'll take a bit of this warm sun,  
A bit of this love,  
A lot of this friendship,  
A bite of tangy guava...



# With

**Sudakshina Mukherjee**

Do I Know you?  
 Are you with me – or not?  
 What does being “with” mean to you?  
 Is it a thin layer of ice, or just a pinch of spice?  
 Is it as sweet as cake, or sour and fake?  
 Is being “without” the new “with”?  
 Should I announce this on a plinth?  
 Do I Know you?  
 Are you with me – or not?  
 What does being “with” mean to you?  
 Does it matter anymore?  
 Has it become such a bore?  
 To Know, to Care, to Be – with you, with them, with me?  
 Should “Without” be the new “With”?  
 Do you want to announce this on a plinth?  
 Do I Know you?  
 Are you with me – or not?  
 What does being “with” mean to you?

## চাঁদ সদাগর – কিংবদন্তি?

### হিমাদ্রী শেখর দত্ত

মনসামঙ্গল কাব্য বিশদ করে হয়তো অনেকেই পড়েছেন, আমি অবশ্য ক্লাস ইলেভেনে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ার সময় পড়েছিলাম কেবল। তখন থেকেই এই কাব্যের কিংবদন্তি পুরুষ চাঁদ সদাগরের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই। একজন ব্যবসায়ী মানুষ, নিজের ব্যবসা ছাড়া, কেবল ভগবান শিবকে তার আরাধ্য হিসেবে মানেন ও পূজা করেন, এর মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্বের ব্যাপার ছিল বলে আমার তো মনে হয় নি কখনও। তার মনের থেকে অন্য কোন দেবতা বা দেবীকে পূজা না করার ইচ্ছা তিনি দেখাতেই পারেন। তা সত্ত্বেও, যখন দেবী মনসা চাঁদের কাছে তাঁরও পূজা করবার ও তাঁকে মানবার জন্যে বলেন, আর চাঁদ তা সরাসরি প্রত্যাখান করেন, তখন তাকে অনেক কষ্ট আর ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছিলো মা মনসার শাপে। আজকের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এমন কেসে হয়ত দেবতারাই পিছিয়ে যাবেন, কারণ আজকের মর্ত্যের মানুষদের নাকাল করতে পারা ততটা সহজ বোধহয় নয়।

আজকে কেন এইসব লিখছি, তার মুখবন্ধ হিসেবে এটুকু বলতে পারি – সম্প্রতি আমি আমার শ্যালিকার বাসায় যাচ্ছিলাম, টালিগঞ্জে, কুদঘাটে। আগে টালিগঞ্জে বুড়িগঙ্গার ওপর দিয়ে কুদঘাট বাস টার্মিনাস থেকে রিস্কায় ওদের বাড়ি যেতে হতো। বুড়িগঙ্গা অবশ্য টালির নালা নামে বেশী পরিচিত ছিলো; বুড়িগঙ্গা সময়ের একটা বহমান অতীত যা এই শহর কলকাতার বুকে চার-পাঁচ বছর আগেও বিদ্যমান ছিলো। আজ তার ওপরে শহিদ ক্ষুদ্রিরাম মেট্রো স্টেশন। বুড়িগঙ্গা আজ কয়েক হাজার টন লোহা, সিমেন্ট আর বালির তলায় চিরদিনের মতো অতীত হয়ে গেছে। কথিত আছে, এই বুড়িগঙ্গার বুকেই লম্বা লম্বা পাল তুলে একদিন চাঁদ সদাগরের নৌকার বিশাল বাহিনী বাণিজ্য যেতো। নদীপথ পেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়তো সেই সব মা লক্ষ্মীর ময়ূরপঙ্গীরা। কথাতেই আছে বাণিজ্য বসতি লক্ষ্মী। অথচ ঘরে ধনদৌলত নিয়ে ফেরার মুখেই চাঁদ সদাগর তার সকল নৌ-সম্পদ, মাঝিমাল্লা সাথে সব কিছু হারান মা মনসার অভিশাপে। অকালে সমুদ্রের বুকে ঝাড় তুফান তুলে মনসাদেবী সকলকে ডুবিয়ে মারেন, এমন কি ধনসম্পত্তি রেহাই পায় নি, কেবল নিজের জীবনটুকু নিয়ে চাঁদ সদাগর কোন রকমে নিজের বসত বাটিকায় পৌঁছান। বাণিজ্যে যাবার আর কোন উৎসাহ খুঁজে পান না চাঁদ সদাগর। ইতিমধ্যে তার ছয় ছেলেরও সর্পদংশনে প্রাণনাশ হয়েছে। সেটাও মা মনসার জন্যেই। স্ত্রী-র সাথেও মন কষাকষি চূড়ান্ত পর্যায়ে। স্ত্রী নিজেও হাজার বার অনুরোধ করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, যে অন্ততঃ একবার মা মনসার পায়ে ফুল দাও, তোমার সব দোষ মাফ হয়ে যাবে। এদিকে যার আরাধনা চাঁদ মন প্রাণ দিয়ে করতেন, সেই ভোলা মহাদেবও চাঁদকে চাইলে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু তেমন করে কিছুই তিনি করেন নি। এটা কি মহাদেবের প্যাসিভ সাহায্য করা নয় মা মনসাকে? আর অ্যাকটিভলি চাঁদকে ঠকানো? আমার তো তাই মনে হয়। জাহাজ ডুবির সময় মা দুর্গা, চাঁদকে বাঁচাতে গেলেও, স্বয়ং মহাদেব তাকে বারণ করেন, মনসার অনুরোধে! ভেবে দেখুন একবার। পরে চাঁদকে পেট চালানোর জন্যে ভিক্ষাবৃত্তিও গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও চাঁদ শিব-দুর্গার পূজা প্রতিদিন নিষ্ঠা সহকারে শেষ করে, তবেই মাধুকরীতে বেরোতেন। কিছুতেই চাঁদকে বাগে আনতে না পেরে এর পরে মা মনসা স্বর্গের দুই নর্তক-নর্তকীর সাহায্য নেন। এদেরই একজন চাঁদ সদাগরের সপ্তম পুত্র লখীন্দুর, আর একজন বেঙ্গলা, যিনি চাঁদের এক নিকট বন্ধুর বাসায় জন্ম নেন।

সময় কালে বেঙ্গলার সাথে লখীন্দুরের বিবাহ হয়, আর বিবাহের রাতেই সর্পদংশনে নিজের বাসরঘরেই লখীন্দুর মারা যান। মৃত স্বামীর শর নিয়ে বেঙ্গলা কলার ভেলায় করে স্বর্গের উদ্দেশ্যে ভেসে পড়েন। তখনকার

দিনে সাপে কাটা মৃতদেহকে কলার ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। জালানো হতো না। অবশেষে লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে দেওয়াতে, বেহুলা তার অনড় শুশুরকে মনসার পূজা করাতে সক্ষম হন, যদিও চাঁদ সদাগর মনসার দিক থেকে পেছন ফিরে, বাঁ হাতে মা মনসার উদ্দেশ্যে ফুল ছুঁড়ে দেন। মা মনসা অবশ্য তাতেই সন্তুষ্ট হন, আর চাঁদ সদাগরের আগের সকল মৃত ছেলেরাও মা মনসার কৃপায় বেঁচে ওঠে।

চাঁদ সদাগর এ বাংলার লোক ছিলেন না। মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা বিপ্রদাস পিপলাই লিখেছেন চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী সপ্তগ্রাম ও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত ত্রিবেণী হয়ে সমুদ্রের পথে যাত্রা করত। সপ্তগ্রাম বাংলাদেশে অবস্থিত। দ্বিতীয়বার নিজের সব কিছু হারিয়ে তিনি চম্পকগ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে ওখানেই সব কিছু বানিয়ে নেন। শুনেছি এই চম্পক গ্রাম অধুনা বাংলাদেশে বগুড়ার কাছে। ওখানে একটি উঁচু পাহাড়ের মাথায় কিছু ধ্বংসাবশেষও আছে, যাকে লোকে বেহুলা লখীন্দরের বাসরঘর বলে দাবী করে। বগুড়া জেলায় সাপের উপন্দব এখনও প্রচুর।

অনেকে মনে করেন, চম্পক নগর অঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল। মহাস্থানগড়ের ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং বগুড়া শহরের ৯ কিলোমিটার উত্তরে বগুড়া-রংপুর সড়ক থেকে ১ কিলোমিটার দূরে গোকুল মেধ নামে একটি জায়গা রয়েছে। এই জায়গাটির স্থানীয়ভাবে বেহুলার বাসরঘর বা লখীন্দরের মেধ নামে পরিচিত। ১৯৩৪-৩৬ সালে এখানে খননকার্যের সময় একটি সারিবদ্ধ অঙ্গনে ১৭২টি আয়তাকার বন্দ ঘরের সন্ধান মিলেছে। এটি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হয়। স্থানীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই স্থানটি বেহুলা ও লখীন্দরের সঙ্গে যুক্ত।<sup>১</sup>

পুরাতন ভারতের ম্যাপে প্রধান তিনটি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়, যদি দক্ষিণ থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে এগোনো যায়, তাহলে এগুলি হলো যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ। চাঁদ সদাগর ছিলেন এই অঙ্গের নিবাসী। আবার কলকাতার পার্শ্ববর্তী হাওড়ার একটি মন্দিরকে চাঁদ সদাগরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়।<sup>২</sup> হয়তো কখনও বাণিজ্যে বেরিয়ে হাওড়ায় গঙ্গা উপকূলে কিছুদিন ছিলেন, তখন ঐ মন্দিরটি তৈরী করান। মন্দিরে শিব-দূর্গার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এখনও সেই মূর্তি পূজিত হয়ে থাকে। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গের গৌড়ের নিকট একটি ধ্বংসস্তুপকে চাঁদ সদাগরের বাড়ি মনে করা হয়।<sup>৩</sup>

চাঁদ সদাগরকে কাব্যের বাইরে জনসমাজের মধ্যে একজন সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। তার সমস্ত কাজ কর্মের, তার বাসস্থানের, তার ছেলের বাসরঘর সকল কিছু আমরা এই দুই বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে খুঁজে নিয়েছি। ঐতিহাসিকরা তা নিয়ে কি বলেন, বা কি মানেন এই তর্কাতর্কিতে আপাতত না গিয়েও, এটুকু তো মেনে নেওয়াই যায়, যেমন রামায়ণ বা মহাভারতের কাব্যের মহানায়কেরা আমাদের জীবনে এক গভীর বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, ছোট মাপের হলেও চাঁদ সদাগরের জীবনীও আমাদের নিত্যকার স্বীকৃতিতে অভিষিক্ত। বেহুলার গান, চাঁদের গান ওপার বাংলায় তো শোনাই যায়, আমাদের এখানেও কেউ কেউ এই সকল গান জানেন, করেন। বিপ্রদাস পিপলাই-এর কাব্যের এখানেই সবচেয়ে বড় পাওয়া। আর মা মনসা ও দুই বাংলার ঘরে ঘরে আজ সর্পদেবী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। পূজনীয়া আর পূজারী একই সাথে সমাদৃত, এমন বোধহয় সচরাচর দেখা যায় না। সব কিছু ছেড়ে দিলেও, হয়তো বেশী দূরের অতীতও নয়, আমরা সকলে একই ভূখণ্ডের নিবাসী ছিলাম, এমন কি বলা যায় না? হয়তো চাঁদ সদাগর আমারই বংশলতিকার কোন প্রাচীন মাইলস্টোন, যেখান থেকে আমার যাত্রা হয়েছে শুরু। কে বলতে পারে?

১, ২, ৩ – সূত্র উইকিপিডিয়া, [http://bn.wikipedia.org/wiki/চাঁদ\\_সদাগর](http://bn.wikipedia.org/wiki/চাঁদ_সদাগর)

## লালিকা

### কৌন্তত অধিকারী

#### ইস্তাহার

\*\*\*\*\*

শ্রী শ্রী ঘাপলাবাজায় নমঃ

ঠেসমূল কংগ্রেস

৪২০ নং মগেরমুল্লুক, ঝামেলাপাটি

আমরা ধর্মঘট, অবরোধ, অনশন ইত্যাদি সর্বপ্রকার অসুবিধাকারী কর্মানুষ্ঠান উপযুক্ত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাধা করিয়া থাকি। কভু ভারতীয় নির্জনতা দলের সঙ্গে মিলিয়া, কভু না মিলিয়া, কভু ঝোঁকসভায় থাকিয়া, কভু না থাকিয়া আমরা এক অনন্য নজির সৃষ্টি করিয়াছি।

যদি আপনারা কেউ আমাদের সাহায্যে ধর্মঘট করতে ইচ্ছুক হন, তবে এসএমএস করুন — ৪২০ নম্বরে। অবস্থান বিক্ষেপ করতে হলে লিখুন A, সমাবেশ করতে হলে লিখুন B, ১২ ঘন্টা ধর্মঘট করতে হলে লিখুন C, ২৪ ঘন্টা ধর্মঘট করতে হলে লিখুন D। মূল্য জনপ্রতি ১ ভোট। এর সঙ্গে আমরা এক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেছি — যাঁরা এসএমএস করবেন তাঁদের মধ্য থেকে ভাগ্যবান বিজেতাদের নির্বাচন করা হবে। প্রথম পুরস্কার আমাদের নেতা শ্রী নির্মম বন্দ্যোঃর সহিত এক মধ্যে অনশন।

**সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!**

ইদানিং ঢংবেশ, টেক্সিশাল ইত্যাদি নানা দল আমাদের দুর্নিবার খ্যাতি দেখিয়া ধর্মঘটের জালি ব্যবসা খুলিয়া বসিয়াছে। সাবধান! তাহাদের প্রচারপত্রের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

এই ইস্তাহারটি হঠাৎ একদিন কুড়িয়ে পেয়ে পালকি ৪'য়ে ছাপিয়ে দিয়েছিলাম ২০০৮ সালে। তারপর ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, অনুমান করা হচ্ছে এই ২০১১'য় শ্রীনির্মম বন্দ্যোঃ'ই একজন ভাগ্যবান বিজেতা হতে চলেছেন। কিন্তু যাক সেসব কথা, বক্ষিম বলেই গেছেন, পেয়াদার শুশুরবাড়ি থাকতে পারে কিন্তু বাঙালির পলিটিক্স নাই। অতএব ওসব রেখে, অর্থাৎ লালিকার উদাহরণ<sup>১</sup> ফিরি না করে সরাসরি লালিকালোচনায় আসি।

লালিকা<sup>২</sup> শব্দটি প্যারাডির বাংলা হিসাবে অনেকেই চালাবার চেষ্টা করেছেন<sup>৩</sup>, কিন্তু মোটামুটি শব্দটা সবাই জানলেও নিয়মিতভাবে কেউ ব্যবহার করেন না আজকাল। আমরা প্যারাডি শব্দটিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। তা যে নামেই ডাকা হোক, বাঙালি লালিকারসে চিরকালই লালায়িত। বর্তমানে ইন্টারনেটে নিত্যই হাত-ফিরি হয়ে

১ – বিজ্ঞাপনটির উৎস সুরুমার রায়ের ‘হ্যবরল’ গল্পে শ্রীকাকেশ্বর কুচকুচে’র হ্যান্ডবিল।

২ – আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায়, ‘আমোদজনক উত্তর’।

৩ – প্রথম প্যারাডি অর্থে প্রচলন করেন সতীশচন্দ্র ঘটক। পক্ষে ছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বেড়ায় বক্ষিমচন্দ্রের জনপ্রিয় ব্যঙ্গরচনা ‘বাবু’র আধুনিক রূপায়ণ, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে<sup>৪</sup>; ঘোরে ‘রামের বিলাপ’ এর মডার্ন রিমিস্ট<sup>৫</sup>। সেই সাদাকালো চলচিত্রের যুগেই, তরুণ মজুমদার তাঁর বিখ্যাত ছবি ‘শ্রীমান পৃথীরাজ’এ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচলিত গুরু-বন্দনা ‘তবসাগর তারণ কারণ হে’র সুরে গান করিয়েছিলেন ‘নরধামে সাক্ষাৎ ঈশ্বর হে ... কৃপা করি কর মোরে রায়বাহাদুর’। হাসিঠাটা করার ব্যাপারে বাঙালি রক্ষণশীল নয়, লোকগাথায় দেবদেবীরা তার অনেক খোরাকও জুগিয়ে গেছেন।

কিছুদিন আগে রসসাহিত্যিক পবিত্র অধিকারীর প্যারাডি-সঙ্কলন ‘তিনশ বছরের বাংলা প্যারাডি’ বইটি কিনেছিলাম। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনার সুযোগও হয়েছিল, যা নিয়ে লিখেছিলাম পালকি ৫’য়ে। তাঁর থেকেই জেনেছিলাম এই দুর্লভ তথ্যটি, যে প্রথম মহিলা প্যারাডিকার হলেন স্যার উমেশ চন্দ্র বোনাঙ্গীর সহোদরা মোক্ষদায়িনী দেবী, যিনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলার মেয়ে’র প্যারাডি করেন ‘বাংলার বাবু’। আমার প্রিয় যে প্যারাডিগুলি এখানে দিয়েছি তার অধিকাংশই তাঁর বইটি থেকে সংগ্রহিত। দুঃখের বিষয়, দেশ ভাগ হওয়ার পরবর্তী সময়ের পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ থেকে কোনো প্যারাডি নেই এই সঙ্কলনে। তাই সে অভাবের যৎসামান্য পূরণ করতে, এগোবার আগে আমার প্রিয় ছড়াকার মাসুদ মাহমুদের একটা ছোট্ট (বড়দের) প্যারাডি<sup>৬</sup> শুনিয়ে যাই—

স্বামী স্বামী ডাক পাড়ি  
স্বামী আমার কার বাড়ি?  
আয় রে স্বামী ঘরে আয়  
পিল খাওয়া মোর বৃথা যায়।

গল্পসম্পে ফিরি একটু। চিত্তরঞ্জন লাহা তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যে প্যারাডি’ বইয়ে প্যারাডির আরেকটি নাম দিয়েছেন ‘পাল্টাগান’। কথাটা মন্দ নয়, বিশেষত লোকসাহিত্যে তরজা কবিগান ইত্যাদিতে গানের পালটা গান হিসাবেই প্যারাডি প্রায়ই করা হত, যার সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ বোধহয় আজু গোঁসাই যিনি কালীভক্ত রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতগুলির নিয়মিত প্যারাডি করতেন। ‘ডুব দে রে মন কালী বলে’ কে তিনি বানালেন—

ডুবিসনে মন তড়ি ঘড়ি।  
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥  
একে তোমার কফোনাড়ি ডুব দিও না বাড়াবাড়ি  
তোমার হলে পরে জ্বরজ্বারি মন যেতে হবে হবে যমের বাড়ি॥



কবি কালিদাস রায় আবার বলেছিলেন, বাংলায় প্যারাডি বিলেত থেকে আমদানি, তাই সেদেশের শাস্ত্র যেভাবে বলে সেভাবেই প্যারাডি আলোচনা করা উচিত। আমার সে কথায় কিছু আপত্তি আছে — লোকগানে আবহমান প্যারাডির ধারা আমার মতে সার্থকভাবেই প্যারাডি, ইংরেজি সংজ্ঞা অনুযায়ীও; প্যারাডি এদেশে সম্পূর্ণ বিলিতি অবদান নয়। আবার প্রচলিত লোকগান, পাঁচালী, কীর্তন ইত্যাদির প্যারাডি আধুনিক লেখকরাও করেছেন। আমার প্রিয় কয়েকটি শোনাইঃ

৪ — ‘সফো’, রোহন কুন্দুস।

৫ — “বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে, কোথা গেলো সীতা মোর খেলো নাকি বাঘে...”

৬ — ছোটদের প্রচলিত ছড়া, “খোকন খোকন ডাক পাড়ি, খোকন গেছে কার বাড়ি? আয়রে খোকন ঘরে আয়, দুধ মাখা ভাত কাকে খায়।”

কাজী নজরুল ইসলাম কীর্তনের ধাঁচে লিখেছিলেন এই সুবিদিত প্যারডি'খানা—

আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিনামে লুচি  
আমি ভোজনের লাগি করি ভজন।  
আমি মালপোর তল্পী বাঁধিয়া  
    এ কল্পলোকে এসেছি মন।  
রাধাবল্লভীর লোভে পূজি রাধাবল্লভে  
রসগোল্লার লাগি আমি রাস মোছবে।  
আমার গোল্লায় গেছে মন  
    রসগোল্লায় গেছে মন।

ও তো রসগোল্লা কভু নয়

যেন ন্যাড়া-মাথা বাবাজী থালাতে হয়েন উদয়!

আর গজা দেখে প্রেম যে গজায় হৃদিতলে রে,  
পান্তোয়া দেখে প্রাণ নাচে হরি বলে রে!  
ঐ গোলগাল মোয়া এই মায়াময় সংসার দেয় গো ভুলিয়ে,  
আর ক্ষীরের খোয়াতে খোয়াইতে কুল মন ওঠে চুলবুলিয়ে।  
আমার মন বলে হরি হরি হাত বলে হর হে,  
যত অরসিকে তেড়ে আসে বলে ব্যাটায় ধর হে!  
আর এই সংসারে রসিক শুধু রাঁধুনী আর ময়রাই—  
    সেই দুই ভাই আজি এসেছে রে!

‘দক্ষিণ রায়’ গল্পে পাঁচালীর চালে পরশুরাম ওরফে রাজশেখের বসু লিখলেন ‘রায়মঙ্গল’—

নমামি দক্ষিণরায় সৌন্দরবনে বাস,  
হোগলা উলুর ঝোপে থাকেন বারোমাস।  
দক্ষিণেতে কাকদ্বীপ শাহাবাজপুর,  
উত্তরেতে ভাগীরথী বহে যত দূর,  
পশ্চিমে ঘাটাল পুবে বাকলা পরগণা—  
এই সীমানার মাঝে প্রভু দেন হানা।  
গোবাঘা শার্দুল চিতে লক্ষ্মি হৃড়ার  
গেছো-বাঘ কেলে-বাঘ বেলে-বাঘ আর  
ডোরা-কাটা ফোঁটা-কাটা বাঘ নানা জাতি—  
তিন শ তেষত্তি ঘর প্রভুর যে জাতি।  
প্রতি অমাবস্যা হয় প্রভুর পুণ্যাহ,  
যত প্রজা ভেট দেয় মহিষ বরাহ।  
ধূমধাম নৃত্য গীত হয় সারানিশি,  
গাঁক গাঁক হাঁক ডাকে কাঁপে দশদিশি।

যারা ময়দা খেয়ে মালপো ঢালে  
সেই দুই ভাই আজি এসেছে রে!  
আমি চিনি মেখে গায় যোগী হব দাদা  
    যাব ময়রার দেশে,  
আর রসকরার কড়াই-এ ডুবিয়া মরিব  
গলে সন্দেশ ঠেসে।

কলাবৎ ছয় বাঘ ছত্রিশ বাঘিনী  
ভাঁজেন তেঅটতালে হালুম রাগিনী।  
ডেলা ডেলা পেলা দেন শ্রীদক্ষিণ রায়,  
হরষিত হেও সবে কামড়িয়া খায়।  
প্রভুর সেবায় হয় জীবহিংসা নিত্য,  
পহরে পহরে তাঁর জ্ঞ'লে ওঠে পিত্ত।  
বড় বড় জন্তু প্রভু খান অতি জল্দি,  
হিংসার কারণে তাঁর বর্ণ হৈল হল্দি।  
ছাগল শূয়ার গরু হিন্দু মুছলমান,  
প্রভুর উদরে যাওঁ সকলে সমান।  
পরম পন্ডিত তেহ ভেদজ্ঞান নাখিঁও,  
সকল জীবের প্রতি প্রভুর যে খাঁখিঁও।  
দোহাই দক্ষিণরায় এই কর বাপা—  
অন্তিমে না পাখিঁও যেন চরণের থাপা।

রন্ধনচনার শেক্সপীয়ার বোধহয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর, যাঁর স্বতস্ফূর্ততা প্রবাদপ্রতিম। তিনি প্রচুর প্যারডি লিখেছেন, আর শুধু তাই নয়, সেগুলিতে স্বচ্ছন্দ সুরারোপ করে গেয়েও শোনাতেন। অতুলপ্রসাদ সেনের বিখ্যাত দেশাত্মক গান ‘মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা’র হতাশাবাচক প্যারডি<sup>৭</sup> গেয়ে স্বয়ং অতুলপ্রসাদকেই শুনিয়েছিলেন দাদাঠাকুরের সহচর ও জীবনীকার নলিনীকান্ত সরকার। আর তাঁর পর ওনার প্যারডি ও অন্যান্য গানকে জনপ্রিয় করে রাখেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বহু প্যারডি গানরূপে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল, যার মধ্যে একটি – শোনাবার উপায় নেই, পড়াই – শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম অনুসরণে টাকার অষ্টোত্তর শতনাম—

জয় ধন জয় অর্থ রাজমূর্তিধর।  
 রৌপ্যখণ্ড কর কৃপা সুখের সাগর॥  
 জয় মুদ্রা জয় টাকা জয় জয় আধুলি।  
 কৃপণের প্রাণধন দাতার কাছে ধূলি॥  
 টাকাকড়ি বিনে রে প্রচুর অর্থ বিনে।  
 দুঃখে দরিদ্রের জন্ম যায় দিনে দিনে॥  
 দিন গেল খেটে খেটে রাত্রি গেল শুতে।  
 না পাইনু দুই বেলা পেট ভরে খেতে॥  
 টাকা উপায়ের তরে সংসারে আইনু।  
 অভাবে পড়িয়া শেষে ভ্যাবাচ্যাকা খাইনু॥  
 বন্যার মত পুত্র কন্যা এল ঘরে।  
 কালরূপে কন্যাদায় চেপে বসে ঘাড়ে॥  
 যখন টাকা জন্ম নিল টাঁকশাল ভিতরে।  
 মর্ত্যলোকে নরগণ লোভ বৃষ্টি করে॥  
 মহাজন রেখে এল খাতকের ঘরে।  
 সুদর্শনে প্রভু সেথা দিনে দিনে বাড়ে॥  
 দেনদার রাখিল নাম কর্জ আর দেনা।  
 মহাজন নাম রাখে দাদন লহনা॥  
 ডিক্রীদার নাম রাখে মায় খরচা দাবি।  
 দেনমোহর নাম রাখে মুসলমানের বিবি॥  
 পশ্চিমবঙ্গের লোক টাকা নাম রাখে।  
 পূর্ববঙ্গবাসী সব টাহা বলে ডাকে॥  
 সাহেব রাখিল নাম ‘রূপি’ আর ‘মনি’।  
 বিলাতে হইল নাম পাউন্ড শিলিং গিনি॥

‘ডলার’ রাখিল নাম আমেরিকাবাসী।  
 ‘ফ্র্যাঙ্ক’ নাম ফ্রান্স দেশে রাখিল ফরাসী।  
 ‘মার্ক’ নাম রাখিল জার্মান এস্পায়ার।  
 রুসিয়ায় ‘রুবল’ আর সুইডেনে ‘ক্রোনার’॥  
 রূপেয়া রাখিল নাম দেশোয়ালি ভাই।  
 টঙ্কা নাম রাখিলেন উড়িয়া গোঁসাই॥  
 তহবিল নাম রাখে সওদাগর ধনী।  
 ‘ফেয়ার’ রাখিল নাম রেলওয়ে কোম্পানি॥  
 ‘ভিজিট’ রাখিল নাম ডাক্তারের দলে।  
 ‘ফি’ নাম দিল যত মোক্তার উকিলে॥  
 মুহূরী মশাই নাম রাখিল তহুরী।  
 পাটনী রাখিল নাম পারানির কড়ি॥  
 খাজানা ও ‘সেস’ নাম রাখিল ভূস্মামী।  
 গুরুদেব নাম রাখে বার্ষিকী প্রণামী॥  
 দক্ষিণ রাখিল নাম পুরূত ঠাকুরে।  
 বেতন মাহিনা নাম রাখিল চাকুরে॥  
 বৈতরণী ধেনুমূল্য রাখে অগ্রদানী।  
 সকালে বউনী নাম রাখিল দোকানী॥  
 ভিক্ষুক রাখিল নাম ভিক্ষা যৎকিঞ্চিত্।  
 বিদায় রাখিল নাম ব্রাক্ষণ পণ্ডিত॥  
 বায়না রাখিল নাম যাত্রা খেমটা দল।  
 লৌকিকতা নাম রাখে কুটুম্ব সকল॥

৭ – “তোমার বাঁচার নাইকো আশা, আ মরি বাংলা ভাষা...”

লাভ নাম রাখিলেন যিনি ভাগ্যবান।  
 দেওলিয়া দুঃখে নাম রাখিল লোকসান॥  
 উপরিপাওনা নাম রাখে ঘুষখোর।  
 বামাল রাখিল নাম ডাকাইত চোর॥  
 বানি নাম রাখিলেন শিল্পকরগণ।  
 খোরাকী রাখিল নাম পেয়াদা পিয়ন॥  
 ডালি নাম রাখিলেন উপরওয়ালা।  
 পণ নাম দিল যত বেটা বেচা—॥  
 ‘টি-এ’ নাম রাখিলেন ‘টুরিং অফিসার’।  
 ‘হল্টিং’ ও ‘মাইলেজ’ নামান্তর যার॥  
 সরকার রাখিল নাম টেক্স ক’রকম।  
 ‘পার্সনাল’ ‘লেটারিন’ আর ‘ইন্কম’॥  
 ‘পেন্সন্’ রাখিল বুড়ো শেষ করে গোলামী।  
 বেকুব রাখিল নাম আকেল সেলামী॥  
 নজর সেলামী রাখে জমিদার ধনী।  
 গোমস্তা রাখিল নাম নিকাসী পার্কণী॥  
 ভৃত্যগণ নাম রাখে ইনাম বখ্সিস্।  
 নোট নামে প্রকাশিল ‘করেন্সি আপিস’॥  
 ফৌজদারী আসামী রাখে নাম জরিমানা।  
 আদালতে নাম হল কোর্টফি তলবানা॥  
 ভোগ ও মালসা নাম দেবতা মন্দিরে।  
 সিন্ধী নাম রাখিলেন মুসলমানী পীরে॥  
 দালাল সকলে নাম রাখিল দালালী।  
 বলি নামে অভিহিত করিল মা কালী॥  
 তীর্থের স্থানেও তব বাঁধা আছে রেট।  
 জগন্নাথে আট্কা আর বৃন্দাবনে ভেট॥  
 দুঃখারি দৈন্যনিপাত দারিদ্র্যভঙ্গ।  
 রৌপ্যাদি রূপেতে কর লজ্জা নিবারণ॥  
 নানারূপে হয় তব ব্যাক্ষে ব্যাক্ষে স্থিতি।  
 আয়রণচেষ্টশায়ী অগতির গতি॥  
 রসময় তব রসে ডাগর মানুষ।  
 কৃশজনে কর তুমি নাদুস্ নুদুস্॥

শালগায়ে স্ফীতোদর শ্রীমান্ সেজন।  
 যার ঘরে দয়া করা দাও দরশন॥  
 ফ্রেঞ্চকাট শাশ্রু আর টেরীযুক্ত কেশ।  
 পতিত হলেও হয় উন্নত বিশেষ॥  
 চিন্তানাশ কর তুমি দেব চক্রাকার।  
 দিনান্তে জুটাও তুমি দীনের আহার॥  
 অনন্ত টাকার নাম অপার মহিমা।  
 কুবেরাদি দেবগণ দিতে নারে সীমা॥  
 বি.এ., এম.এ. পাশ কিস্বা সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান।  
 তথাপি না হয় লোকে টাকার সমান॥  
 সেই টাকা সেই নোট ভজ নিষ্ঠা করি।  
 টাকার সহিত ফিরে আপনি ট্রেজারী॥  
 শুন শুন ওরে ভাই টাকা সংকীর্তন।  
 যে টাকা হইলে হয় দারিদ্র্য মোচন॥  
 টাকা টাকা ভজ জীব আর সব ঘিছে।  
 পলাইতে পথ নাই তাগাদা আছে পিছে॥  
 টাকা নাম পয়সা নাম বড়ই মধুর।  
 যেজন না ভজে টাকা সে হয় ফতুর॥  
 রথচাইল্ড আদি যারে ধ্যানে নাহি পায়।  
 সে টাকা সঞ্চিত নৈলে কি হবে উপায়॥  
 কন্যাদায়গ্রাস্তের উদর বিদারণ॥  
 বেটার বাপের কর তবিল পূরণ॥  
 কাইজারে ছলিবারে দিলা প্রলোভন।  
 এলাইজদের লজ্জা কইলে নিবারণ॥  
 দীনবাঙ্গা পূর্ণ কর ওহে চক্রাকার।  
 কাবুলে আমীর বধ রসিয়ায় জার॥  
 তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান তুমি সারাংসার।  
 তোমা ভিন্ন দেখি প্রভু সব অন্ধকার॥  
 তব পদে কোটি কোটি নমস্কার করি।  
 অষ্টোত্তর শতনাম রচিল ফেরারী॥  
 তোরে উঠে এই নাম যে করে বর্ণন।  
 হলেও হইতে পারে দারিদ্র্য মোচন॥



আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর গানেরই বোধহয় সবচেয়ে বেশী প্যারডি হয়েছে॥ কিন্তু তিনি নিজেও অল্পস্বল্পে প্যারডি করতেন। একটা ঘটনা এইরকম – রবীন্দ্রনাথ পিঠেপুলি খেতে বড় ভালবাসতেন (কে না বাসে?); তাই শুনে একদিন শান্তিনিকেতনের এক মহিলা পিঠে তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে। পরে একদিন জানতে চাইলেন, গুরুদেব, সেদিন কেমন খেলেন? রবিবাবু লোকগানের<sup>৮</sup> সুরে উত্তর দিলেন—

লোহা কঠিন, পাথর কঠিন, আর কঠিন ইষ্টক।

তার অধিক কঠিন কন্যে, তোমার হাতের পিষ্টক॥

শান্তিনিকেতনের আরেকটা গল্প হোক তাহলে। সেখানে নগেন আইচ নামে একজন বাংলা পড়াতেন সেই যুগে। এমনিতে তিনি গানটান আদৌ গাইতেন না, কিন্তু রাত গভীর হলে তাঁকে গানে পেত, তিনি জানলার পাশে বসে আপন মনে গান ধরতেন। পাশেই থাকতেন দিনু ঠাকুর, তাঁর ঘুম যেত চটকে। একদিন নগেনবাবু অমন গান শুরু করতেই রেগে গিয়ে তিনি এস্রাজ বাগিয়ে গান<sup>৯</sup> ধরলেন—

গভীর রাতে তোমার অত্যাচার

নগেন আইচ শক্র হে আমার।

তোমার গান কানাসম

আসে না ঘুম নয়নে মম

দুয়ার খুলি হে মোর যম

তোমায় তাড়াই বারে বার।

রবীন্দ্রনাথ যেমন টুকটাক প্যারডি করতেন, তেমনি প্যারডির সমাদরও করতেন। সতীশচন্দ্র ঘটক যখন তাঁর ‘সোনার তরী’-র প্যারডি করলেন ‘সোনার ঘড়ি’, তখন তিনি অনেক প্রশংসা করেছিলেন।

গগনে উদিল উষা হল ফরসা,

ঘরে একা বসে আছি, নাহি ভরসা;

রাশি রাশি ভারা ভারা, বই পড়া হল সারা,

ব্রীফ নাই পড়ি ধারা আঁথি সরসা;

পড়িতে পড়িতে বই হল ফরসা।

ওগো তুমি কোথা যাও বাড়ি কি দেশে?

বারেক দাঁড়াও মোর নিকটে এসে;

যেও যেখা যেতে চাও, যারে খুসি কেস্ দাও,

আগে তো তামাকু খাও ক্ষণেক বসে;

উপদেশ কিছু মোর লইও শেষে।

একখানি ছোট মেস্ আমি একেলা,

চারিদিকে বকা ছেলে করে জটলা;

দ্যালে ঝোলে দেশী-আঁকা, কালীতারা কালি মাখা,

আমদানি নাহি টাকা প্রভাত-বেলা,

চেয়ারেতে বসে তাই ভাবি একেলা।

খাও খাও, রাখ কেন মেঝের পরে?

আছে কিছু? নাই বুঝি, দিতেছি ভরে;

এতকাল পুঁথি খুলে, যা কিছু খেয়েছি গুলে,

খাটাব তা বিনা মূলে তোমারি তরে

আমারে উকীল দাও করুণা করে।

পান খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে কে আসে দ্বারে?

মক্কেল মনে হয় যেন উহারে,

ভাবি চালে চলে যায়, কোন দিকে নাহি চায়,

আশাগুলি নিরূপায় করে হাহা-রে,

মক্কেল মনে হয় যেন উহারে।

কেস্ নাই কেস্ নাই ছোট চাকরি,

মামলা বলুন দেখি কেমন করি?

এত বলি ধীরে ধীরে গেল চলি সে বাহিরে,

শূন্য চেয়ারে আমি রহিনু পড়ি;

চেয়ে দেখি নিয়ে গেছে সোনার ঘড়ি।

৮ — “নিম তিতা, নিশিন্দা তিতা, তিতা পানের খ’র...”, যা অনুসারে জনপ্রিয় আধুনিক গান “মেঘ কালো, আঁধার কালো...”

৯ — “আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার...” – রবীন্দ্রসঙ্গীত

ওই একই কবিতার আরো দুটো প্যারডি শোনাই। লক্ষ্য করবেন, তিনটে প্যারডিরই কিন্তু ফর্ম সামান্য হলেও আলাদা। প্রথমে সজনীকান্ত দাসের ‘মানের তরী’—

তবনে গরজে প্রিয়া, নাহি ভরসা—

কখন ঝরিবে জানি মান-বরষা।

করে বুঝি করে তাড়া,

রাশি রাশি ভারা ভারা

বরষিয়া গালিধারা খর-পরশা।

ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে নাহি ভরসা।

একখানি ছোট ঘর, আমি একেলা—

রাস্তায় ছেলেগুলো করিছে খেলা।

দেয়ালে খোকার আঁকা

ছবি কত মসীমাখা,

খুকী শুয়ে লেপ-ঢাকা সকালবেলা,

মন দুখে নলমুখে আমি একেলা।

রাগ করে গেছে ভোরে গিন্নী হা রে—

মান ভাঙ্গা হবে দায়, চিনি উহারে!

দুমদাম আসে যায়,

মোর পানে নাহি চায়,

ডাকি, আর কি উপায় — স্যাকরাটারে,

গড়াইতে হল দেখি পুষ্পহারে।

ওগো তুমি দেখে যাও আছি পিতেশে—

ভেজাবে ভেজাও চিঁড়া, এখানে এসে—

মিছে কেন আস যাও—

যাহা খুশী গালি দাও,

শুধু চোখ তুলে চাও, ক্ষণিক হেসে।

পান সাজা হয় না-কি এখানে এসে!

চাও যত নাকখত দিব তত রে—

আর থাক — দেখ নাক গিয়াছে ছড়ে;

এত ভালবাসি বলে

পার দিতে কান মলে—

দেখিবে কে এস চলে — এস ভিতরে—

শাস্তি যা দেবে দাও চড়ে চাপড়ে।

রাগ নাই রাগ নাই — হে সুন্দরী—

চুম্বন দাও তবে করঞ্চা করি;

খুকী দেখ পাশ ফিরে—

কথা কও ধীরে ধীরে,

বাহু পাশে মোরে ঘিরে রাখ গো ধরি—

খালি করে দিয়াছ তো মানের তরী!

আর শেষে, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের আধুনিকতর ‘লেকের লিলি’—

তখন স’নটা বাজে লেকের ধারে

লিলি সেন বসে আছে জল কিনারে

মাথার উপরে চাঁদ                    রচিছে কুহক ফাঁদ

ভাঙ্গে বুঝি সব বাঁধ                    আলো আঁধারে।

তখন স’নটা বাজে লেকের ধারে।

এপারেতে কেহ নাই আমি ও লিলি

প্রোসীড করিতেছিনু বিউটিফুলি

চুমি তার কেশরাশি                    কহেছিনু ‘ভালবাসি’

কয়েছিল মৃদু হাসি                    ‘ডোন্ট বি সিলি’

এপারেতে কেহ নাই আমি ও লিলি।

মোটরে হৰ্ন দিয়ে কে ডাকে কারে?  
 নাহি জানি চিনি কি না চিনি উহারে  
 একি! লিলি চলে যায়      মোর পানে নাহি চায়,  
 ষেসোপথ নিরূপায়      ভাঙে দুধারে।  
 মোটরে হৰ্ন দিয়ে কে ডাকে কারে?

ওগো লিলি কোথা যাও কাহার কাছে,  
 অজানা জনের পিছু যেতে কি আছে?  
 এ বড় খারাপ ঠাঁই      লেক-এর তুলনা নাই  
 ফেরে রূপ-আত্মায়ী      সুমুখে পাছে।  
 ওগো লিলি কোথা যাও কাহার কাছে।

‘মেরিক্যান পাইলট’ উইলি ম্যাকিলো  
 এই বলি লিলি তার কারে উঠিল  
 একি দেখি হায় হায়      জেলাসির তাড়নায়  
 বক্ষ যে ফেটে যায়      আশা টুটিল।  
 ‘মেরিক্যান পাইলট’ উইলি ম্যাকিলো।

সহসা উদিল মেঘ গগন পরে  
 বিজলী চমকে ঘন বরষা বারে  
 শীতের দাপটে কাঁপি      বেদনা মনেতে চাপি  
 কহিলাম চুপিচুপি      মিনতি ভরে  
 ‘(লিলি) আমারেও তুলে নাও মোটর কারে।’

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে গাড়ি  
 লিলির ‘ভল্যুমে’ তাহা গিয়াছে ভরি  
 কার খানি ‘টুসিটার’      সৌট মোটে দুটি তার  
 ‘লোনলী’ লেকের ধার      রহিনু পড়ি  
 ইলোপ করিল লিলি মোটরে চড়ি।

প্রাচীনতার দিক থেকে আজু গোঁসাইয়ের পরেই উল্লেখযোগ্য হলেন বক্ষিম, যিনি বিষবৃক্ষে চন্ডীস্তোত্রের প্যারডি করলেন। কিন্তু বরং তাঁর গদ্যরীতিই পরবর্তীকালে প্যারডিকারদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল, যেমন হয়েছিল মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের ধরন। তেমনই নজরলের বিপ্লবাত্তুক আঙ্গিক আর নতুন কাব্যধারাকে ব্যঙ্গ করে, এমনকি তাঁকে খোঁচা দিয়েও – তাঁকে ‘গাজী আবাস বিটকেল’ ডাকা হত সেসব কবিতায় – অনেকে প্যারডি করেছেন। উল্লেখযোগ্য হলেন সজনীকান্ত, যিনি নজরলের ‘বাগিচায় বুলবুলি তুই’-এর যেমন নিরীহ প্যারডি বানালেন ‘জানালায় টিকটিকি তুই টিকটিকিয়ে করিসনে আর দিক’, আবার সাড়াজাগানো কবিতা ‘বিদ্রোহী’-র ‘আমি বিদ্রোহী... চির-উন্নত মম শির’-কে ব্যঙ্গ করে লিখলেন ‘আমি ব্যাঙ, লম্বা আমার ঠ্যাঙ, তৈরব রভসে বর্ষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙের গ্যাঙ...’। আক্ষেপের বিষয়, বিদ্রোহ-সংজ্ঞাত এই কবিতাগুলি কাব্যরসের বিচারে তেমন সুবিধার নয়। নজরল নিজেও কিছুমিছু প্যারডি করেছেন, একটা নমুনা তো দিলাম একটু আগে। তিনি pun করতেও বড় ভালবাসতেন, দাদাঠাকুরের মতই। যে বিষয়ে আধুনিক এক্সপোনেন্ট হলেন শিরাম।

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমবঙ্গে দুটি পত্রিকা রঙব্যঙ্গের বাহক হিসাবে জনপ্রিয় ছিল, কুমারেশ ঘোষের ‘যষ্টিমধু’ আর দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের ‘অচলপত্র’। তাতে অনেকগুলি আধুনিক প্যারডি প্রকাশিত হয়, কয়েকটি পরে আসবে’খন।

এদিকে ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্যারডি লিখলেন দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’-এর অনুসারে, ‘মদিরা-মঙ্গল’, যাতে লিপিবদ্ধ করলেন ‘গালপানির উপর অকস্মাত করবৰ্দ্ধি উপলক্ষে ভুক্তভোগীর খেদোক্তি’–

মদ্য আমার! পানীয় আমার!

শরাব আমার! আমার Peg!

কেন কোম্পানী নজর দিলে গো?

কেন হল এই Duty plague?

কেন গো তোমার বাজার চড়িল?

কেন গো ললাটে উদিল ‘সেস্’?

চৌদ্দভুবনে ভক্ত যাহার

ডাকে উচ্চে সে আমার Peg।

(কোরাস) কিসের দুঃখ কিসের চিন্তা

কিসের Duty কিসের ‘সেস্’?

Buy যদি নাই করে গো সবাই

Steal, Borrow কিংবা করিবে Beg।

যার খরস্ত্রোত রংধন করিতে

বুদ্ধ স্বয়ং মানিল হার

ত্যাজি কাজ কাম দাদা বলরাম

আজীবন সেবা করিল যার।

তৈমুর লং ল্যাংড়া হইল

অর্থাৎ কিনা ভাঙ্গিল Leg

তুই তো না সেই ইষ্ট দেবতা

তুই তো না সেই মিষ্ট Peg।

সোমরস রূপে একদিন যেই

হেলায় যজ্ঞ করিল নাশ

তান্ত্রিকতার ক্ষেত্রে চড়িয়া

আর্যভূমির ঘটাল ত্রাস

‘কারণ’ নামেতে তির্কত, চীন,

জাপানে রাত্তি নৃতন ভেক্

তার’পরে কিনা Duty চাপিল

তাহারে ধরিল Duty plague!

যাহার প্রভাবে ইংরেজি শিখি

বর্জিল টিকি ‘এজু’র দল,

বর্জিল গাঁজা-গুলির সঙ্গে

পাজির নাজির পাঁজির ছল

যাহার প্রভাবে মোগল প্রতাপ

ধীরে ধীরে হয়ে গেল রে vague

ধন্য আমরা যদি জুটে যায়

অদ্য তাহারি দু এক Peg!

এখনো উঠিছে চন্দসূর্য

শান্ত্র মিথ্যা হবার নয়

শান্ত্র বলেছে সাত সাগরের

একটা শুধুই মদিরাময়

সেই সাগরের তীরে যাব মোরা

সেখানে তো নাই Duty plague—

শান্ত্র হবে না একেবারে মিছে

সাগর না থাকে, আছে তো Peg!

তোমার লাগিয়া খোশ্ মেজাজেতে

কতলোক Break করিছে Neck

নাবালক কাটিতেছে Handnote

সাবালক কাটিতেছেn Check।

নিরামিষ এই যকৃষ্টা শুধু

বৈরাগী সম করিছে Shake

রাজ্ঞী আমার! মাগৃগি আমার!

ভাগ্য আমার! আমার Peg!

আবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিজেই রবীন্দ্রনাথের ‘সে আসে ধীরে’ নিয়ে শোনালেন—

সে আসে ধেয়ে  
এন্ডি. ঘোষের মেয়ে,  
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ চায়ের গন্ধ পেয়ে।  
সে আসে ধেয়ে—  
কুঞ্জিতঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,  
খট্ মট্ বুট্ শোভিত পদ শব্দিত ম্যাটিনি-এ  
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে  
অপ্রল বাঁধা ব্রোচে, রূমালেতে মুখ মোছে  
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে  
ড্রয়িং রুমটি হেয়ে।



আগেই বলেছি, রবীন্দ্রকাব্যের প্রচুর প্যারডি হয়েছে; আরো কয়েকটা, আমার পছন্দের, দিলাম—

জীবেশ ভট্টাচার্য লিখলেন ‘বুদ্ধজগ্নোৎসব’ নিয়ে, ‘নববধূর প্রার্থনা’:

উদ্ধায় আরক্ত অক্ষি

নিত্য গাল ও মন্দ,  
‘ছাড় এখনি এ ঘর দুয়ার  
কেন রও মেহে অন্ধ?’

নৃতন এক ‘ফ্ল্যাট’ লাগি কত না হানাহানি  
‘কর ঝণ, কিসে হীন, বাধা নাহিক মানি।

ছেড়ে চল এই জীর্ণ আলয়  
তেঙ্গে সব সম্বন্ধ।’

‘দয়িত হে, প্রাণেশ হে, থাকিতে চাহি না যুক্ত,  
করঢা করে কর গো মোরে শুশ্রালয় মুক্ত।’

কর মতিষ্ঠির, হয়ে

সব বন্ধন শূন্য।

ত্যজ সবে বীর, হয়ো

নাকো কভু ক্ষুণ্ণ।

শাশুড়ী-ননদ-ভাসুর যতেক গিজগিজ করে প্রাণী,  
থাকুক সকলে, রাখুক দখলে, শশুরের ভিটাখানি।

আমরা দুজনে স্বর্গ রচনা

করিব বাঁধিয়া ছন্দ।

দয়িত হে, প্রাণেশ হে, থাকিতে চাহি না যুক্ত,  
করঢা করে কর গো মোরে শুশ্রালয় মুক্ত।

পরগাছাসম কচিকাঁচা বুড়ো

সদা কোলাহল মত।

নিতুই নৃতন নিয়ম নিগড়ে

বাঁধা পড়ে রয় চিত।

দেশ দেশ ভ্রমিয়া হেরিব শুধু তব মুখখানি,

নিয়ে চল মোরে হেথা হতে দূরে বলি ক’রে জোড়পাণি।

দূর করে দাও দুজনার মাঝে

এই নিয়ে বৃথা দন্দ।

দয়িত হে, প্রাণেশ হে, থাকিতে চাহি না যুক্ত,

করঢা করে কর গো মোরে শুশ্রালয় মুক্ত।

‘মেঘ বলেছে যাব যাব’ এর উপর সরিংশেখর মজুমদারের:

পেট বলেছে ‘খাব খাব’  
হাত বলেছে ‘খাই’।  
কঢ় বলে, ‘সব গিলেছি, আমি ত’ আর নাই’।  
লোভ সে বলে, ‘রইনু চুপে  
জিভের ডগায় বহিঁরপে’।  
কঢ় বলে: ‘আকঢ় যে, আর কিছু না চাই’।  
টেঁকুর বলে, ‘তোমার তরে আছে বরণমালা’।  
হেঁচকি বলে, ‘উঠছে ঠেলে বুকের অম্বজ্বালা’।  
অম্ব বলে, ‘যুগে যুগে  
তোমার লাগি আছি জেগে’  
হজ্জি বলে, ‘আমি তোমার জীবন তরী বাই’।



অবশ্য শুধু যে কবিতার প্যারডি হয়েছে তা-ই নয়, বঙ্কিমি বা বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতিরও অনেক প্যারডি হয়েছে। একটা দিলাম, কুমারেশ ঘোষ কৃত, বর্ণপরিচয়ের নতুন টীকা—

প্রিয়ে, আর রাতি নাই। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই (মদের গন্ধ!) মুখ ধুইয়া কাপড় পড়ি (আরে, কোথায় কাপড় ঠিক নাই!) কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি (ফাইল লইয়া সোজা এখানে আসিয়াছি, তোমাকে লইয়াই পড়িয়াছি। ফাইল কে পড়িবে!) ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না (সবোনাশ!) পড়া না বলিতে পারিলে গুরুমহাশয় রাগ করিবেন (বড় সাহেব বড় কড়া!) নৃতন পড়া দিবেন না (চাকরি স্বেফ থাকিবে না!)

রবিবাবুর অণুকাব্য কণিকা নিয়েও প্রচুর টানাটানি হয়েছে। কয়েকটা শোনাই—

দীষ্ঠেন্দ্রকুমার সান্যাল করলেন ‘চি-কণিকা’<sup>১০</sup>, একটু-আধটু খোঁচা সহকারে:

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে  
তিনিই সৌমিত্র যিনি চলেন তফাতে।

রবীন্দ্রের বুদ্ধদেব সদা ব্যঙ্গ করে  
রবি কাছে ঝণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

সুকুমার রায়চৌধুরী এক কবিতারই<sup>১১</sup> দু-রকম সন্তানা নিয়ে বানালেন:

ভোটযুদ্ধ, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম,  
ক্যাডার নেতারে আসি করিছে প্রণাম।  
নেতা ভাবে দেখ কত পপুলার আমি,  
ভোট শেষে দেখি পথে এসেছেন নামি।

বা,

ভোট যাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম,  
নেতারা ভোটারে আসি করিছে প্রণাম।  
ভোটার ভাবিছে মনে দেবতা তো আমি,  
মূর্খের ভাবনা দেখে আসে অন্তর্যামী।

১০ – ‘মাঝারির সর্তকতা’ ও ‘অক্তজ্ঞ’, কণিকা।

১১ – ‘ভক্তিভাজন’, কণিকা।



শেষ করি, হে হে, একটি জন্মেশ প্যারডি দিয়ে – রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বশী’-র সঙ্গে শালীকে মেলালেন  
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-

ନହିଁ ମାତା ନହିଁ ପିସୀ ନହିଁ ଶିଶୁ ନହିଁ ନାବାଲିକା  
ହେ ଅନନ୍ତଯୌବନା ଶ୍ୟାଲିକା ।

ଚଢ଼େ ଯବେ ଆଲତା ଦିଯା ଭାଲେ ପର ଖୟାରେର ଟିପ୍‌ପାଇଁ  
ଥାହିଁଆ ତୋମାର ପାନେ ବୁକ ମୋର କରେ ଟିପ୍‌ଟିପ୍‌  
ମନେ ହୟ, କେନ ଆମି ହଲାମ ନା ଦିଲ୍ଲି ବାଦଶାହ,  
ଅଥବା କୁଳୀନପୁତ୍ର — ଗୁଣ୍ଡିସୁନ୍ଦ କରିଯା ବିବାହ  
ଜୀବନ ନିର୍ବାହ

শুশ্রাবনে যবে দেখা দাও হে বিদ্যৃৎশিখা

শহর কলকাতার পরিস্থিতি নিয়ে প্রথ্যাত  
কাটুনিস্ট-কাম-ছড়াকার রেবতীভূষণ ঘোষ, ওই  
একই কবিতার ধাঁচে, ছবি সহযোগে দেখালেন:

ট্রাম ভাবে তারই জয়  
কর্মী ভাবে তার  
কোম্পানি ভাবে সে জয়ী  
মরে প্যাসেঞ্জার।

ଦୁତିମୟୀ ବିଦୁଷୀ ଶ୍ୟାଲିକା,  
ରଞ୍ଜେ ରଞ୍ଜେ ବେଜେ ଓଠେ ହଦୟେର ଶତଚିନ୍ଦ୍ର ବାଁଶି  
କଦମ୍ବ କେଶର ସମ ମୁନ୍ଡେ ଓଠେ ରୋମାଞ୍ଚ ବିକାଶି,  
ଚାହିୟା ତୋମାର ପାନେ ଅଚଥଳ ରହେ ଆଁଖିତାରା  
ଭାୟରାଭାୟେର ଭାଗ୍ୟ ଭାବି ଭାବି ଚିତ୍ତ ଆତ୍ମହାରା  
ବହେ ଅଶ୍ରୁଧାରା ।

# ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ

ଅଭାଗାର କଳ୍ପନାକେ ମୁର୍ତ୍ତିମତି ସ୍ଵର୍ଗ-ନାଗରିକା  
ତମି ଲୀଲା-ଲଳିତା ଶ୍ୟାଲିକା ।

বাধিতের লালাম্বোতে ধৌত তব তনুর তনিমা  
লোভার্টের হাদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা  
এ ছলনাময়ী তব উচ্ছল পিছল রসধারা  
পথিকের পদতলে কদলীচর্মের চেয়ে বাড়া  
কে বাঠিবে খাইদা।

ନିଖିଲ ପୁରୁଷବ୍ୟନ୍ଦ ପଡ଼େ ଅକସମ୍ମାନ  
ହେଁ ଚିତ୍ପାତ ।

## ফাটাফাটি ফুকেত

### মৃগাঙ্ক চ্যাটাজী



অবশ্যে পা রাখলাম ব্যাংকক এয়ারপোর্ট। প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ, তাও একটা ইস্পটেন্ট অকেশন-এ... (কী অকেশন সেটা পরে দেখবেন) ... তাই আর নিজে চাপ না নিয়ে বেড়ানোর প্ল্যানিং-এর সমস্ত ভার দিয়ে দিয়েছি একটা নামকরা ট্রিপ এজেন্সি-কে। এয়ারপোর্ট থেকে পিক-আপ করা থেকে শুরু করে হোটেল বুকিং, সব ওয়াই ব্যবস্থা করে রাখবে। থাইল্যান্ড-এর ভিসা নিয়েও বেশি সমস্যা নেই; ব্যাংকক এয়ারপোর্ট-এ পৌঁছে মাইগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে গোটা দুই ফর্ম ভরে জমা দাও, সাথে একটা ছবি আর ফেরার টিকটের প্রিন্ট-আউট। ব্যাস, পেয়ে গেলে তুমি বেড়ানোর পারমিশন। আমিও বৌকে নিয়ে রওনা দিলাম ফুকেতের উদ্দেশ্যে আরেকটা ফ্লাইট চেঞ্জ করে।



ফুকেতে পৌঁছতেই লোকজন ফ্রি সিম নিয়ে ঘিরে ধরল, ভালো একটা অফার দেখে নিয়েও নিলাম; বাড়িতে তো মাঝেসাবে কল করতে হবে। পরে অবশ্য দেখলাম যে, ওখান থেকে কল করার চেয়ে, ইন্ডিয়া থেকে আইএসডি করায় কম খরচা হয়। সে যাই হোক, এরপর চলে গেলাম ফুকেতের একটা দারুণ সুইমিং পুল-ওয়ালা হোটেলে। একটু রেস্ট নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম শহরটাকে এক্সপ্লোর



করতে। আমাদের হাতে সেদিন ছিল শুধু দুপুর আর বিকেলটা, অন্তত কিছুটা তো ঘুরে দেখি; আর খিদেও পেয়েছিল দারুণ, এই ভেবে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে।

মাঝে মাঝেই দেখি একটা করে ম্যাসাজ পার্লার, আর কিছু কাপড় চোপড়ের দোকান। আবার গোয়ার মত ওখানেও দেখি স্কুটি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে; বাইক নেই একটাও। নিয়ে নিলাম একটা, দুজনেই তো চালাতে পারি; শহরটায় ঘুরে বেড়াবার এর চেয়ে ভালো উপায় নেই।

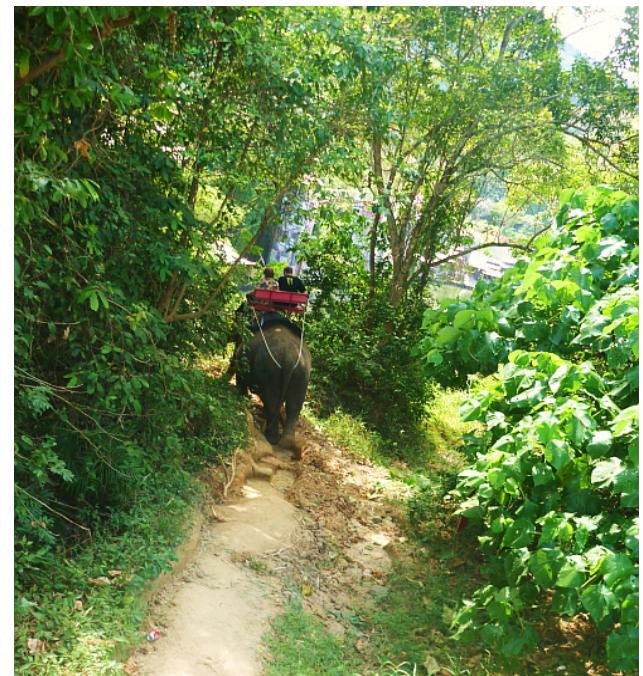
ফুকেত একটা দ্বীপ-এর মত, চারপাশে অনেক অনেকগুলো বীচ, আর সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়। আমরা ছিলাম ফুকেতের একেবারে দক্ষিণের দিকে “কাটা” নামক একটা বিচের ধারে। কাটার একটু উপরের দিকেই “ক্যারন” বীচ; কিন্তু সেখানে একটু সন্দেয়বেলা গিয়ে দেখি একেবারেই ফাঁকা। মানে ওখানে সন্দেয়ের পরে বীচে কোন লোকজনই থাকে না। হয়ত যেতে নিষেধও আছে; তাই বেশি দেরী না করে বেরিয়ে এলাম। পাহাড়ি রাস্তায় স্কুটি চালিয়ে দু-তিনটে এলাকা ঘুরে এলাম, বেশ কিছু মার্কেট আর ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁও দেখে রাখলাম। পরে সেই ফুকেতের ভারতীয় খাবারের দোকান আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল বলা যেতে পারে। কারণ ফুকেতের নুন-মশলা কম, মিষ্টি বেশী অঙ্গুত খাবার খাওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাটা-তেই একটা রেস্টুরেন্টে তো রীতিমত হিন্দি চ্যানেল চলছিল আর হিন্দিতে অর্ডার-ও দিতে পারলাম। আর “পাটং” বলে একটা বীচের আলিবাবা নামক রেস্টুরেন্ট-টা অল্প দামী হলেও বেশ ভালো ছিল।



বীচ – বড় আর ছোট কাটা (“নই কাটা”, নই অর্থ ছোট), আর ক্যারন বীচ, এগুলো দেখা যায়। ভাল করে দেখলে পাটং বীচের-ও অল্প কিছু অংশ দেখা যাবে। এরপরেই আমরা চলে গেলাম একটা অ্যামিউসমেন্ট পার্কের মত জায়গায়। কার রেসিং, বন্দুক চালানো, পেন্ট বল ইত্যাদি নানারকম ভাবে সেখানে ট্যুরিস্টদের পয়সা লেটার ব্যবস্থা করা রয়েছে। যাদের যাওয়ার ইচ্ছা হবে, আমাকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করে নিও। একটাই জিনিস ওখানে একটু হলেও আলাদা ছিল, সেটা হল হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঘোরা। সেই জঙ্গল-কেও জঙ্গল বলা চলে না যদিও।

তাও একটু অন্যরকম সময় কাটল, এই আর কি।

পরের দিন সকালে আমাদের একটা সিটি ট্রিপ আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। প্রথমে আমাদের নিয়ে গেল সামনেই কাটা বীচে। সেখানে অল্প কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাওয়া হল পাহাড়ের ওপরে একটা ভিউ পয়েন্ট-এ। সেখান থেকে তিনখানা



এরপরের জায়গাগুলোও খুব একটা আনন্দদায়ক ছিল না। যেমন একটা বুদ্ধ মন্দির-এ শোয়া, বসা, আধশোয়া নানারকম বুদ্ধ মূর্তি দেখা; একটা দোকানে কিছু কেনাকাটা করা; জেম'স গ্যালারিতে শুধু মণি মাণিক্য তৈরী হতে দেখা কিন্তু কেনার ক্ষমতা না থাকা — এরকম বেশ কিছু জায়গা দেখে ফিরে এলাম হোটেলে।



মূল উদ্দেশ্য ছিল স্নরকেলিং — মানে চোখে জলরোধক চশমা পড়ে জলের মধ্যে নেমে মাছ, প্রবাল দেখা। এটার অভিজ্ঞতা আমার আগে একবার ছিল আন্দামান বেড়ানোর সময়ে। তখন থেকেই আমি স্নরকেলিং-এর ফ্যান। উপরন্তু এবারে আমার সাথে ছিল বন্ধুর এনে দেওয়া ওয়াটারপ্রুফ ডিজিক্যাম, যার ব্যবহার করার জন্য আমি এতদিন মুখিয়ে



এর পরের দিনই আমরা সবচেয়ে বেশি আনন্দ করেছিলাম। এই দিন আমরা একটা এক্সট্রা ট্রিপ কিনেছিলাম ‘ফি ফি আইল্যান্ড’-এ স্পিডবোটে বেড়াতে যাবার। ফুকেত থেকে স্পিডবোটে জায়গাটায় পৌঁছতে লাগে প্রায় চাল্লিশ মিনিট, যেখানে বড় বোট-এ কম খরচায় গেলে লাগবে অন্তত দেড় ঘন্টা।



ছিলাম। তা সেখানে দুর্দান্ত এনজয় করে আমরা গেলাম আরেকটা বীচে লাঞ্চ করার জন্য। এটা প্যাকেজের মধ্যেই ছিল, কিন্তু আবার সেই দুর্ঘষ্ম মিষ্ঠি মিষ্ঠি খাবার। একমাত্র চিকেন ফ্রাই বন্স্টাই আহারযোগ্য ছিল।

খাওয়াদাওয়ার পরে আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল মাঙ্কি বীচ — মানে একটা পুচকি বীচের মত জায়গায় বেশ কিছু বানরসেনার দাপাদাপি। সেখানে গিয়ে পূর্বপুরুষদের সাথে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে গেল। মেয়েগুলোর দেখি ছবি তোলার শখ-ও আছে, আবার বাঁদরগুলো একটু কাছে এলেই চ্যাঁচামেচি করে পালিয়ে যাওয়াও আছে।



আমাদের ব্যাক্ষক যাওয়ার কথা দিন দুয়েকের জন্য। তবে মনে হচ্ছিল ফুকেতেই ইচ্ছে করলে এক সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়া যায় নানারকম এন্টারটেইনমেন্ট আর ট্রিপের মধ্যে দিয়ে। আবার ফিরে আসার আর আরো অনেক অনেক ঘোরার ইচ্ছা নিয়েই আমাদের ফাটাফাটি ফুকেত ভ্রমণ শেষ হল...



এসবের পর আবার একটা সাধারণ বীচে নিয়ে গিয়ে আমাদের ছেড়ে দিল সময় কাটানোর জন্য। সেখানে ছবি তুলে, চান করে শেষবারের মত আনন্দ করে নিয়ে আবার স্পিডবোটে করে ফিরে চললাম হোটেলের উদ্দেশ্যে। পরের দিনে



## ভাষাপ্রত্বর

### সরোজমোহন চক্রবর্তী

২১শে ফেব্রুয়ারি বলতে কেবল ১৯৫২ সালের সেই দিনটি বোঝায় না। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশেষ তারিখ তো বটেই, কিন্তু এদিন আজ একটি অভিধা, একটি ধ্বনি, একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সংগঠিত দাবী ও আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য গুলি চালানো হয়েছিল। তাতে শহীদ হন মোঃ সালাউদ্দিন, আব্দুল জব্বার, আব্দুল বরকত, রফিকুদ্দিন আহমেদ ও আব্দুস সালাম। অনেকে মারাত্মক আহত হন। ২২শে ফেব্রুয়ারি মারা যান শফিকুর রহমান, ওয়াহিদুল্লাহ ও আব্দুল আওয়াল। তাই গভীর বেদনায়, মহিমায় এবং পরিত্র আবেগে ওই তারিখটি ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে যায়। এপার বাংলায়, ওপার বাংলায় গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি। রাষ্ট্রসংঘ স্বীকৃতি দেয় এই দিনটিকে ১৯৯৯ সালে আর ২০০০ সাল থেকে এই দিনটি পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে।

#### ১৯শে মে

১৯৪৮-৪৯ সালে আসামে একশ্রেণীর অসমিয়া বুদ্ধিজীবীর উক্ফানিতে বাঙালি তথা বাংলাভাষার প্রতি প্রতিকূল মানসিকতার প্রকাশ ঘটতে লাগল – যার চরম পরিণতিতে শুরু হল “বঙ্গাল খেদা” নামে ভাতৃঘাতী দাঙ্গা। ১৯৫১ আদমসুমারির সময় ও জনসংখ্যার প্রকৃতচিত্র প্রকাশ করা হল না। গোয়ালপাড়া সহ বিভিন্ন পার্বত্য এলাকার বাংলাভাষীদের অসমিয়াভাষী বলে পরিচয় দেওয়া হয়। “বঙ্গাল খেদা”র নামে বাঙালির গৃহদাহ, সম্পত্তি লুঞ্চন, শ্লীলতাহানি, খুন-জখম চলছিল, এবারে সরাসরি সরকারি মোহর লাগানোর জন্য অসমিয়া হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ১৯৬০ সালে অসমিয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে আইন পাশ করাতে আন্দোলন শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল বাঙালিদের ওপর শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা। স্বাধীন ভারতের রাজ্য পুনর্গঠনের নীতি অনুযায়ী যে রাজ্যের শতকরা ৭০ জন এক ভাষায় কথা বলে শুধু সেই রাজ্যই একভাষী রাজ্য হতে পারে বা সেই ভাষাই হবে সে রাজ্যের সরকারি ভাষা। বাঙালিরা বাংলাভাষাকে আসামের দ্বিতীয় সরকারি ভাষার স্বীকৃতির দাবি জানাল স্বাভাবিক কারণেই।

কিন্তু ১৯৬১ সালের ১৯শে মে বরাক উপত্যকায় উত্তাল ভাষা আন্দোলনে শিলচরে পুলিশের গুলিতে যে এগারোজনে তরতাজা যুবক প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ

১) কমলা ভট্টাচার্য, ২) সুকোমল পুরকায়স্ত, ৩) শচীন পাল, ৪) চণ্ণীচরণ সুত্রধর, ৫) সত্যেন্দ্র দেব, ৬) কানাইলাল নিয়োগী, ৭) কুমুদ দাস, ৮) তরণী দেবনাথ, ৯) হিতেশ বিশ্বাস, ১০) বীরেন্দ্র সুত্রধর, ১১) সুনীল সরকার।

এই ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে করিমগঞ্জে ১৯৭২ সালের ১৬ই আগস্ট বিজন চক্রবর্তী (বাচু) এবং ১৯৮৬ সালের ২১শে জুলাই জগন্ময় দেব (জগন) ও দিব্যেন্দু দাস (যীশু) শহীদ হন।

এই শহীদেরা আজ আমাদের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। অথচ এঁদের জীবনদানের মধ্য দিয়ে কেবল আসামেই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষিত হয় নি, পরবর্তী কালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতে

ত্রিভাষা সূত্র প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। ত্রিভাষা সূত্রের ভাষা তিনটি হল রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম ইংরিজি এবং স্থানীয় প্রদেশের ৭০ শতাংশ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষা। ভারতীয় রেল দেশের সমস্ত স্টেশনে এই সূত্র ধরে তিনটি ভাষায় নাম লিখে থাকে।

অনেকে মনে করেন — একুশে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের শহীদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে আবেগে অশ্রুপাত করা হয় ততটাই নিরাসকৃতাব দেখানো হয় উনিশে মে-র শহীদদের প্রতি। তার একটা বড় কারণ হয়তো হতে পারে যে বাংলাদেশের সাথে এক আন্তর্জাতিকতার প্রাণ লেগে আছে যা আমাদের তৃপ্ত করে। শিলচরের ভাষা শহীদদের জন্য অশ্রুবিসর্জনে প্রাদেশিকতার গল্প থাকতে পারে তাই হয়তো আমরা ওদিকটা এড়িয়ে যাই।

আজ এই অবসরে আমরা স্মরণ করি আরও কিছু শহীদদের, যারা মাতৃভাষা আন্দোলনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে মাতৃভাষা আন্দোলনের অন্যান্য শহীদ —

১৯৬৫, জানুয়ারীঃ মাতৃভাষার স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে তামিলনাড়ুর তিরঢিকাপল্লী রেলস্টেশনে ‘ইন্ডি ওড়িকা। তামিড় বাড়কা।’ এই স্নেগান তুলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহতি দেন চিনাস্বামী।

১৯৭২, ১৬ ই আগস্টঃ কাছাড়ের করিমগঞ্জে ভাষা মর্যাদা রক্ষার পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বিজন চক্রবর্তী।

১৯৮৬, ২১ শে জুলাইঃ অসমের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জারি করা সার্কুলারের বিরুদ্ধে করিমগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের শহীদ হন জগন্মায় দেব (জগন) এবং দিব্যেন্দু দাস (যীশু)।

১৯৮০-র দশকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভাষা-দাঙ্গায় বাঙালি সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের জীবন যখন বিপর্যস্ত তখন সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের নিরাপত্তার দাবীতে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারান দুই অসমীয়া যুবক মদন ডেকা এবং মাধব বর্মণ।

১৯৯৬ সালে কাছাড়ের পাথারকান্দিতে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষায় শিক্ষার দাবীতে পথ অবরোধে পুলিশী আক্রমণে শহীদ হন কিশোরী সুদেষ্ণা সিংহ।

## রসিক রবীন্দ্রনাথের রসিকতা

### সুদীপ্তি বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথের রসবোধ ও কৌতুক প্রবণতার প্রমাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর রচনাবলীর পাতায় পাতায়, জীবনসূতিতে এবং রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বিভিন্ন মানুষের সূতিচারণায়। এজন্য গন্তীর ভাবে জীবনসূতি পড়তে বসলেও হঠাৎ ভিতর থেকে হাসি ছলকে ওঠে। যেমন জীবনসূতিতে মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে কবি বলেছেন মেঘনাদবধ কাব্যটিও আমাদের কাছে আরামের জিনিস ছিল না। মেঘনাদবধের প্রত্যেক অক্ষরটিই আমাদের কাছে অমিত্র ছিল। এখানে অমিত্র শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের রসিকতার মধ্যে এমন একটা আবেদন থাকে যে তা ব্যক্তিগত স্তর থেকে সহজেই উন্নীত হয় সার্বজনিক পর্যায়ে।

একবার কিছু তরুণ কবিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কবির বাড়িতে। তাদের আপ্যায়নের তদারক করছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সুকুমার রায়ও এদিন ছিলেন অভ্যাগতদের ভীড়ে। ফল মিষ্টি ইত্যাদি ছিল খাদ্য তালিকায়। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেন সুকুমার রায় কোনো ফল নিচ্ছেন না। তখন তিনি সুকুমার রায়ের কাছে গিয়ে বলেন, তুমি যে এত গভীর ভক্তির সঙ্গে গীতা পাঠ করছো, তা তো জানা ছিল না। কথার অর্থ না বুঝতে পেরে অবাক হয়ে সুকুমার রায় কবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বলেন, তুমি একেবারেই ফল খাচ্ছ না দেখেই বুঝেছি গীতার মা ফলেশু কদাচন উপদেশটি তুমি যথার্থই জীবনে গ্রহণ করেছ।

এরকম সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাৎক্ষণিক রসিকতাতে রবীন্দ্রনাথ মজলিস জমিয়ে দিতেন।

আর একবার কবির বাড়িতে সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। একজন সাহিত্যিক এত খেয়েছেন যে হাঁটাচলাও ঠিক ভাবে করতে পারছেন না। তাই দেখে কবি বলেন, কি হে, তোমার এ কি হল? প্রহারেণ ধনঞ্জয় জানি, কিন্তু এ যে আহারেণ ধনঞ্জয় হয়ে গেল। কবির কৌতুক শুনে অন্যান্যদের সঙ্গে অতি ভোজনকারীও না হেসে পারলেন না।

আর একটা মজার কথা বলি। শান্তিনিকেতনে কবির কাছে নেপাল রায় নামে এক ভদ্রলোক আসতেন। একদিন অন্যান্যদের সাথে কবি বসে আছেন। এমন সময় নেপালবাবু এলে কবি খুব গন্তীর ভাবে বলেন, এই যে নেপালবাবু আজকাল আপনার বড় ভুল হচ্ছে। এজন্য আপনাকে দণ্ড পেতে হবে। একথা বলেই রবীন্দ্রনাথ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। নেপাল রায় তো বটেই, অন্যান্য সবাইও একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। একটু পরেই রবীন্দ্রনাথ একটি লাঠি হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। লাঠিটা নেপাল রায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, এই নিন আপনার দণ্ড, কাল ভুল করে আমার ঘরে ফেলে গিয়েছিলেন।

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বনফুল একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখেন কবি ঝুঁকে বসে কিছু লিখছেন। তাই দেখে বনফুল কবিকে জিজ্ঞাসা করেন, অত ঝুঁকে লিখতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না? আজকাল তো নানারকম চেয়ার পাওয়া যায়। যাতে ইচ্ছে করলেই ঠেস দিয়ে বসে আরাম করে লেখা যায়। উভরে কবি বলেন, সবরকম চেয়ারই আমার আছে। কিন্তু ঝুঁকে না লিখলে লেখা বেরোয় না। কুঁজোর জল কমে এসেছে তো, তাই উপুড় করতে হয়।

আর একবার এক সাহিত্যসভায় বনফুল খুব ভালো বক্তৃতা রাখার পর সবাই যখন খুব প্রশংসা করছেন তাঁর বক্তব্যের তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন, বলাই তো ভালোই বলবে, ওর নাম যে বলাই, বলা-ই তো ওর কাজ।

আরেকটি গল্প বলি। এক গানের আসরে ঝুপদ গানের শিল্পী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গান গাইছেন। আসরে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন শ্রোতা হিসেবে। কিন্তু শ্রোতারা রবীন্দ্রনাথকে চেপে ধরলেন অস্তত একটা গান গাওয়ার জন্য। শেষপর্যন্ত গান গাইতেই হবে জেনে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, তার মানে গোপেশ্বরের পর এবার দাড়িশ্বরের পালা।

সেবার রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রনে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন শিলাইদহে। কবি তখন পদ্মাৰক্ষে বজৱায় ছিলেন। চারুচন্দ্রের জন্য জায়গা হলো পাশের বজৱাতে। দুটি বজৱায় যাতায়াতের জন্য একটি কাঠের তক্তা পাতা ছিল। চারুচন্দ্র কবিকে প্রণাম করার জন্য পাশের বজৱা থেকে কবির বজৱায় এলেন। প্রণাম শেষে চারুচন্দ্রের ফেরার সময় কবি বললেন, দেখ চারু, তত্ত্বার উপর দিয়ে যাবার সময় সাবধানে যেও। মনে রেখ, এটা জোড়াসাঁকো নয়, একসাঁকো।

নাটোরের মহারাজের কন্যার বিবাহে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে নিম্নিত্ব ছিলেন। সে সময় লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার জন্য কবিকে বিভিন্ন সভা সমিতিতে যেতে হতো। বিয়ের দিন রবীন্দ্রনাথ অনেক দেরি করে পৌঁছান। মহারাজ অনুযোগ করে বলেন, আমার কন্যাদায়, কোথায় আপনি সকাল সকাল আসবেন তা নয়, আপনার এত দেরি! উত্তরে কবি মশকরা করে বলেন, আপনার কন্যাদায়, আমাদেরও মাতৃদায়, দু'জায়গায় সভা করে আসতে হলো।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক। একদিন অনেকগুলো বই হাতে নিয়ে কবির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রভাতকুমার। তা দেখে কবি ডাক দিলেন, ওহে বৈবাহিক, শোনো শোনো। প্রভাতকুমার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাকে বৈবাহিক বলছেন কেন? উত্তরে কবি বললেন, না, না, সে বৈবাহিক নয়, আমি ডাকছি বই-বাহিককে।

একবার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ভাইজি শ্রীলা তার মা বাবার সাথে কবির সাথে দেখা করতে আসে। তার বয়স তখন চার বছর। রবীন্দ্রনাথ শ্রীলাকে গান গাইতে বলায় শ্রীলা গাইল, ‘কেটেছে একেলা বিরহের বেলা।’ গান শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘খুবই ভাল গেয়েছ। কিন্তু একটু আর্লি হয়ে গেল না?’

কবির ব্যক্তিগত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মাথায় ছিল টাক। সুধাকান্তের বংশে আর কারো টাক আছে কিনা কবি জানতে চাইলেন। উত্তরে সুধাকান্ত জানান যে তার বাপ, ঠাকুরদা সবারই টাক ছিল। তখন কবি হেসে বলেন, ‘তাহলে ওটা শিরোধার্য।’

আর একবার সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর সাথে কবি বেড়াতে গিয়েছিলেন রামগড়ের পাহাড়ে। সুধাকান্ত একদিন দেখেন কবি মোজা খুলে পায়ের তলা হাত দিয়ে ঘষছেন। সুধাকান্ত কারণ জানতে চাইলে কবি বলেন, ‘চরণকমল, চরণপদ্ম, পাদপদ্ম এসব পদকীর্তন শুনেছি। কিন্তু পা কে কেন পদ্ম বলে আজ সেটা ভাল করে বুঝেছি। তা না হলে এত জায়গা থাকতে, মোজা ভেদ করে মৌমাছিটা ঠিক পায়ের তলাতেই হুল বিঁধিয়ে দিলে!’

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত কবির পত্রাবলীর নির্বাচিত অংশের সম্পাদনা করছিলেন। একটি পত্রে সমসাময়িক কালের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ ছিল, যা কবির জীবন্দশায় ছাপালে অসঙ্গত হতো। নন্দগোপাল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বাদ দেব এ’টুকু?’ কবি বললেন, ‘নিশ্চয় বাদ দাও নইলে বিবাদ হবে।’

সেবার জন্মদিনে কবি ছিলেন কালিম্পঙ্গে। এদিন সকালে মনমোহন সেন তার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে নিয়ে এলেন কবির সাথে দেখা করতে। কবি মনমোহনের দিকে চেয়ে বললেন, ‘তুমি তো ভাগ্যবান ডাক্তার। একটি পাওনা আর একটি উপরি? আমাদের তো এতো সৌভাগ্য ছিল না!’

একদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন। সে সময় পা টিপে টিপে গিয়ে সাগরময় ঘোষ অতি সন্তর্পনে কবিকে প্রণাম করেন। তবু কবির ধ্যান ডেঙ্গে যায়। সাগরময়বাবু অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

তখন কবি হেসে বললেন —

প্রণাম করিতে এলে

চোখ জোড়া রাখি মেলে

চটি জোড়া পাছে চুরি যায়।

কবির ‘প্রহাসিনী’ কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ কবিতার দুটি লাইন ছিল এ রকম —

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি

হসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্লামি।’

সত্যিই রবীন্দ্রনাথ জীবনে তত বুড়ো কোনদিন হননি। যতই আঘাত আসুক না কেন নিজের রসিক স্বভাবটিকে তিনি ধরে রাখতে পেরেছিলেন আজীবন।

### ঐন্দ্ৰিয়ানৈতিকী

#### ঞ্চ ঞ্চঃ

রঙপুর রবীন্দ্রনাথ — নিতাই বসু; রবিজীবনী — প্রশান্ত কুমার পাল; মংপুতে রবীন্দ্রনাথ — মৈত্রেয়ী দেবী; রবীন্দ্রজীবনী — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়; Krishna Kripalini – Rabindranath Tagore A Biography; জীবনসূতি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## Of the ‘langchas’ of Shaktigarh, of Singur and of Sourav

**Prabir Ghose**

The charm and excitement of returning to one’s homeland is always associated with plenty of expectations. However, when these expectations are not fulfilled, it leaves a huge void in one’s life. That is what I experienced during my latest visit to Kolkata.

My last trip to Kolkata was in 2007 – and at the end of it, frankly speaking, I was glad to come back. I heaved a sigh of relief when the Geetanjali Express moved out of Howrah station after a two hours delay. But – my joy was short-lived. The Devil of present day firebrand politics of West Bengal followed me till the boundary of the state and left me stranded in the middle of the jungle at Chakradharpur railway station. The train had entered Maoist territory and passenger trains are not allowed to venture out after dark. Therefore, all of us had to spend seven hours from 9 pm to 4 am cooped up in the train waiting for the journey to commence.

During my visit in 2010-11, I went to Shantiniketan – on the way was the huge complex at Singur where the TATAs should have been rolling out their NANO cars. It was a dream that vanished due to the politics of destruction. Youngsters who might have been employed in the automobile manufacturing complex nurse a bitterness and the barren land is a big eyesore. It is a symbol of the deteriorating nature of Bengal politics.

However, the ‘langchas’ of Shaktigarh were as sweet as ever. The price ranged from 3 rupees to 25 rupees – the 25 rupee ones measured at least 9 inches in length. I asked the shopkeeper who its patrons were and the shopkeeper admitted that the big ones were usually ordered by groups. They sat together and shared the spoils. The ‘langchas’ of Shaktigarh were a big consolation. If only the rest of Bengal maintained its original identity, it would have been a great state.

And – of course, at the very end of my journey, I had to hear the news that Sourav Ganguly remained unsold in the IPL-4 auction: he could not find a franchisee in the IPL-4. He made a mistake of hiking his base price presuming that he was still wanted. But – Shahrukh Khan was not impressed. It left a bad taste in the mouth.

Sad to say that West Bengal today is in a real mess and there does not appear to be any salvation in the near future. It is doomed to extinction by power hungry politicians. While the Redshirts want to cling on to power, the Greenhorns want to oust them. In the tussle, innocent lives are lost and the dead bodies are snapped up by whosoever comes first. These

are then draped in the party colors, put in a carriage and paraded through the streets – bringing life to a standstill. It is called ‘the politics of corpses’.

The Greenhorns have promised not to resort to ‘bandhs’ – they have, instead, formulated a new method: ‘the sit-in’. It is equally frustrating when people sit on the street corners and, traffic is brought to a halt.

I am no politician and have always remained far away from the political scene but, when I listen to the interactions and face-offs of political leaders on TV, they leave a lot to be desired. I feel depressed. Where has decency gone? Why should the so-called reps of the people rave and rant and use a language that rightly belongs to the lowest rungs of society? Is that the way to set an example to the masses? Is lung power enough to win elections? Why such degeneration in the land of Netaji, Vivekananda, Tagore and Satyajit Ray?

*The views expressed in articles in this section (Essays & Opinions) belong to their respective authors and authors only; the said views may or may not necessarily represent those of Palki and the editorial board.*

*Readers are welcome to comment on the written article at the website.*

## Some memories: childhood and Durgapuja

Sugata Sanyal

When the drumbeats of Durgapuja are heard, the mind takes a big leap back. That was around 50 odd years ago. It was childhood. The place was Calcutta. At an even earlier age, I used to feel fearful about the sounds of drum. Straight sanctuary was father. He used to hug me tightly and the fear used to seep out of my mind. The bold and comforting hug, along with the smell of father and nicotine, was quite reassuring. How do the children of today feel? Probably they are bold from the birth!

I still remember the day I had gone out to see Durgapuja with father. Our destination was the Durgapuja at the famous Fire brigade pandal; we used to call it “Damkal-er Pujo”. When we reached there, the crowd was thick and the place was jam-packed. I couldn’t even breathe. I yelled for help from my father. He was 6 feet 2 inches plus. In one swoop, he scooped me up, and held me high, above his shoulder level. That was quite a height, and I felt oddly reassured. I could see the whole Puja. No more was I getting choked, thanks to the reassuring strength that was father.

Those days are still alive in my mind. Father is no more. I have become a father and then a grandfather. We were returning from a friend’s house in Mumbai – my wife, our grandson and I. It was crowded and heavily so. It was the Ganapati immersion day. Suddenly I was aware of a mild beckoning from around my waist. Our grandson was telling me that my mobile, hanging from my belt, was ringing. I could not hear it. I was touched; I bent down and hugged him tightly. He was a bit tall for me to lift him up in my arms by then.

Another pre-Puja day at Calcutta. I had gone out with father. On the occasion of Puja, we used to get a new pair of shoes. We were traveling by a Tram and the shop was passing by. Father asked me if I could jump out of the running tram. Yes, I thought and jumped after him. When he could do it, why not I? He had forgotten to tell me that I had to hunch my head and shoulder, so that the speed at which I would descend would make my body straight. I landed straight as a stick, and immediately fell down, with some injuries on the knees. Embarrassed father got me a shoe of the quality a notch higher than what he would have normally bought. Smell of new shoes was delicious. So was the smell of the new Puja issue books from Dev Sahitya Kutir. The trick was to open the new book in the middle, put one’s nose close to it and take a deep smell. It was quite educational. My hunger to read was insatiable. I used to read whatever I could lay my hands on. When none was available, I would read the *Panjika*, the Bengali almanac and astrological ephemeris, a veritable treasure trove! Before reading those, I never knew there were so many publications of small booklets, so many types of ‘Special’ amulets (we used to call these “*Maduli*”) where the potency was directly proportional to the price. You want ordinary, it was half-a rupee. One rupee would

fetch special ones. In five rupees, I think one could get all problem solving super-special ones. I could never try.

Radio-kit from Jullandhar was also an attraction. The price was merely five rupees, but I could ill afford. But somebody had tried. It was rumored that he got a packet with some nails inside. Quite some special nails, they must have been!

My son's childhood was a blur. I was busy with national projects of importance and he grew up quietly. He was a child full of smiles. At 6 months plus, he had started taking a turn and his favorite pastime was watching us having our lunch. On holidays, he was quite a mature kid. One day he jumped up from his cot, asked my wife when I would come home, and next jumped face-on over the sharp corner of a metallic trunk. The gash on his right eye brow had to be stitched. I'm sure it did help too – by providing him with an identification mark for his passport! After we shifted to Colaba, he was still young and smiling, but the life became serious. Pujas came. My in-laws were quite regular in their visits and unlike many I used to enjoy their presence. My father-in-law was a great friend and the mother-in-law a great cook. So I cherished their presence and did try in every way to extend their stay in Mumbai. My son used to get all his comics read by his "Dadu" (grandfather) and though he could not read then, he knew all the lines of each comic book by heart. So my father-in-law was duty bound to read each comic thousand times over, and missing of any single line was not allowed.

We still attend Durgapuja and meet some old friends. Some have left us and we too are fading a bit. Drumbeats on the Puja day still takes us back to the past. I wish we could travel back in time, once in a while.

*The views expressed in articles in this section (Essays & Opinions) belong to their respective authors and authors only;  
the said views may or may not necessarily represent those of Palki and the editorial board.*

*Readers are welcome to comment on the written article at the website.*

# Photography

Abhik Das



Bird in the garden



Alone on the rope



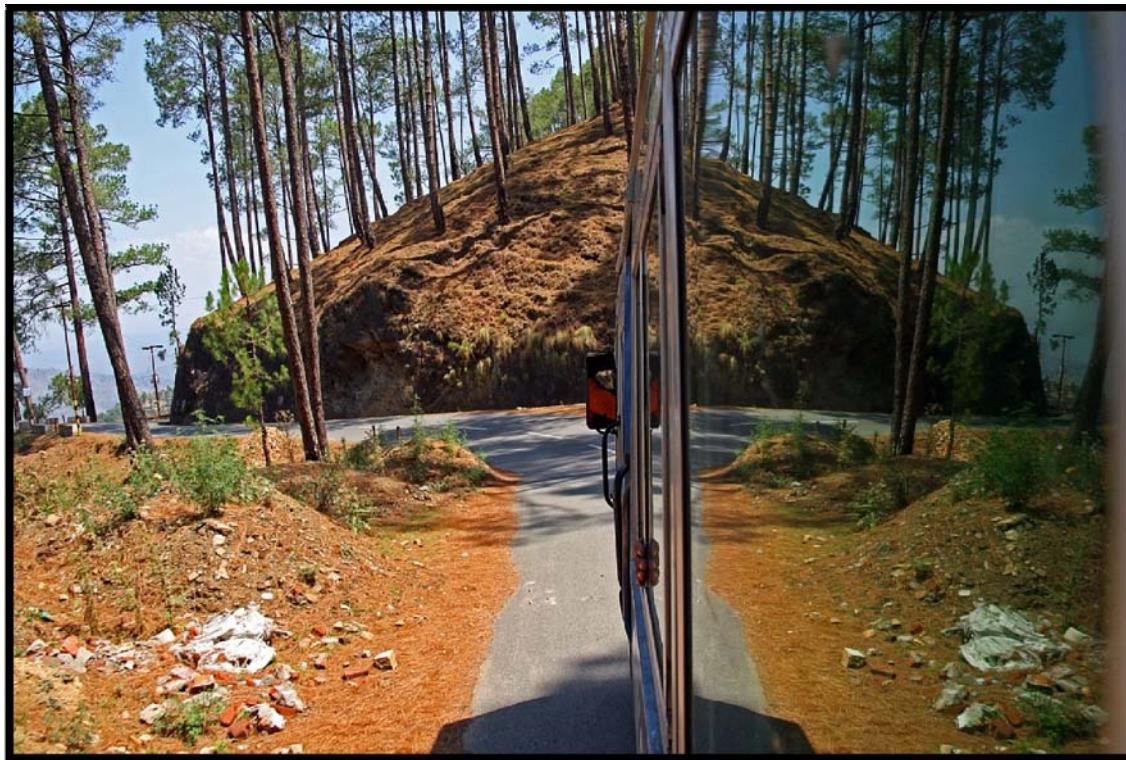
Gathered sipping



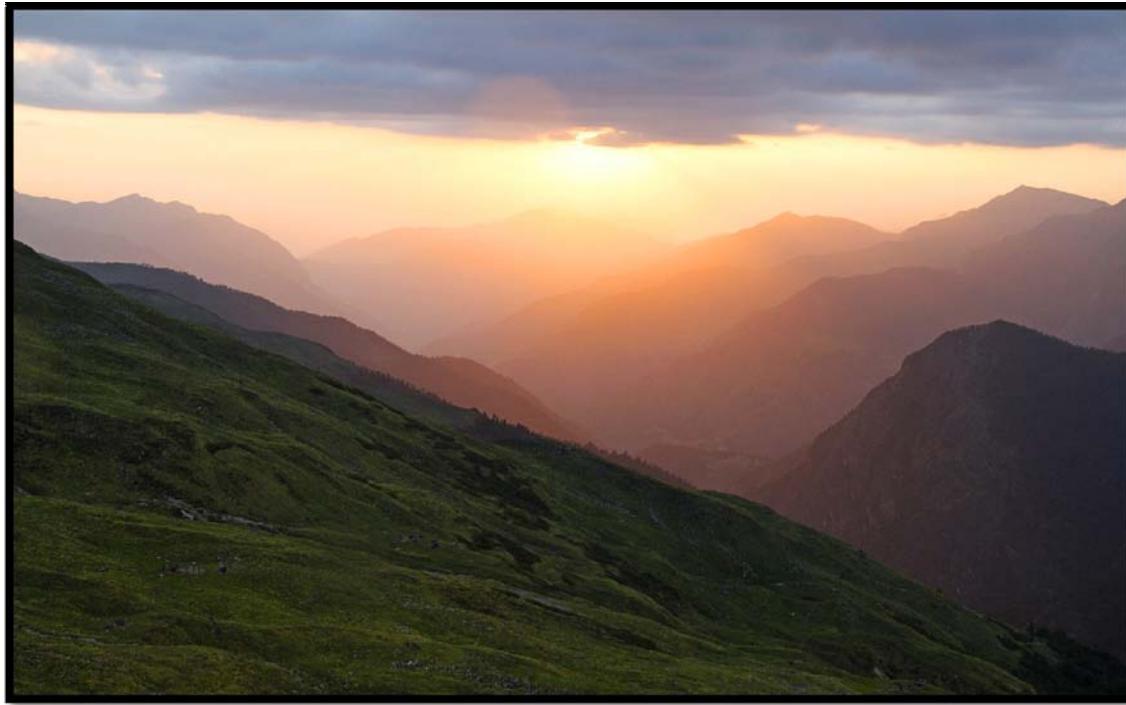
Flying high

## ফোটোগ্রাফি

অভীরুক লাহিড়ি



প্রতিবিম্ব



ভোর



অভিযান্ত্রী



দুর্গম যাত্রা



ভোরের আলোয়



তারা

## ফোটোগ্রাফি

### আরণ্যক ব্যানার্জী



ভারা



উট



মন্দির প্রাঙ্গন



তুষার



জেলে



পাথর

## ফোটোগ্রাফি

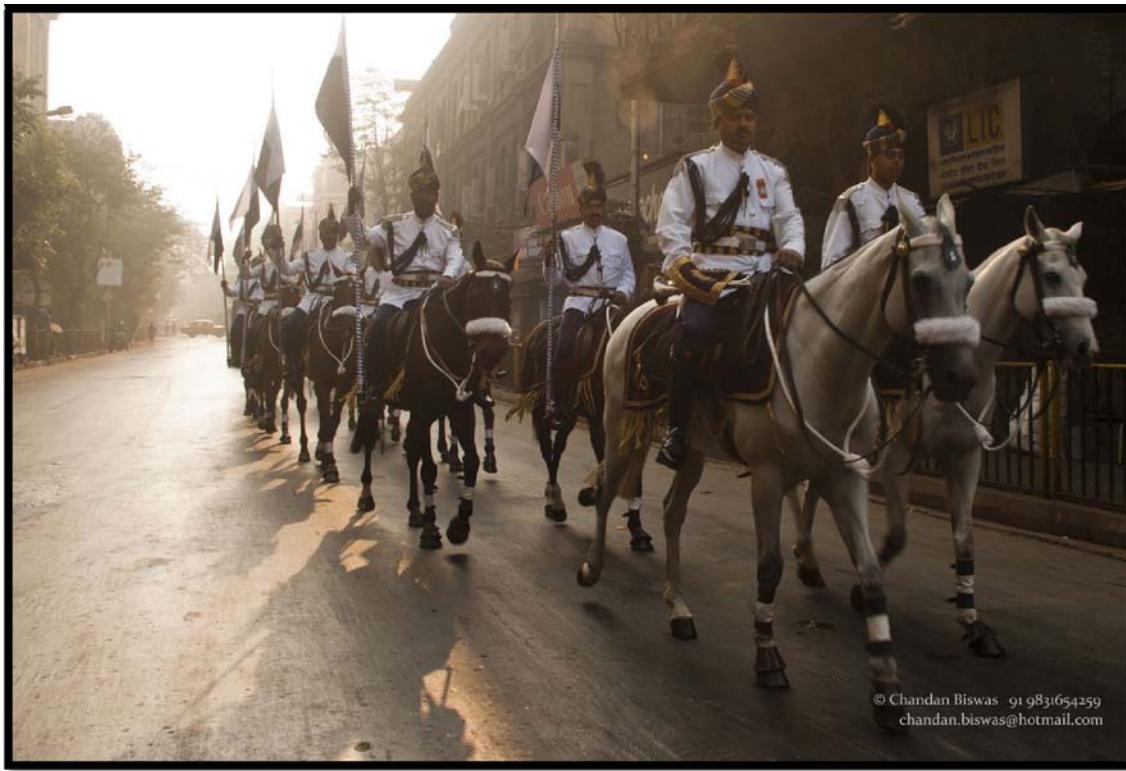
চন্দন বিশ্বাস



নদী



নৌকা



ঘোড়সওয়ার



বিজ্ঞাপন

## ফোটোগ্রাফিঃ প্রকৃতির নকশা

পাবলো



জল্পনা কল্পনা



ধূসর পাঞ্জলিপি



যাত্রার আগে



নির্জন স্বাক্ষর



জলসার আসরে

## ফোটোগ্রাফিঃ

প্রতাপ সেন চৌধুরী

মধ্যপ্রদেশের  
পাঁচমারীতে সূর্যাস্ত



পুরীতে মেঘ ও সমুদ্র



## ফোটোগ্রাফিঃ

সর্বজয়া মুখোপাধ্যায়

অশ্রু



নাগরিক অস্ত



# Photography

Shiladitya Pujari



The Cottage

Ecstasy



Shiladitya Pujari  
Ph No. 9433555434

The Mountain Range



Flowers in the mountain



## ফোটোগ্রাফি

### শুভজিঃ দত্ত



সেতু



খোকা



খুন্দ



নৌকা



Photo By: Subhajit Dutta

আরতি



Photo By: Subhajit Dutta

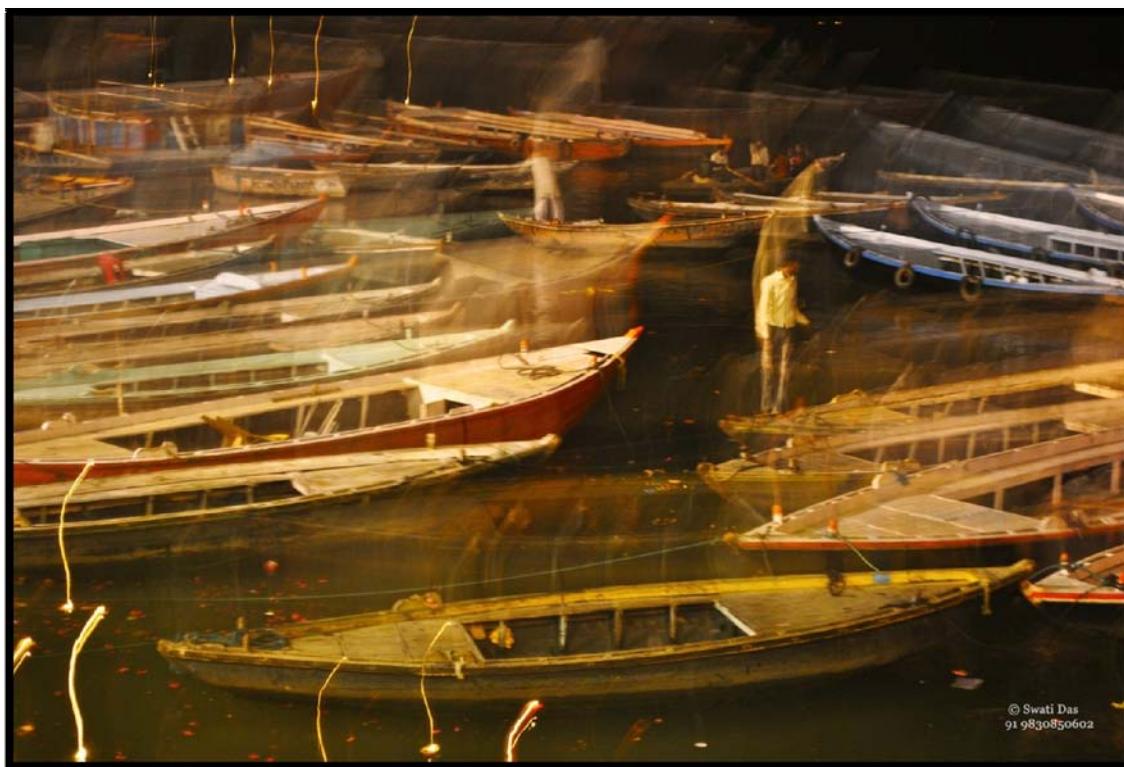
তাজমহল

## ফোটোগ্রাফি

স্বাতী দাস



রথ



নোকা



বহুরপী

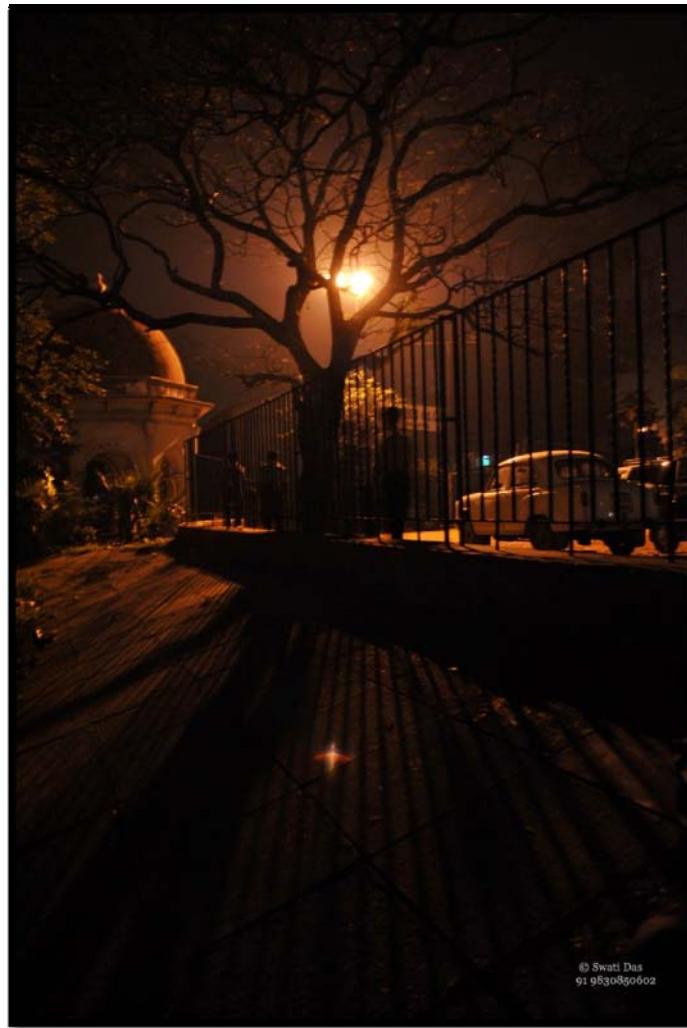


আরতি



© Swati Das  
91 9830850602

টুকি



© Swati Das  
91 9830850602

আলোছায়া

## চিত্রকলা

রিয়াঙ্কা চন্দ



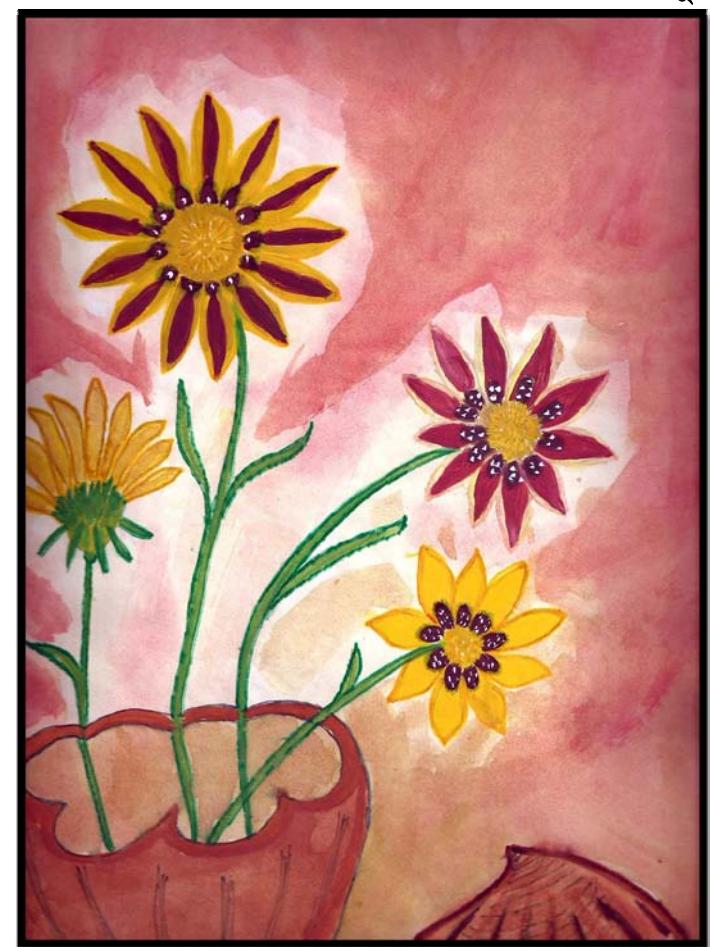
খেয়ালের নাচ

## চিত্রকলা

সুজাতা চৌধুরী



রঞ্জনীগঞ্জা



গাজানিয়া ফুল



অর্কিড



অরণ্য

## Palki 11 Contributors



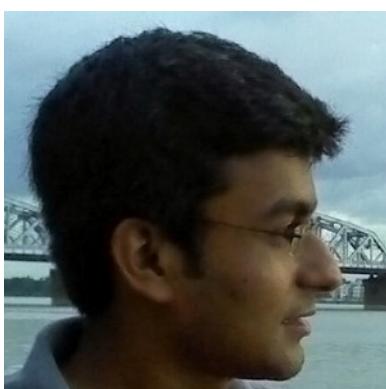
হুগলী জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে কেটেছে অভীকের ছোটবেলা। কলকাতায় উচ্চশিক্ষা ও চাকরির পর বর্তমানে তিনি কর্মসূত্রে আরব আমিরশাহি'র দুবাইতে বাস করেন। তাঁর নেশা হল সাহিত্য, আর শখ হল বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়া, গল্প লেখা, ছবি আঁকা, ছবি তোলা ইত্যাদি।



অনিলকুমার সেন বর্তমানে মুস্বই-এর প্রখ্যাত টাটা ইন্সটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এ সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার। শব্দবিজ্ঞানের ওপর তাঁর গবেষণাকর্ম আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত; মুস্বই-এর অনেক বঙ্গীয় সংস্থা ও পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, এবং বাংলা ও ইংরেজী, দুই ভাষাতেই সাহিত্যরচনায় তাঁর গভীর বোঁক। তাঁর গল্প, ‘এ উইন-উইন গেম’, ২০০৭-এর কমনওয়েলথ অডকাস্টিং এসোসিয়েশন আয়োজিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করে।



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার অঞ্জন নাথের কর্মজীবনের সূচনা হায়দ্রাবাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থায়। পরে তিনি একই সংস্থার অধীনস্থ অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এশ্টারিশমেন্টে যোগ দিয়ে ব্যাঙালোরে চলে আসেন। প্রায় তিন দশক পর, অবসরের পূর্বে অঞ্জন তাঁর বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির অভ্যাস পুনরুজ্জীবিত করেন। বর্তমানে কলকাতার নানা নামী সাময়িকপত্র ছাড়াও তিনি লিখেছেন মুস্বাই, হায়দ্রাবাদ, পুণে ও গৌহাটির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।



বাংলা ব্যান্ডের ভক্ত দিব্যেন্দু জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন নিয়ে এম.এ. করছেন। একে বাঙালি তায় জনসংযোগের ছাত্র, আড্ডা দেওয়া যে দিব্যেন্দুর প্রিয় বিনোদন হবে তা বলাই বাণ্ণল্য। কিন্তু একা একা নিজের সঙ্গে সময় কাটাতেও তিনি বড়ই পছন্দ করেন। এসবের সাথেই ভালোবাসেন লেখালিখি করতে।



জয়িতা মন্ডল পেশাগত ভাবে মনিপাল কলেজে নার্সিং শিক্ষিকা, আর নেশাগত ভাবে গল্পলেখিকা। গল্প-উপন্যাস পড়তেও তিনি খুবই আগ্রহী, কাজের ফাঁকে যেমন সময় মেলে। এছাড়া অবসর সময়ে গান শোনা, ইন্টারনেট সার্কিং ইত্যাদি তাঁর শখ।



ছোটবেলায় সিলেট ও পরবর্তীকালে ঢাকার বাসিন্দা মাহবুব আজাদ এখন জার্মানীতে নবায়ণযোগ্য শক্তির উপরে গবেষণারাত। তাঁর প্রধান পরিচয় অবশ্য বাংলা ব্লগোফিল্যারে একজন শক্তিশালী লেখক হিসাবে। লিখতে ভালোবাসেন ছোটগল্প; একটি গল্পসংকলন তিনি মুদ্রিতও করেছেন, যেটি নবীন লেখকের সেরা বই হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিল ঢাকা বইমেলায়। ছোটগল্পের মধ্যে আবার হাস্যরসের লেখা, যেমন ব্যঙ্গ, স্যাটোয়ার ইত্যাদি তাঁর বিশেষ সমাদৃত। সেই থেকেই সম্পত্তি লিখেছেন কিশোরদের জন্য একটি রহস্য-কমিক্স।



উত্তরবঙ্গের এক মফঃসল শহর থেকে কলকাতা হয়ে সম্পত্তি আমেরিকার মিশিগানে পাড়ি জমিয়েছেন প্রমিতা। পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি ছোটবেলার লেখালিখি করার অভ্যাসটাকে আবার একটু প্রশ্রয় দিচ্ছেন আজকাল।



প্রতাপ সেন চৌধুরী অল্প কিছুদিন আগে দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের তড়িৎ-প্রকৌশলীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কলেজ-জীবন থেকেই সাহিত্যচর্চার অভ্যাস ছিল, অবসরের পর তাতে মন দেবার বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন। এর সঙ্গে শখ রয়েছে ফোটোগ্রাফি। আর পছন্দ করেন একটু ইন্টারনেটে সময় কাটাতে।



প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী রমা জোয়ারদারকে এখন দিল্লীতে হোম-মিনিস্ট্রির মত গুরুদায়িত্ব সামলাতে হয় তাঁর পরিবারে। তার মাঝেই কিন্তু নিয়মিত গল্প-কবিতা লিখে চলেন; বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর গল্প, রচনা বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, দুটি ছোটগল্পের সংকলনও প্রকাশ করেছেন, PEN এবং অন্যান্য পত্রিকা দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। তার সাথেই চালান ন্যূনত্ব রচনা, সুরসংযোজন ও নির্দেশনা, বিশেষত ছোটদের জন্য। এর উপরে ভালোলাগা বলতে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানো।



অসমের মেয়ে সঞ্চিতা পড়াশোনার জন্য শাস্তিনিকেতন ও সিকিম হয়ে অধুনা আছেন ফরাসীদেশে, পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণারত। পড়াশোনার পাশাপাশি গল্প পড়া আর লেখার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই। নতুন নতুন দেশ আর নানা রকম মানুষ দেখতে তাঁর ভালই লাগে।



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈবরসায়নে শিক্ষা নিয়ে ক্যান্সারের উপর গবেষণা করতে শাশ্বতী ভট্টাচার্য এখন মার্কিনদেশে প্রবাসী। যদিও, তিনি মনে করেন, নতুন করে শুরু করতে পারলে তিনি বাংলা সাহিত্যেরই ছাত্রী হতে চাইতেন।



ইতিহাসের ছাত্রী শ্রাবনী দাশগুপ্ত বর্তমানে পেশায় স্কুলশিক্ষিকা। তার সাথেই নিয়মিত ছোটগল্পের চর্চা করেন; একাধিক পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অধুনা রাঁচির বাসিন্দা তিনি।



আয়কর-বিভাগের চাকরিজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর, দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাদে, তাপসকিরণ রায় আবার লেখালিখি শুরু করেছেন। পনের বছর বয়স থেকে পত্রিকায় লেখা দিয়ে শুরু; একসময় কালি ও কলম, আসর, যুগান্তর ইত্যাদি নানা পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। প্রথমে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টে শিক্ষকতা করতেন, প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যাবার পর আয়কর-বিভাগের পদে চলে যান। কর্মসূত্রে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে নিবাস। তাই বেশ কিছু হিন্দী পত্রপত্রিকাতেও কবিতা লেখেন, বেতারেও অনুষ্ঠান করেছেন।



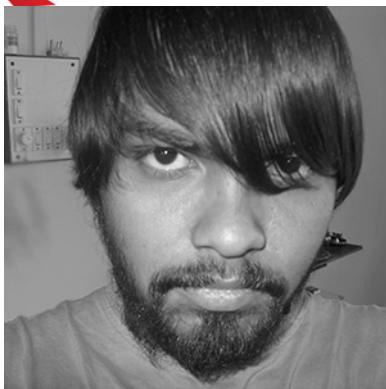
Dr. Aniruddha Sen, an Electrical Engineer from Jadavpur University, is currently a Senior Scientific Officer at the Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai, India. He has authored several international papers in speech science. Writing in Bengali and English is his serious hobby and he is associated with various Bengali organizations and periodicals in Mumbai. His story 'A Win-win Game' was highly commended in the Commonwealth Broadcasting Association (CBA) Short Story Competition, 2007.



Barnali, currently living in Gurgaon, calls herself a transplanted Indian. She is a self-taught creative writer and an avid blogger, writing regularly on blogspot as barnalisahabanerjee. Her writings have been featured in several Indian newspapers such as The Statesman, Woman's Era, and Muse India. She has also written for some popular e-zines like Parabaas, The Smoking Poet, Fiction at Work and Mused- Bella Online Literary Review. Apart from writing, her hobbies include painting and photography.



Gigglananda is the pen-name of this active blogger and writer. Living in Navi Mumbai, she has contributed her fiction, humour and satire pieces to quite a few magazines in Kolkata, such as Anandamela, Kishore Bharati and Barnali. In addition, she continues blogging at sulekha.com. By profession, she is into consultancy services regarding recruitment and training.



Born in Kolkata but brought up in Mumbai, Shomik Banerjee is currently a mechanical engineering student over there. An avid reader, he likes to compose poems as well as drama, and has contributed his writings to school plays. On the leisure side, he enjoys trekking and photography. Being a foodie, he also loves to experiment with cooking from time to time.



Subhobroto is a geologist by profession but has a passion of writing stories, especially with a line of subtle humor in them. Inspired by the works of Jerome K Jerome, Joseph Heller, and Ruskin Bond, he tries to write in the same vein. Conceived, born and brought up in Durgapur, he presently lives in Dehradun and dreams of seeing his works in the print media like those of his gurus.



কলকাতার আকাশলীনা শিক্ষাবিদ্যায় স্নাতক। কবিতা লেখা তাঁর প্যাশন; তিনি সময়বিশেষে বাংলা নাটক ও ছেট পর্দায় অভিনয়ও করে থাকেন।



বৈদ্যুত্য সরকার কম্পিউটার-বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি ভালবাসেন কবিতা লিখতে। আহির লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত আছেন।



ধাতুবিদ্যায় প্রকৌশলী শ্রীমতী বন্দনা মিত্র ইস্পাতের জগতের বাইরেও সমানভাবে দক্ষ – ধাতুর পাশাপাশি মানবমনের গভীরের খবরও তাঁকে রাখতে হয়, নানা আন্তর্জাল পত্রপত্রিকায় লেখালিখি করার জন্য। তিনি বর্তমানে পাটনায় স্বামী-কন্যাসহ বাস করেন।



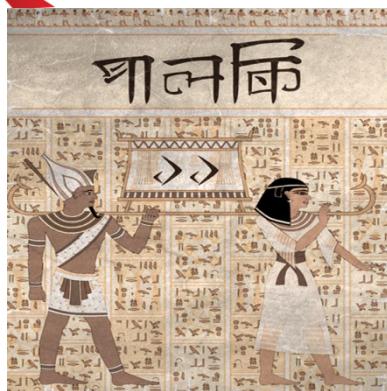
ভগলি জেলার বাসিন্দা দীপা পান শিক্ষকতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের উপর স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠ্রতা। ইতিপূর্বে কম্পিউটার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাও লাভ করেছেন। তাঁর মতে, কবিতার চর্চা তাঁর কাছে জীবনধারণের এক আবশ্যিক অঙ্গ। প্রথম প্রকাশ স্কুল ম্যাগাজিনে, সেই থেকে এখনও বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন, ই-ম্যাগাজিন, এবং দেশ পত্রিকায় তাঁর লেখা স্থান করে নিয়েছে।



জ্যোতিক্ষ'র ছেলেবেলায় শখ ছিল শাহুরুখ খান অথবা উড়োজাহাজের পাইলট হবেন, বলাই বাহুল্য কোনোটাই হন নি; পর্দার সামনে থেকে পিছনেই তাই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, নাটক কবিতা এবং গল্প লেখেন এবং লোককে ধরে ধরে দেখতে বা পড়তে বাধ্য করেন; শখ পুরোনো চিঠি পড়া আর অজানা জায়গায় হারিয়ে যাওয়া, অবসর সময়ে গবেষণা করেন পারদু ইউনিভার্সিটিতে, বিষয় রাশিবিজ্ঞান; স্বপ্ন একদিন সব ছেড়েছুড়ে জটাজুটধারী সন্ধ্যাসী হওয়া...।



কলকাতার বাঙালসন্তান কৌন্তভকে কয়েক বছর হল তুষারাকীর্ণ বস্টনে ডেরা ফেলতে হয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব-রাশিবিজ্ঞানে গবেষণার দায়ে। পালকির সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলে পালকির জন্য এটা-সেটা লেখা, সাক্ষাৎকার নেওয়া, প্রচ্ছদচিত্রণ, সম্পাদনা বা ই-প্রকাশনা অনেক কিছুরই দায়ভার তার উপর চাপানো হয়ে থাকে। এতসবের ফাঁকে খানিক সময় পেলে একটু ছড়া লেখার অপচেষ্টা বা ছবি তোলার শখ জাগে। বান্ধবীর মন জোগানোর পেছনে ছুটবার দায় নেই বলেই হয়ত সেই সময়টুকু মেলে।



মাসুদ মাহমুদ বগড়া থেকে এসে একসময় বসতি করেছিলেন ইউক্রেনের কিয়েভ-এ। রুশী ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের হাস্যরস অনুবাদ করে থাকেন মাঝেমধ্যেই। ‘সোভিয়েতস্কি কৌতুকভ’ বলে তাঁর অনুদিত একটি কৌতুক-সঙ্গলনও প্রকাশ হয়েছে। নিজেকে শৌখিন ছড়াকারও বলে থাকেন। তবে বিশদ আত্মপরিচয় দানে বড়ই বিমুখ তিনি। সংক্ষিপ্ত ছড়াটির তুলনায় লেখক-পরিচিতিই ‘বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি’ হয়ে পড়বে, সেই সন্তানাতেও কিছুটা।



কলকাতার মেয়ে ময়ূরী বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরীর অধিবাসিনী। ব্যস্ততার পাশাপাশি ভ্রমণ, লেখালেখি, আবৃত্তি, গান ও বই পড়তে ভালবাসেন।



হাওড়া থেকে পার্থ মুখোপাধ্যায় নানা দেশ ঘুরে এখন টেক্সাসে প্রবাসী। পেশার খাতিরে তৈরি করেন সফটওয়্যার, আর মনের তাগিদে সৃষ্টি করেন কবিতা। তবলার চর্চাও করে থাকেন নিয়মিত।



ব্যস্ত নগর কলকাতার এক ব্যাঙ্ক কর্মচারীর বৈচিত্রিক জীবনের মাঝে ইনি রস খোঁজেন কবিতায়। পিপুফিশ ছদ্মনামে তাই কবিতা লিখে সময় কাটান। শব্দটি নাকি তাঁর মনের খুব কাছাকাছি।



বুদ্ধদেব বসু, শচীন দেব, আর হিমাংশু দত্তের সুতিবিজড়িত কুমিল্লা শহরে জন্ম প্রজ্ঞার। ভারত থেকে ছয় মাহিল দূরে ‘হাওরের শহর’ সুনামগঞ্জের পাহাড়, বিপুল বৃষ্টি, কৃষ্ণচূড়া, নদী আর লোকগীতি তাঁর শৈশবকে করেছে উজ্জীবিত। প্রজ্ঞা চলে আসেন প্রবাসে স্নাতকোত্তর পড়াশুনার উদ্দেশ্যে। ফ্লোরিডা রাজ্যের ‘পেন্সাকোলা’র সাগর আর নির্জনতা ভালোবাসেন... আরো ভালোবাসেন এই নির্জনতায় কবিতা লিখতে।



কলকাতা পুর কর্পোরেশনে কর্মরত প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত কবিতার চর্চা করে আসছেন দীর্ঘদিন। একাধিক কবিতা-সঙ্গীত এবং নাটক প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। ক্লেডজ কুসুম নামের একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন বহু বছর ধরে। লেখার সমান্তরালে নানা নাটকে অভিনয় বা গানও করে থাকেন প্রায়ই।



বস্টন নিবাসী পৃথীরাজ চৌধুরী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট-এর কাজে ব্যাপ্ত হলেও তাঁর নেশা কবিতা লেখা ও পাঠ। ‘ই-মেল-এ টাইপ’, ‘অভিসার ডট এম পি শ্রী’, ‘শিকড় এখন ওয়্যারলেস’ তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই। তাঁর লেখা কবিতা ছাপা হয়েছে সানন্দা, একদিন লাইভ, পরবাস, কবিতা প্রতিমাসে প্রমুখ পত্রপত্রিকায়ও। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর নিজের কবিতা পাঠের সিডি-ও প্রকাশিত হয়েছে।



ভগুনী জেলার চুঁচুড়া শহরে জন্ম ও নিবাস, রমিত দে বর্তমানে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকে সহকারী অ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে কর্মরত। কিন্তু নেশা তাঁর কবিতা; কবিতা ভালবাসেন, কবিতা নিয়ে বাঁচেন। কলকাতা বইমেলায় এ বছর ‘মারাসিম’ নামে একটি কবিতা-সঙ্গীত প্রকাশও করেছেন। পছন্দ করেন সাহিত্য, চিত্রকলা, সৃষ্টিধর্মী চিন্তাধারা; জনহিতকর কর্মে ব্যাপ্ত মানুষের গুণমুগ্ধ রমিত মনে করেন সমাজসেবামূলক কাজ সমাজের কাছে ঝণশোধের উপায়।



কর্মসূত্রে বহু দেশ ঘুরে বেড়ালেও রোমেল চৌধুরীর মনটা পড়ে থাকে বাংলাদেশেই। বাংলা ভাষার টানে, বাংলাদেশের মাটির টানে তিনি কবিতা লেখেন। বাংলা সাহিত্যের যে-কোনো আলোচনাতেও তাঁর বড় উৎসাহ। তবে তিনি বড়ই নিরুৎসাহ নিজের সম্পর্কে কোনো আলোচনায়, তাই নিজের ছবি প্রকাশেও তিনি অনিচ্ছুক।



১৮৯৯-এর শীতকালে, ময়মনসিংহের সেনবাড়ীতে জন্ম হেমচন্দ্র ও শরৎকামিনীর প্রথম সন্তান সুবর্ণরেখার। তিনি ঢাকা ব্রাঞ্চ গার্লস বিদ্যালয়ের জলপানিপ্রাণ্ড ছাত্রী। ত্রয়োদশ বর্ষে তাঁর বিবাহ হয় ঢাকার শ্রী সুধেন্দুমোহন দাশগুপ্তের সঙ্গে; তিনি কালক্রমে প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন রন্ধনপটিয়সী এবং এজাজবাদিকা হিসেবে। ১৯৮০-র ডিসেম্বরে তাঁর তিরোধান ঘটে।



ছবিপ্রকাশে অনিচ্ছুক সর্বজয়া মুখোপাধ্যায় বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের একজন গবেষিকা। বর্তমানের অতিক্ষুদ্রোপাখ্যানের যুগে, তিনি তাঁর সৃজনশীলতার জন্য বিকল্প পথ খুঁজে নিতে চান গান, কবিতা ও ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে।



মেহাশিস নিজেকে বর্ণনা করতে চান ‘খুচরো কবি’ হিসাবে। পেশাদার কবিদের মত নয়, শখের বশে তিনি কবিতা লেখেন, মনের খেয়ালগুলিকে ভাষায় রূপ দেবার প্রয়াসে। বর্তমানে টি.সি.এস.-এ চাকরি করছেন তিনি, কলকাতার আই.ই.এম. থেকে বি.টেক. ডিগ্রি পাবার পর।



শুভ আচ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করে সম্প্রতি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করছেন। তিনি বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে বাংলা কবিতা লিখে থাকেন। বছরখানেক আগে তাঁর কবিতা আনন্দমেলা পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে।



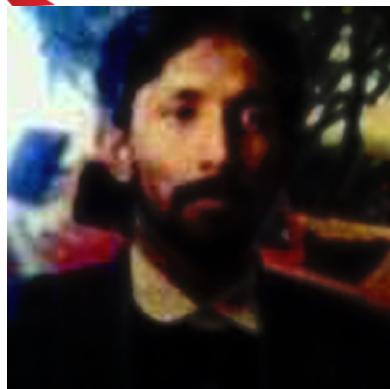
সুদীপ্ত বিশ্বাসের নেশা হল কবিতা। কবিতা লিখছেন তিনি প্রায় পনের বছর ধরে। দিগন্তপ্রিয় নামের একটি সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রকৃতির প্রতিও গভীর আকর্ষণ সুদীপ্ত। ভালবাসেন হিমালয় পর্বত, নর্মদা নদী; উপভোগ করেন রাতের আকাশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.এ. করে তিনি এখন ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত।



সদ্যই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়া শেষ করে সুমনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এখন জীবনের অনিচ্ছ্যতার ছাতে পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়ে পড়া। তবে সে সবের মধ্যেও ছোটবেলা থেকেই চলে আসা কিছু সৃষ্টির নেশাটা তিনি ছাড়তে চান না। বহুদিন ধরে কবিতা ও গল্প লিখলেও পাঠকদের কাছে পৌছনো হয়ে ওঠে না সচরাচর, তাই অনেকগুলি প্রিয় লেখার মধ্যে একটি কবিতা তিনি পালকির মাধ্যমে তুলে দিলেন পাঠকদের হাতে।



কলকাতার মেয়ে স্বাতী সংসারসমুদ্রে নাও বাইতে বাইতে কানাডার তীরে এসে তরী বেঁধেছেন। ওই কুলের পিছুড়াক তবুও এই কুলে ঢেউ তোলে এখনও; স্কুলে থাকতে যে লেখালিখির হাতেখড়ি হয়েছিল মায়ের কাছে, সেই অভ্যাস এখনও তাই কারণে-অকারণেই কয়েক কলম বাংলা লিখিয়ে নেয় তাঁকে দিয়ে। মন খারাপ হোক কি আনন্দ, স্বাতী লিখতে ভালবাসেন। এমনই কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছে নানা লিটল ম্যাগাজিন ও সোনাবুরি ওয়েবজিনে।



কলকাতা নিবাসী পঞ্জশ ছুইছুই তাপস রায় ডষ্ট্ৰেট ডিগ্ৰীপ্ৰাপ্ত এবং কৰ্মসূত্ৰে ভাৰত সঞ্চার নিগম লিমিটেডেৰ সঙ্গে যুক্ত। তিনি একটি বাংলা মাসিক পত্ৰিকাও প্ৰকাশ কৰে থাকেন, এবং তাঁৰ অনেকগুলি বই প্ৰকাশিত হয়েছে। ২০০৬ সালেৰ বীৱেন্দ্ৰ পুৱক্ষাৱে তিনি সমানিত হয়েছেন।



Born in Kolkata, Amit Shankar Saha is a PhD researcher in English Literature at Calcutta University. His interests lie in academic research as well as creative writing. He has contributed his stories, poems, and essays to several e-journals like Muse India, Cerebration, DesiLit Magazine, Boloji, Pens On Fire, Palki, etc. He is also a blogger.



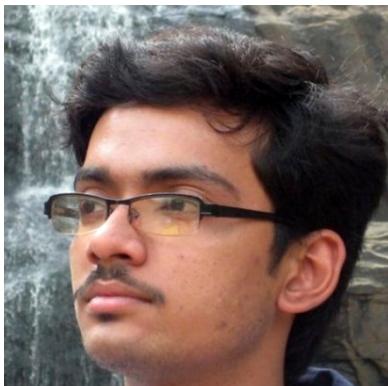
Ratnadipa aspires to sustain a multifaceted lifestyle, balancing her profession with her hobbies. By profession, she is a pathologist, after getting medical degrees at the National Medical College and B. R. Singh Hospital at Kolkata. While doing so, she likes to engage herself in the creation of poems.



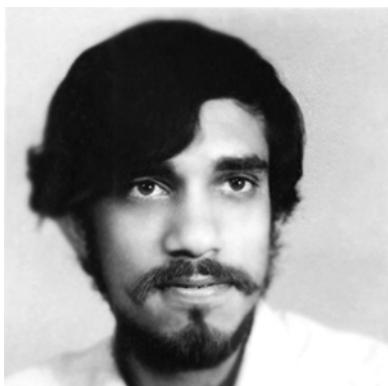
Born and raised in west London, Sudakshina moved to Kolkata for further schooling. Following her Secondary examination and thereafter, the ISCE in Humanities, she pursued a BA Honors degree in New Media Journalism with Film & TV in London. Sudakshina is currently a visiting lecturer at various educational institutions in London, United Kingdom. In her spare time she writes for various publications and manages her website, *journalismwithsudakshina*.



শিলিগুড়িতে জন্ম এবং কলকাতায় বেড়ে ওঠা হিমান্তী শেখর দত্ত এখন সপরিবারে বাস করেন আমেদাবাদে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ভূ-তত্ত্ববিদ্যায় শিক্ষা নিয়ে তিনি ও.এন.জি.সি.তে যোগদান করেন। চাকরির কারণে বহু স্থান ঘুরেছেন, শিখেছেন অসমীয়া ও গুজরাটি ভাষা। স্কুলজীবন থেকেই লেখালিখি করে আসছেন; অন্তত তাঁর লিখিত প্রেমপত্রগুলি যে উচ্চমানের হয় সে বিষয়ে সাক্ষী তাঁর স্ত্রী। সম্প্রতি জোরকদমে লিখতে শুরু করেছেন ছোটগল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানাকিছুই। আত্মজীবনী লেখার কাজেও হাত দিয়েছেন। অবসরগ্রহণের পর এসবেই পুরোদমে নেমে পড়তে চান।



কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুনিবাসী এই প্রাণোচ্ছল বাঙালি তরুণ এক বহুজাতিক সংস্থার পরিসংখ্যান-পরামর্শের দায়িত্বের মাঝে সামান্য অবকাশে একটু লেখালিখি করেন। আর একটু বেশি সময় পেলে মৃগাক্ষ মনোযোগ দেন অভিনয় বা ভ্রমণে।



সরোজমোহন চক্রবর্তী সদ্য অবসর নিয়েছেন সরকারী চাকরি থেকে। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ এই কর্মী মানুষটি এককালে সম্পাদনা করতেন কুরঞ্জের পত্রিকা। বাংলা লিটল ম্যাগাজিন তাঁর বিশেষ প্রেমের জায়গা। অধুনা নদীয়া জেলার কল্যাণী নিবাসী সরোজবাবু ইচ্ছা রাখেন অবসর জীবনে কাজ করবেন বাংলা লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে – তার ইতিহাস নিয়ে। ‘উদাসী হাওয়ার বিরুদ্ধে’, ‘অগ্নিহোত্রী, তোমাকে’ তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।



Prabir Ghose is a reputed blogger who found mention in the Limca Book of Records 2007; his blog is 'Rediscovering India' at Indiatimes Blogs. He is a Citizen Journalist of Merinews, New Delhi; writes in Bengali under the penname of Kali Kinkar Karmakar; published a Bengali quarterly magazine Naba Nalanda from Nashik; and participated in several Kolkata Book Fairs.



Dr. Sugata Sanyal, a professor at the School of Technology and Computer Sciences at the TIFR in Mumbai, India, joined the Computer Group there in 1973 after completing his Engineering studies from Jadavpur University, and thereafter, the IIT, Kharagpur. While working at the Tata Institute, he earned a doctorate. An acclaimed IT expert, he likes dabbling in innovation, and likes more to think about new things. He has a son and two grand-children.



কলকাতা নিবাসী গণিতবিদ্যার গবেষক অভীরূক বিগত চার বছর ফোটোগ্রাফি চর্চা করছেন। এছাড়া পছন্দ করেন সিনেমা দেখতে, গান শুনতে।



কর্মস নিয়ে গ্র্যাজুয়েশনের পর আরণ্যক ঝুঁকে পড়েন ফোটোগ্রাফিকে পেশা হিসাবে নেওয়ার দিকে। হাওড়ার বাসিন্দা আরণ্যক এখন ক্রিয়েটিভ এবং ফ্যাশন ফোটোগ্রাফিতে ব্যস্ত; অ্যাকাডেমি সহ নানা জায়গায় ছবির প্রদর্শনীও হয়েছে তাঁর।



চন্দন বিশ্বাস কলকাতার একজন তরুণ ফটোগ্রাফার। দীর্ঘদিন ফটোগ্রাফি শেখার পর বর্তমানে তিনি সংবাদপত্র-সংক্রান্ত ফ্রীলান্স ফোটোগ্রাফিতে যুক্ত হয়েছেন। ভালোবাসেন বেড়াতে, এবং স্বভাবতই, নিসর্গের ছবি তুলতে।



মুখচোরা, লাজুক, কলকাতার ছেলে পাবলো একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। শহরের মানুষ হয়েও প্রকৃতির ছবি তোলা তাঁর নেশা। তেমনই, ইংরাজি মাধ্যমের ছাত্র হয়েও ক্রমে বাংলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ণ হয়েছেন তিনি, অল্পস্বল্পে কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে।



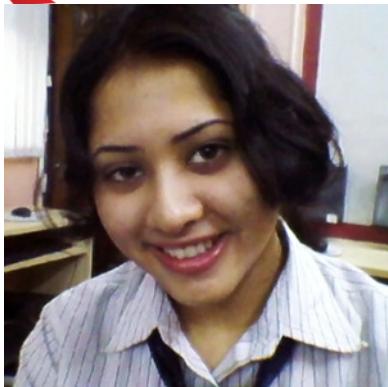
কল্যাণী এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষা নিয়ে শিলাদিত্য পূজারী এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির পাশাপাশি চিত্রগ্রহণেও তাঁর প্রবল উৎসাহ। ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোটোগ্রাফি ক্লাবের সদস্যও ছিলেন। তিনি ‘মুক্তি’, ‘পিপল ফর অ্যানিমাল’ নামের দুটি জনহিতকর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। নিজেও ‘নিউ হরাইজন নেচার লাভারস অ্যাসোসিয়েশন’ বলে একটি এন.জি.ও.র সূচনা করেছেন।



বিধাননগর নিবাসী শুভজিৎ দত্ত একজন ক্রিয়েটিভ ফোটোগ্রাফার। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, পপুলার ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি নানা প্রতিযোগিতায় তাঁর ছবি সম্মানিত হয়েছে।



ছবি প্রকাশে অনিচ্ছুক স্বাতী দাস ছবি তুলতে কিন্তু বড়ই উৎসাহী। কলকাতার মেয়ে স্বাতী পড়াশোনার পাশাপাশি তাই ফোটোগ্রাফিও চর্চা করেন, এবং তারই প্রকাশ পালকিতে দেওয়া ছবিগুলিতে।



উত্তর কলকাতার অধিবাসী রিয়াঙ্কা চন্দ কম্পিউটার-বিজ্ঞানের ছাত্রী। সেই সঙ্গে গল্প বা কবিতার চর্চা করতে বড়ই পছন্দ করেন। একটু-আধটু ছবি আঁকার দিকেও তাঁর ঘোঁক।



সুজাতা চৌধুরীর জন্ম ভুগলী জেলার চুচুড়া শহরে। তাঁর পরিবার একসময় পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট (সিলেট) এবং কুমিল্লা জেলায় বসবাস করতেন। কলা বিভাগের স্নাতক সুজাতার বিশেষ পছন্দের বিষয় হল ভারতীয় মার্গসঙ্গীত এবং কথক নৃত্যশৈলী, যার দুটিতেই তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁর সময় কাটে বিভিন্ন শিল্পের চর্চায় – রন্ধন, এথনিক অলংকার ও কলাকৃতির ডিজাইন, এবং বাটিক, কাঁথা স্টিচ এবং এথনিক গয়নার সম্মেলনে মহিলাদের জন্য পোষাকের রূপরেখা সৃষ্টি।